ভেরা চাপলিনা

আমাদের চিড়িয়াখানা

ভেরা চাপলিনা • আমাদের চিড়িয়াখানা

ভেরা চাপলিনা • আমাদের চিড়িয়াখানা

ভেরা চাপলিনা

আমাদের চিড়িয়াখানা

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

В. ЧАПЛИНА

ЧЕТВЕРОНОГИЕ ДРУЗЬЯ

на языке бенгали

অনুবাদ: রেখা চট্টোপাধ্যায় ও বিজয় পাল

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Ч $\frac{70802-679}{014(01)-76}$ 610—76

সূচী

চিড়িয়াখানার পশুপাখি

ভূমিকার বদলে

আজীবন আমি জন্তুজানোয়ার ভালোবেসেছি, আর যতদূর আমার মনে পড়ে আমি পুষেছি নানা ধরনের পাখীর ছানা, কুকুর শাবক আর অন্যান্য জন্তুর বাচ্চা...

বাড়ী ফেরার পর কাকের বাচ্চা ঠোঁটগুলো বড় বড় করে যখন স্বাগত জানায় তখন ভালো লাগে, আর যখন হল্‌দে-ঠোঁটওলা চড়ুইছানারা আমার প্রসারিত হাতের উপর থেকে উড়ে যায় না এবং খরগোশছানারা যখন বুক ফুলিয়ে আমার কোলের উপর লাফিয়ে ওঠে তখন আমি খুসি হই।

চোদ্দ বছর বয়েসে আমি চিড়িয়াখানার তরুণ প্রাণীতত্ত্ববিৎদের চক্রে যোগ দিয়েছিলাম। আমাদের শিক্ষক পিওতর আলেক্সান্দ্রভিচ মান্তেইফেল ছিলেন সুবিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিৎ এবং সত্যিকারের প্রকৃতিপ্রেমিক। তিনিই আমাদের ভালোবাসতে শিখিয়েছিলেন জন্তু আর প্রকৃতিকে।

আমাদের চক্রটি ছিল খুব ছোট্ট আর সৌহার্দপূর্ণ। পরিচারকদের আমরা সাহায্য করতাম খাঁচা পরিষ্কার ক'রে আর জন্তু ও পাখীদের খাইয়ে, এবং গবেষকদের সাহায্য করতাম আমাদের পর্যবেক্ষণ দিয়ে, আমাদের ডায়েরিতে জন্তুদের ব্যবহারের কথা লিখে, তাদের বাচ্চাদের ওজন ক'রে আর বৃদ্ধির কথা লিখে।

১৯২৪ সালের শেষে চিড়িয়াখানাটা ভরে উঠতে শুরু করলো। পৃথিবীর সর্বত্র থেকে প্রচুর জন্তুজানোয়ার চালান হয়ে আসতে লাগলো। অল্প দিনের মধ্যেই তাদের থাকবার জায়গা রইলো না, যেখানে সম্ভব সেখানেই নতুন ঘেরা দেওয়া জায়গা আর খাঁচা তৈরী হলো, পুরোনোগুলোকে হলো বাড়ানো আর করা হলো উন্নততর।

তখনই চিড়িয়াখানার 'নতুন এলাকা' হচ্ছিল স্থাপন করা। সবদিক দিয়েই সেটা ছিল নতুন। কৃত্রিম পাহাড় ঘেরা জায়গাগুলো তৈরী হয়েছিল পাহাড়ী ছাগলদের জন্যে, বিস্তৃত জায়গা — হিংস্র পশুর জন্যে, গরাদের বদলে সেখানে থাকতো গভীর জলে ভরা পরিখা। সেই জায়গার পিছনে কৃত্রিম পাহাড়ের মধ্যে ছিল খাঁচাগুলো।

এ সমস্তই আমাদের চোখের সামনে গড়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি পাথরের সঙ্গে আমরা, তরুণ প্রাণীতত্ত্ববিৎ চক্রের সদস্যরা, ছিলাম পরিচিত, আর চিড়িয়াখানার উন্নতির জন্যে আমাদের অবসর সময়কে চেষ্টা করতম কাজে লাগাতে।

অবশ্য সত্যিকারের নির্মাণ-কাজে আমরা অংশগ্রহণ করতে পারি নি, কিন্তু জমিতে গাছগাছড়া ও ঝোপঝাড় পোঁতার কাজে আমরা প্রচুর সাহায্য করেছিলাম।

চিড়িয়াখানার 'নতুন এলাকায়' দর্শকদের প্রথমেই চোখে পড়ে ছোট একটা জলা। এক সময় এটা ছিল একটা ঘাসে ঢাকা নিচু সমতলভূমি, তার উপরে ছড়িয়ে ছিল কয়েকটা বিরল ঝোপঝাড়। আমাদের বলা হলো সেটাকে একটা জলাজমিতে পরিণত করতে।

ছালা, কোদাল আর বালতি নিয়ে আমরা তাই বেরিয়ে পড়লাম জারিৎসিন পুকুরের উদ্দেশ্যে (মস্কো থেকে বেশী দূরে নয়)। সেখানে খুব যত্নে, যাতে শিকড়গুলোর না ক্ষতি হয়, আমরা ছোট ছোট মাটির চাবড়া খুঁড়ে তুললাম, তার উপর গজিয়েছিল নলখাগড়া আর উইলো ওষধি, জড়ালাম সেগুলোকে ভিজে ছালায়, আমাদের লরিতে নিয়ে এলাম চিড়িয়াখানায়।

এই সবুজ গাছগাছড়াগুলোকে পোঁতবার জন্যে আমাদের চক্রের প্রত্যেক সদস্যের জন্যে ছিল আলাদা আলাদা জমির টুকরো। ভবিষ্যৎ জলাজায়গায় আমাদের চাবড়াগুলোকে সুদৃঢ়ভাবে বসাতে হয়েছিল। এ কাজটা ছিল খুব কঠিন, সবচেয়ে কোমল ফুলগাছকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পোঁতার চেয়েও অনেক বেশী শক্ত।

আমরা সেগুলোকে কৃত্রিম খাড়া জায়গার উপর সাবধানে পুঁতেছিলাম ও সেগুলোর সামনে ঘাস লাগিয়ে দিনের মধ্যে একাধিকবার তাতে জল দিতাম। কাজটা পরিশ্রমসাপেক্ষ। কিন্তু সব গাছগুলো যখন বেঁচে উঠলো আর জলাজমিটা যখন ভরে উঠলো জলে, তখন আমরা কী খুসিই না হয়েছিলাম! সেটাকে দেখাতে শুরু করলো আসল জলাজমির মতো। লম্বা ঠ্যাংওলা বক, গোলাপী বুকওলা ফ্লেমিঙ্গো এবং অন্যান্য নানা ধরনের জলাজমির পাখীকে সেখানে স্থানান্তরিত করা হলো যেটা সম্ভবত তখন ছিল সমস্ত চিড়িয়াখানার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর জায়গা।

'নতুন এলাকাটা' যখন তৈরী হয়ে গেল, ক্রমশ সেটা ভরে উঠতে লাগলো নানা ধরনের জন্তুজানোয়ারে। 'পাহাড়ী ছাগলের জায়গায়' এলো ইয়াক আর পাহাড়ী ছাগল, 'মেরু-অঞ্চলে' — মেরুর ভালুক আর মেরুর শেয়াল, আর 'জন্তুর দ্বীপে' — বাঘ, ভালুক, নেকড়ে ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু।

প্রথমে হিংস্র জন্তুদের রাখা হতো দ্বীপের মাঝখানের এক খাঁচায়, সেটার মুখটা ছিল খোলা জমিটার দিকে। কিন্তু 'নতুন এলাকায়' জনসাধারণকে ঢুকতে দেবার আগে জন্তুদের খাঁচা থেকে আমাদের বার করতে হতো নিশ্চিত হবার জন্যে যে তারা পরিখাটা লাফিয়ে পার হতে পারবে না। এ কাজটা করতে হতো খুব সকালে, সমস্ত সহর যখন ঘুমিয়ে আছে।

যেদিন জন্তুদের বাইরে ছাড়ার কথা তার আগের সন্ধেয় চিড়িয়াখানার খুব কম কর্মচারীই বাড়ী গিয়েছিল। আমি নিজে বাড়ী গিয়েছিলাম, কিন্তু ক্রমাগতই আমার দুর্ভাবনা হচ্ছিল পাছে বেশী ঘুমিয়ে পড়ি। ভোর তিনটেয় সেখানে আমি ফিরে আসি। খুব সকাল হলেও সবাই সেখানে ছিল।

প্রথমে বার করার কথা ছিল বাঘদের। পাঁচটা বিরাট ডোরা-কাটা বেড়াল কয়েক পা সাবধানে এসে থাপ্পন জুড়ে বসলো। তারা আগে কখনো স্বাধীনতার স্বাদ পায় নি। বন্দী দশায় তাদের জন্ম, খাঁচার কাঠের মেঝেতে তারা জীবন কাটিয়েছে, থাবার নীচে মাটির অনুভূতিটা তাদের কাছে অপরিচিত। এই বিরাট, শক্তিশালী জন্তুগুলো অসহায় বেড়ালছানার মতো ভয়ে কাঁপতে লাগলো। কিন্তু ক্রমশ তাদের এই নতুন লাগাটা কেটে গেল। তারা বাইরে যাবার পথ খুঁজতে শুরু করলো, পিছনের পায়ে ভর দিয়ে উঠে, দেয়ালগুলো শুঁকে আর পরিখাটা লাফিয়ে পার হতে চেষ্টা করে। কিন্তু পেরোতে পারলো না, জলে পড়ে, নাক দিয়ে শব্দ করে তাড়াতাড়ি উঠে গেল শুকনো ডাঙায় — পরিখাটা শুধু চওড়া বলে নয়, জলের শীতলতা তাদের ভয় পাইয়েছিল। বাঘগুলোর উপর নজর রাখার কাজে অন্য লোকদের রেখে আমরা গেলাম চিতাবাঘগুলোকে ছাড়তে।

তারা ছিল দুজন। দুজনেই খুব সম্প্রতি মধ্য এশিয়া থেকে এসেছে। ফাঁদ পেতে তাদের হয়েছিল ধরা, একজন ছিল খোঁড়া। তাদের খাঁচা ছাড়া করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠলো। এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল, বেরিয়ে আসতে চায় নি।

অবশেষে একটাকে বহু কষ্টে বাইরে বার করা হলো।

নিজেকে খোলা জায়গায় আবিষ্কার করে বাঘটার পেশীগুলো হয়ে উঠলো টানটান। চারিধারে লোকজন দেখে সে থু-থু ফেলে নীচু হয়ে বসলো, তারপর অকস্মাৎ লঘু পায়ে ছুটে উপরে উঠলো পাহাড়টার খাড়াই দিকে, যেন সে চলছিল তার পরিচিত পাহাড়ের গায়ের পথ ধরে। ব্যাপারটা এতো তাড়াতাড়ি ঘটেছিল যে কেউই দ্বিতীয় লাফে পাহাড়ের আরো উপরে উঠতে জন্তুটাকে বাধা দিতে পারে নি। 'জন্তুর দ্বীপের' উপরকার এক জানালা দিয়ে সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে সব জানালার ছিটকিনিগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হলো যাতে আর কেউ পালাতে না পারে।

চিতাবাঘটাকে ধরা গিয়েছিল পরের দিন। এই পলায়নের পর সেটাকে তার খাঁচায় ভরে রাখা হয়েছিল, আর নেকড়েগুলোকে ছাড়া হয়েছিল খোলা জায়গায়।

অবশেষে সবকিছু প্রস্তুত হয়ে গেল। খাঁচা, খোঁয়াড় আর খোলা জায়গাগুলো ভরে গেল জন্তুজানোয়ারে। 'নতুন এলাকার' পথগুলোয় ছড়ানো হলো হলদে বালি। আনন্দিত ও গর্বিত হয়ে আমরা 'নতুন এলাকার' ফটকগুলো হাট করে খুলে দিয়ে আমাদের প্রথম অতিথিদের স্বাগত জানালাম।

এইভাবে চিড়িয়াখানার 'নতুন এলাকাটা' জনসাধারণের জন্য খোলা হয়েছিল আর আমাদের কাজেরও নতুন অধ্যায় হয়েছিল শুরু।

আগেও চিড়িয়াখানায় বহু বড় বড় পরীক্ষামূলক কাজ চলতো। তবে বিপ্লবের আগে যেমন এই কাজগুলো গোপন রাখা হতো, এখন আর তা করা হয় না। বরঞ্চ উল্টে অন্যান্য চিড়িয়াখানা ও রাষ্ট্রীয় পশু রক্ষণালয়ের সঙ্গে নিজের সাধন সাফল্যের অভিজ্ঞতা বিনিময় চলে। এই তো কিছুকাল আগেই শিলপপতিরা জীবজন্তু বধ করতো, বেচতো ব্যাপারীদের কাছে। আর ব্যাপারীরা জীবজন্তুর মাংস আর চামড়া থেকে একমাত্র মুনাফাই উঠাতো, তারা এসব প্রাণীর বংশবৃদ্ধি ও রক্ষার কথা মোটেই ভাবতো না। এইভাবেই ককেশাসের বনাঞ্চল থেকে লোপ পায় ইউরোপীয় বাইসন। মেরু-নকুল, বীবর, হরিণ ও আরো অন্যান্য বহু জন্তু মারা হতো খুব বেশী। তবে এখন সবকিছু বদলেছে। আজকাল মূল্যবান জন্তুজানোয়ার, পাখী ও মাছকে শুধু রক্ষা করাই হয় না, তাদের এখন সব জায়গায় পাঠানোও হচ্ছে যেখানে কস্মিন্‌কালে তাদের কোন নামগন্ধই ছিল না।

এই তো ক্রিমিয়ায়ই, উদাহরণ স্বরূপ, আজ দেখা যায় সাধারণ কাঠ-বিড়ালী। উসুরীয় এনোটকে আমাদের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে আনা হয়েছে দূর প্রাচ্য থেকে। ককেশাসে আবার প্রজনন চলছে ইউরোপীয় বাইসনের, আর হরিণের সংখ্যা এখন এতো বেশী যে প্রায়ই তাদের দেখা মেলে খাস মস্কোর আশপাশের বনজঙ্গলে।

জন্তুজানোয়ারের বাসস্থল নির্মাণ কিংবা তাদের প্রজনের জন্যে থাকা চাই তাদের জীবন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান। এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যদি পশু কিংবা পাখী খাঁচায় আবদ্ধ থাকে। স্বাধীন জীবনের পরিবেশে জন্তুরা নিজেরাই দরকারী খাবার ও আশ্রয় খুঁজে পেতে পারে। কিন্তু বন্ধ জীবনে ব্যাপারই আলাদা। খাঁচায় ওদের খাওয়ায় লোকে, আর তার জন্যে জানা চাই, কীভাবে জীবজন্তুকে খাওয়াতে হয়।

সর্বদা তাদের একই রকম খাবার দেওয়া উচিত নয়। খাবারে বিভিন্নতা না থাকলে জন্তুদের ঘন ঘন অসুখ করে, তাতে প্রজনন কম হয়। এটা এড়ানোর জন্যে চিড়িয়াখানার সমস্ত ডানাওয়ালা আর চতুষ্পদী বাসিন্দাদের দেওয়া হয় হরেক রকমের খাবার। শীত-গ্রীষ্ম-শরৎ-বসন্ত সব ঋতুতেই প্রাণীবিশেষজ্ঞরা তাদের জন্যে তৈরি করেন নতুন নতুন খাবারের তালিকা। বিশেষ গবেষণাগারে পরখ করা হয় খাদ্যের পুষ্টিকরতা।

চিড়িয়াখানায় পশুশাবকের দেখাশোনার কাজে সাহায্য করতে আসে 'কিশোর জীববিজ্ঞানী দলের' ছেলেমেয়েরা। তাদের প্রত্যেককে দেওয়া হয় তাদের মনের মতো কাজ। কেউ ভালোবাসে মাছ, কেউ বা — পাখী। এদের জীবন ও স্বভাব নিয়ে করে গবেষণা... তবে আমার কিন্তু সবসময় পছন্দ হতো হিংস্র জন্তু, শাবকাবস্থা থেকে তাদের লালনপালন, শিক্ষাদীক্ষা।

মনে আছে, চিড়িয়াখানায় কত নতুন আর মজার জিনিসই না আমি জানতে পেয়েছি: ব্যাজার, মেরু-নকুল ইত্যাদির ছানাদের জন্মের পর কেমন দেখায়, তারা কেমন করে বাড়ে, কেমন করে বদলায় তাদের স্বভাব... এবং আমার কাছে কোন্ পশুশাবকই ছিল না — মায় কাঠ-বিড়ালীর বাচ্চা থেকে সিংহশাবক আর বাঘের ছানা পর্যন্ত। আর আমাকে যখন চিড়িয়াখানার পশুশাবকদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হলো তখন আমি কী খুসিই না হয়েছিলাম।

কাজটা ছিল খুব কঠিন। কী করে বাছুরদের পালন করতে হয় সে সম্বন্ধে বই আছে, কিন্তু কোথাও আমি এ ধরনের একটা বইও খুঁজে পাই নি যাতে লেখা আছে কী করে বনবেড়ালের কিম্বা হায়নার বাচ্চাকে প্রতিপালন করতে হয়।

সবকিছুই আমাকে নিজে আবিষ্কার করতে হয়েছিল, আর প্রায়ই আমাকে শিখতে হয়েছিল আমার ভুল থেকে।

চিড়িয়াখানার সর্বত্র বাচ্চা জন্তুজানোয়াররা ছড়িয়ে আছে, আমাকে আর আমার সহায়কদের বহু সময় কাটাতে হতো দৌড় ঝাঁপ করে। তারপর আমি স্থির করলাম বাচ্চা জন্তুদের জন্যে একটা বিশেষ ঘেরা জায়গার ব্যবস্থা করতে। আমার উদ্দেশ্য হলো সেগুলোকে শুধু সুস্থ সবল করেই প্রতিপালন করা নয়, এমনভাবে প্রতিপালন করা যাতে বিভিন্ন জাতের জন্তুরা পাশাপাশি শান্তিতে বাস করতে পারে।

পশুশাবকদের ‘খেলার জায়গা’ নির্মাণের জন্যে আমি যে প্রস্তাবটি দিয়েছিলাম তা চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করেন। এ কাজে আমায় খুব সাহায্য করেছেন চিড়িয়াখানার কর্মীরা, পশুবিশেষজ্ঞ লিপা পানিয়োভিনা, ভিতা ওস্তানেভিচ। এই প্রথম ক্রীড়া ময়দানটি বানাতে কী কষ্টটাই না করতে হয়েছে আমাদের। তা নিয়ে কত দুশ্চিন্তাই না ছিল মনের মধ্যে। তবে আজ, যখন সব কষ্ট-কাঠিন্য আর নিদ্রাহীন রাত অনেক পেছনে পড়ে আছে, মনে পড়ে এই ময়দানে লালিত-পালিত সেইসব পশুশাবকের কথা, যাদের সঙ্গে জড়িত রয়েছে আমার কত মধুর স্মৃতি!

প্রথমাংশ

আমার সঙ্গীসাথী

কিনুলি

মাতৃহারা

কিনুলি* হচ্ছে একটা সিংহছানা। মস্কোর চিড়িয়াখানায় তার জন্ম।

আমি তাকে কিনুলি বলে ডাকতাম কারণ তার মা তাকে ত্যাগ করেছিল। কেউ জানে না কী কারণে সিংহী তার ছানাগুলোকে দুধ খাওয়াতে অস্বীকার করেছিল। কুঁই কুঁই করে তারা খাঁচার মধ্যে ঘুরে বেড়াতো, আর সিংহীটা পাশ দিয়ে এমনভাবে হেঁটে যেতো যে মনে হতো তাদের যেন সে দেখতেই পায় নি। তারা যখন দু দিনের, তিনটে বাচ্চা তখন মরে গেল। আমি কিন্তু চতুর্থটাকে নিয়ে এলাম। সেটা ছিল সবচেয়ে ছোট্ট। তাকে বাঁচাবার জন্যে ঠিক সময় মতো নিয়ে এসেছিলাম।

বাচ্চাটার শরীরটা খুব ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, নড়ছিল না। তার দুর্বল নিশ্বাস না পড়লে মনে হতো যে সে বুঝি মরে গেছে। প্রথম কর্তব্য ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে গরম করা। কিন্তু আমি জানতাম না কোথায় ও কীভাবে গরম করা যায়। তারপর মনে পড়লো উটপাখীর বাড়ীতে একটা ইনকুবেটর আছে। তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে, ইনকুবেটরের মধ্যে জায়গা করে, একটা তাকের উপর কাপড় বিছিয়ে বাচ্চাটাকে রাখলাম।

সেদিন আমি বাড়ী যাই নি, বাচ্চাটাকে দেখাশোনা করার জন্যে থেকে গেলাম। যাতে কেউ দুর্ভাবনা না করে সেই জন্যে বাড়ীতে টেলিফোন করে বললাম, ‘কালকে আসবো একটা সিংহছানা নিয়ে।’ কথা শুনে মা আঁৎকে উঠলেন। প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন তাঁর হাত থেকে রিসিভারটা নিলো, আর যখন শুনলো আমি একটা সিংহকে বাড়ীতে আনতে চাই তখন সে ভীষণ হৈ-হল্লা শুরু করে দিলো। ব্যাপার কী দেখবার জন্যে সবাই এলো দৌড়ে। তারপর তারা সবাই মিলে একসঙ্গে এই বলে চেঁচাতে লাগলো যে ফ্ল্যাট থেকে আমাকে তাড়িয়ে

---

* কিনুলি — মানে পরিত্যক্ত। — অনুঃ

দেওয়া উচিত, তারা পুলিশের কাছে অভিযোগ করবে। এমন হৈ-চৈ শুরু হলো যে তাদের কথা না শুনে আমি রিসিভারটা রেখে দিলাম।

পরের দিন আমি বাড়ী চললাম আমার নতুন শিশুকে নিয়ে।

তখন বৃষ্টি পড়ছিল, ঠান্ডাও ছিল খুব। গরম রাখার জন্যে বাচ্চাটাকে আমার কোটের ভিতরে রেখে আমি একটা ট্রামে চড়লাম। আমি জানি না ট্রামের গতির জন্যে, কিম্বা আমার কোটের ফারের আস্তরের জন্যে ছানাটার মা'র কথা মনে পড়েছিল কি না। হঠাৎ সেটা ছটফট করতে শুরু করলো। ছানাটাকে চাপড়ে শান্ত করার জন্যে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করলাম কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না। বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে সে তার ধারালো থাবা দিয়ে আমাকে আঁচড়াতে লাগলো, তারপর অকস্মাৎ তীক্ষ্ন স্বরে মিউ মিউ করে উঠলো।
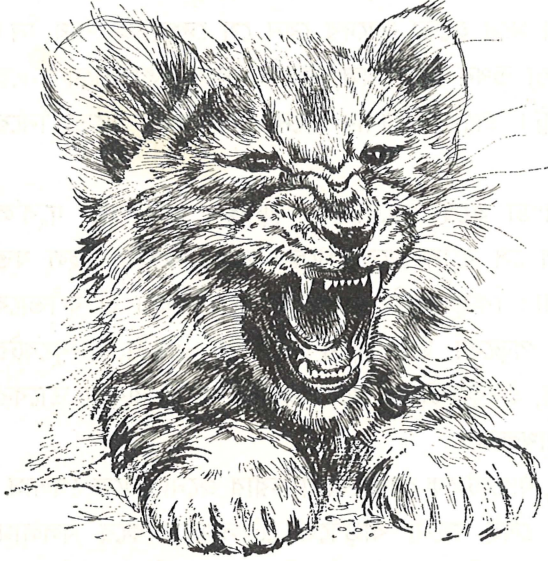
সবাইকার মাথাই আমার দিকে ফিরলো। আর সব যাত্রীরাই আমার দিকে তাকিয়ে রইলো বিস্ময়ে। কন্ডাক্টরের মনোযোগ আকর্ষণ না করার জন্যে আমি ট্রামের সামনের দিকে তাড়াতাড়ি চলে গেলাম।

একটি লোক এলো আমার পিছন পিছন। নানারকম গলাখাঁকারি দিয়ে অবশেষে সে আমাকে প্রশ্ন করলো আমার কোটের ভিতর থেকে ঐ ধরনের অদ্ভুত চিৎকার কে করেছে। তাকে আমি বাচ্চাটা দেখালাম আর বললাম কোথা থেকে সেটা এসেছে। তাকে অনুরোধ করলাম এটার কথা কিছু না বলতে, কারণ আমার ভয় হচ্ছিল তাহলে ট্রাম থেকে নামিয়ে দেবে। স্পষ্টতই সে তার কথা রাখে

নি, পুশকিন স্কোয়ারে আমরা পেঁছবার আগেই সব যাত্রীরা এলো একবার করে দেখার জন্যে। সবাই সিংহছানাটাকে দেখতে চাইলো, আর আমি যখন নামছিলাম তখন কন্ডাক্টর বাইরে ঝুঁকে চেঁচিয়ে আমাকে বললো:

'আমাকে কেন সিংহছানাটা দেখান নি ?'

তাই ছানাটাকে তাকেও দেখাতে হলো।

বাড়ী যাবার আগে এক ওষুধের দোকানে গেলাম। একটা রবারের নিপ্‌ল্‌ কিনতে চেয়েছিলাম, যা দিয়ে শিশুদের খাওয়ানো হয়। আমি শুধু চেয়েছিলাম সেটা যেন বেশ নরম হয়। উপযুক্ত একটা নিপ্‌ল্‌-এর জন্যে আমি অনেকক্ষণ ঘুরলাম। কোনোটা ছিল খুব শক্ত, কোনোটা খুব বড়, কোনোটা আবার খুব ছোট। দোকানের মেয়েটি আমাকে একের পর এক দেখাতে লাগলো। কিন্তু কিছুতেই আমি পছন্দ মতো নিপ্‌ল্‌ খুঁজে পেলাম না। অবশেষে মেয়েটি ধৈর্য হারিয়ে আমাকে বললো যে, যেহেতু আমি নিপ্‌ল্‌ বাছতে পারছি না সেহেতু স্বয়ং মা'র আসা দরকার। তাই তাকে আমায় বলতে হলো যে মা হচ্ছে খাঁচায় বন্দী এক সিংহী, তাই সে আসতে পারবে না। বললাম যে-সব মিনিট নষ্ট হচ্ছে তার জন্যে হয়তো ছানাটা মরে যেতে পারে। প্রমাণ স্বরূপ আমি তাকে সিংহছানাটা দেখালাম।

আমি একেবারেই আশা করি নি যে এতে ওরকম ফল হবে। পরের মিনিটেই দোকানের সবগুলো নিপ্‌ল্‌ আমার সামনে জড়ো হলো। নিঃসন্দেহেই ইতিপূর্বে দোকানের মেয়েটি কখনো জন্তু বাচ্চাদের জন্যে জিনিস সরবরাহ করে নি।

মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা একটি উপযুক্ত নিপ্‌ল্‌ পছন্দ করলাম, আর সেটা নিয়ে বাড়ী চলে এলাম।

বাড়ীতে সবাই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু সেদিন কাউকেই আমি ছানাটা দেখালাম না। বাচ্চাটার থাকার একটা জায়গা তৈরি করতে হলো। নিজেই তাকে গরম করলাম, তারপর খাওয়ালাম। আমার কাছে এমন কোনো বাক্স ছিল না যাতে কাজ চলে। আমার ছেলে তলিয়া যখন একটা স্যুটকেশ আজাড় করছিল আমি তখন আমার কোটের ফারের আস্তরটা ছিঁড়ে ফেললাম।

সেটা ছিল সিংহীটার লোমের মতো। তার উপর কিন্‌লি শান্ত হয়ে শুয়ে রইলো। নবজাত জন্তুদের দেহের মধ্যে যথেষ্ট তাপ জমে না। সবাই আমরা দেখেছি, নিজের শরীরের উত্তাপ দিয়ে গরম করার জন্যে ছানাগুলোকে কুকুর নিজের শরীরের তলায় রাখে। সিংহছানাটার মা নেই। তাই ফারের তলায় আমি গরম জলের বোতল রাখলাম। আর এই বাসাটার মধ্যে ছানাটা এমনভাবে শুয়ে রইলো যেন সে তার মায়ের পাশে রয়েছে।

আমার ঘরে একটা সিংহ রয়েছে এই খবর তাড়াতাড়ি সমস্ত বাড়ীময় ছড়িয়ে পড়লো। অপরিচিত লোকেরা আসতে লাগলো আমার দরজায়, মাঝে মাঝে একলা, মাঝে মাঝে দল বেঁধে। অনাহূত হয়ে আসার জন্যে তারা ক্ষমা চেয়ে ছানাটাকে দেখতে চাইতো, কিন্তু সিংহছানাটাকে দেখার পর তারা হতো হতাশ, — বড়সড় সিংহের মতো দেখতে সেটা একেবারেই নয়। আগ্রহ সহকারে বহুক্ষণ ধরে তারা তাকে দেখতো, তারপর

জানাতো আমাকে ধন্যবাদ। আর যেরকম সাবধানে ঘরে ঢুকতো, সেরকম সাবধানেই যেতো বেরিয়ে। যাবার আগে তারা আমাকে উপদেশ দিতো খুব সাবধান হতে, পাছে সিংহটা বড় হয়ে আমাকে না খেয়ে ফেলে।

আমার ঝি মাশা ছাড়া ফ্ল্যাটের সবাইকার কাছেই কিনুলি খুব প্রিয় হয়ে উঠলো। প্রথম থেকেই মাশার ছানাটাকে পছন্দ হয় নি। দর্শকদের জন্যে সমস্ত দিন তাকে দরজা খুলতে হতো, তারা চলে গেলে হতো দরজা বন্ধ করতে। তাছাড়া তাকে ঘরটা পরিষ্কার করতে হতো, কারণ কিনুলি জিনিসপত্তর ভারি ঘেঁটে ফেলতো। আমাদের ছোট ঘরটা নার্সারি আর ল্যাবরেটরির মাঝামাঝি হয়ে উঠলো: সর্বত্রই দেখা যায় তুলো, ভেসলিন, বরিক এ্যাসিড, রবারের নিপ্‌ল্‌, পিচকিরি, সত্যি বলতে কি, শিশুকে মানুষ করার জন্যে যা কিছু লাগে তার সবকিছুই — ছানাটার অনেক জিনিসের দরকার হতো।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় কিনুলিকে আমি খাওয়াতাম। সে জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে আমি দিতাম এক বোতল গরম দুধ। বোতলটা ছিল ছোট্ট, তাতে বড় দু'চামচের বেশী দুধ ধরতো না। কিনুলিকে ঘন ঘন খাওয়াতে হতো, কারণ প্রতিদিন এক লিটার করে দুধ সে খেতো। সেটাকে সিংহের দুধের মতো করার জন্যে মেশাতাম পাতলা ক্রীম। ছানাটা বোতলটাকে তৃপ্তভাবে থাবা দিয়ে স্পর্শ করতো আর দুধটা খেতো জোরে জোরে চকচক শব্দ করে।

দিনরাত তার ওপর নজর রাখার দরকার হতো।

কিনুলি ঘুমিয়ে পড়লে সমস্ত ফ্ল্যাটটা নিস্তব্ধ হয়ে যেতো। প্রত্যেকেই হাঁটতো পা টিপে টিপে আর কথা কইতো ফিসফিস করে। বড়দের মতো ছোটরাও ছানাটার ঘুমের ব্যাঘাত করতো না। একমাত্র মাশারই এ বিষয়ে হুঁস ছিল না। ইচ্ছে করেই সস্‌প্যানটাকে সে ঠুকে রাখতো আর বিড়বিড় করে বলতো: 'বাড়ীর মধ্যে যত রাজ্যের আপদ জোটানো', আর 'আপদটা' শান্তভাবে স্যুটকেসের মধ্যে শুয়ে তার নিপ্‌ল্‌টা চুষতো। এমন কি ঘুমের মধ্যেও এমন অধ্যবসায় সহকারে সে চুষতো যে রিংটার ঘষা লেগে তার নাকে ঘা হয়ে গিয়েছিল। ফলে নিপ্‌ল্‌টাকে হয়েছিল সরিয়ে নিতে। কিন্তু কিনুলির সেটাতে এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল

যে সে একেবারেই ঘুমতে পারতো না, করুণ স্বরে চিৎকার করে ক্রমাগত সে বায়না করে যেতো।

ছেলেমেয়েরা অবস্থাটা সামলালো। পালা করে তলিয়া, লিওনিয়া, স্লাভিক, গালিয়া আর ইউরা কিনুলির কাছে বসতো। তাকে খাওয়াবার আর যাতে সে চিৎকার না করে সেটা দেখার জন্যে এমন কি তারা একটা তালিকা বানিয়েছিল যারা পাহারার কাজে থাকবে তাদের নিয়ে। ছেলেদের উপর যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল সেটা নিয়ে তারা খুব গর্ব বোধ করতো, আর বন্ধু মহলে খুব বড়াই করে বলতো যে তাদের বাড়ীতে একটা সিংহের ছানা আছে।

তখন আমি শুরু করলাম একটা কুকুর খুঁজতে। আমার পক্ষে কিনুলিকে দেখা কঠিন হয়ে উঠেছিল, একটা কুকুর থাকলে সাহায্য হতো। বহু খোঁজাখুঁজির পর পেরিকে আমার পছন্দ হলো। পেরি ছিল মেষপালক কুকুর, সে থাকতো চিড়িয়াখানায়। তার বাচ্চা ছিল না, কিন্তু মনটা ছিল ভারি নরম আর প্রকৃতিটা শান্ত। কখনো সে জন্তুদের পেছনে লাগতো না, এমন কি একবার একটা ডিঙ্গোকে দুধও খাইয়েছিল।

প্রথমটায় নতুন ছানাটির ওপর পেরির সন্দেহ ছিল। তার দেখা জানোয়ারদের মতো একটুও সে নয়। যখন আমি সিংহছানাটাকে তার পাশে রেখেছিলাম পেরি গরগর করে উঠেছিল আর চেষ্টা করেছিল পালাতে। তাকে জোর করে ধরে রাখতে হয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ এই অদ্ভুত পালিত শিশুর উপর তার মায়া পড়ে গেল, তাকে সে শুরু করলো চাটতে, তার মানে কিনুলিকে সে পুষ্যি নিয়েছে। তাকে কামড়ানো কিম্বা ফেলে পালানোর আর কোনো বিপদ রইলো না। যখন অপরিচিত লোকেরা তাদের কাছে আসতো পেরি এমন কি উদ্বিগ্ন হয়ে গরগর করতো, যেন ভয় পেতো কেউ ছানাটাকে রাগিয়ে দেবে। সে সময়ে কুকুরটার কোনো ছানা ছিল না, কিন্তু অকস্মাৎ তার মধ্যে মাতৃত্ব জেগে উঠেছিল।

কিনুলি তখন আলমারির মধ্যে ড্রয়ারে ঘুমোয়। তখনো আমি রাত্রে তার বিছানায় বোতলে গরম জল রাখি, কিন্তু অত ঘন ঘন তাকে আর খাওয়াই না। সে বাড়তে লাগলো — সত্যি বলতে কি খুব ধীরে ধীরে। সে বাঁচবে না বলে আমার আর

ভয় হতো না, সবচেয়ে বিপদের সময় কেটে গেছে। আবার আমি দু-একঘণ্টার জন্যে কাজে যেতে শুরু করলাম। মাশা আগের মতোই চটে ছিল। যখন আমি বাইরে যেতাম তখন রেখে যেতাম ছোট ছোট সহকারীদের ছানাটার উপর নজর রাখার জন্যে।

ছ'দিন যখন তার বয়েস তখন কিনুলির চোখ ফুটেছিল। প্রথমে বাঁ চোখ, তারপরে ডান। তার চোখগুলো ছিল যেন শুধু কাটা দাগ, আর সেগুলো ছিল ভারি ঝাপসা। কানগুলো খাড়া হয়ে উঠতে শুরু করলো। আর উজ্জ্বল লাল ঠোঁটগুলো হয়ে উঠতে লাগলো ফ্যাকাশে। কিনুলি সর্বদাই আমাকে চিনতে পারতো। সে দুধই খাক, ঘুমাক, কিম্বা পেরির পাশে বিশ্রাম করুক, তার দিকে আমি হাত বাড়ালেই সে যা করছিল সেটা ছেড়ে আমার কাছে চলে আসতো গুটি-গুটি।

আমার ছোট্ট ছেলে তলিয়া ছানাটার সব চালচলন লক্ষ্য করতো। 'দেখো মা, দেখো। মিয়াও-মিয়াওটা আমার আঙুল চাটছে!', 'মা, ও গুটি-গুটি আসছে, ও মাথাটা ঘুরিয়েছে।' ছানাটার নাম যখন আমি কিনুলি রেখেছিলাম তলিয়া তখন খুব চটে উঠেছিল। 'কিন্তু আমরা তো ওকে ভালোবাসি, আমরা তো ওকে ছেড়ে চলে আসি নি।' — আপত্তি জানিয়ে সে বলেছিল। — 'ওকে 'মিয়াও-মিয়াও' বলে ডাকা যাক, কিম্বা 'নীল চোখ' বলে।' কিনুলির চোখগুলো বাস্তবিকই নীল ছিল। এতো নীল যে চোখের তারাটা প্রায় দেখাই যেতো না। কিনুলি ভালো দেখতে পেতো না। ঘরের মধ্যে ঘোরাঘুরি করার সময় সব জিনিসের সঙ্গে সে ধাক্কা খেতো। চেয়ারের পায়াটার সঙ্গে তার মাথা ঠুকতো, আর কী করে সেটাকে ঘুরে যেতে হয় না জানায় সে খানিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতো, তারপর আসতো ফিরে। হাঁসের মতো হেলেদুলে কিনুলি চলতো। তার থাবাগুলোর জন্যে সে পেতো বাধা। আর যখন সে পড়তো, পাশের দিকে পড়তো না, পড়তো সোজা পিঠের ওপর, যন্ত্রের পুতুলের মতো।

অদ্ভুত বাসিন্দা

প্রত্যহ সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র থেকে আমার কাছে চিঠি আসতো। ছেলে, বুড়ো, মেয়ে সবাই লিখতেন আমাকে। নানা ধরনের পেশার লোক। উত্তরের জন্যে তাঁরা পাঠাতেন নিজেদের ঠিকানা লেখা খাম, পাঠাতেন নিজেদের ফটোগ্রাফ, আর কিনুলির উপর কবিতা। প্রত্যেকেই তাঁরা উত্তর চাইতেন।

আর কী সব প্রশ্নই না তাঁরা করতেন!

কেউ কেউ ভয় পেতেন যে কিনুলি আমাদের খেয়ে ফেলবে। তাঁরা প্রশ্ন করতেন, বাড়ীতে সে কেমন ব্যবহার করে, আর কত দিন তাকে আমি রাখতে ইচ্ছে করি। তাঁরা আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যে রেডিওতে আরো ঘন-ঘন যেন তার কথা আমি বলি। আর তার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই যেন একটা বই লিখি। এমন কি এমন অনেক জন্তু-প্রিয় লোকরা ছিলেন যাঁরা আমাকে প্রশ্ন করতেন কোথায় তাঁরা প্রতিপালন করার জন্যে আর একটি সিংহছানা পেতে পারেন, আর সেটা যদি অসম্ভব হয় তাহলে তাঁদের কোন্ জন্তু পুষতে আমি পরামর্শ দিই।

প্রথম প্রথম এই সব চিঠির উত্তর দিতে আমি চেষ্টা করতাম, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে সে প্রচেষ্টা আমাকে ছাড়তে হলো। এতো বেশী চিঠি আসতো যে সেগুলো আমাদের চিঠির বাক্সে ধরতো না, আর পিয়ন অনুযোগ জানাতো যে সে শুধু আমাদের জন্যেই কাজ করে।

খবরের কাগজের রিপোর্টারদেরও কিনুলি সম্বন্ধে উৎসাহ ছিল। প্রায় প্রতিদিন তাঁরা আমাদের বাড়ীতে আসতেন। কিনুলির খাবার, ঘুমোবার এবং পেরি কর্তৃক তার গা চাটার ফটো তাঁরা তুলতেন।

মাশা তখনও কিনুলিকে নিয়ে গজগজ করে, কিন্তু আগে যত করতো তত নয়। এমন কি আমাকে সে সাহায্য করতেও শুরু করলো, এবং একদিন অকস্মাৎ আমাকে সে বললো চিড়িয়াখানা থেকে আর যেন আমি সহকারী না ডাকি। 'তোমার ছেলের বিষয়ে আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে, আর এখন কি না এই ধরনের একটা আপদ সম্বন্ধে আমাকে বিশ্বাস করতে তুমি ভয় পাও। ভয় পেয়ো না, ওরা যেরকম পারে আমিও ঠিক সেরকম দেখাশোনা করতে পারবো।' বাস্তবিকই মাশা কিনুলির দেখাশোনা খুব ভালো করতো। তাকে সে সময় মতো খাওয়াতো, তলিয়া যখন শিশু ছিল তখন তাকে যেভাবে খাওয়াতো ঠিক সেইভাবে। কিনুলির খাবার পাত্রগুলো চকচক করতো আর যে গামছা দিয়ে ছানাটাকে সে মুছতো, সর্বদাই সেটা থাকতো কাচা। কিনুলি দুধ খাবার সময় মাশার হাতে থাবাগুলো বোলাতো, তাতে গভীর আঁচড়ের দাগ পড়তো, কিন্তু এতে মাশা চটে উঠতো না। এমন কি সে কিনুলির জন্যে কাঁথা তৈরি করেছিল আর তাকে ডাকতে শুরু করেছিল আপদের বদলে ব্যাঙাচি বলে।

ছানাটার মাথাটা বাস্তবিকই ছিল খুব বড়, পাগুলো ছোট ছোট আর মোটা, দেহটা লম্বা। প্রথম প্রথম তার সব রকম চিৎকারই আমার এক রকম লাগতো, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাদের পার্থক্য আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম। তার চিৎকার থেকে কিনুলির সব রকম মেজাজের কথা আমি বুঝতে শিখলাম — কী সে চায়, কী সে অনুভব করে।

একদিন কিনুলি অসুস্থ হয়ে পড়লো। সেটা আমি লক্ষ্য করলাম যখন তখনও সে প্রফুল্ল ছিল। আমার পরিবারের সবাই আমাকে ঠাট্টা করতে লাগলো,

বলতে লাগলো এটা আমার কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু দেখা গেল আমার কথাটাই ঠিক। পরের দিন কিনুলি বিছানায় শুয়ে রইলো, খেতে চাইলো না। দশদিন সে অসুস্থ ছিল। ঐ সময়টা রাত্রে আমি প্রায় ঘুমতাম না, লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতাম, তার শ্বাস-প্রশ্বাস শুনতাম, গরম জলের বোতলগুলো দিতাম বদলে।

সকালে প্রতিবেশীরা দরজায় মৃদু টোকা দিয়ে প্রশ্ন করতো রোগী কী রকম আছে।

সেরে ওঠার পর কিনুলি যখন আরো একটু বড় হয়ে উঠলো, তাকে আমি বাড়ীর বাইরে যেতে দিতে শুরু করলাম। যাতায়াতের পথ, স্নানের ঘর আর রান্নাঘরে সে শান্তভাবে চলা ফেরা করতো, প্রত্যেকেই পা ফেলতো সাবধানে, যাতে তাকে মাড়িয়ে না দেয়। কিনুলি বাসিন্দাদের সবাইকে চিনতো। এমন কি তার পছন্দ-অপছন্দও ছিল। তার প্রিয় লোকদের ঘরে সে যেতো, আর তাদের দেখাতো প্রচুর ভালোবাসা; অন্যদের সে উঠতো ফুঁসিয়ে — বিশেষ করে একটি মহিলাকে, যার গলার স্বরটা ছিল জোরালো আর কর্কশ। মনে হতো ছানাটা সেটা পছন্দ করে না। ফ্ল্যাটের সবাইকার পায়ের শব্দ কিনুলি চিনতো। কিনুলি যখন নেহাৎ ছোট্ট তখন একজন প্রতিবেশী কোথাও চলে গিয়েছিলেন, তিনি যখন ফিরে আসেন কিনুলি তখন দু'মাসের। কিনুলি তাঁর পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠেছিল, কানগুলো অস্থিরভাবে নাড়াতে নাড়াতে চুপি চুপি গিয়েছিল দরজাটার কাছে, আর শুনেছিল অনেক অনেকক্ষণ ধরে।

কিনুলি আমার স্বর, আমার পায়ের শব্দ আর আমার গন্ধ চিনতো। যে মুহূর্তে আমি ঘরে আসতাম সে দৌড়ে আমার কাছে এসে তার গা'টা আমার গায়ে ঘষতো।

কিনুলি ছিল ভারি ফুর্তিবাজ আর সে খেলা করতেও ভালোবাসতো। মাঝে মাঝে ছেলেরা তাকে আসতো দেখতে, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে চাবির ফুটো দিয়ে তারা ফিসফিস করতো: 'কিনুলি! এখানে আয়, কিনুলি।' কিনুলি লাফিয়ে উঠতো, যেন তাদের কথা সে বুঝতে পেরেছে, তারপর ছুটে যেতো দরজাটার কাছে। পিছনের থাবাগুলোয় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের একটা থাবা দিয়ে সে

হাতলটা টানতো, দরজাটা খুলতো আর এক লাফে বেরিয়ে যেতো করিডরে। কিন্তু কাউকেই দেখা যেতো না — ছেলেরা পড়তো লুকিয়ে। কিনুলি তাদের খুঁজতে শুরু করতো। সব জায়গায় সে খুঁজতো — স্নানের ঘরে, দরজার পিছনে, বারান্দায়। তাদের খুঁজে বার করবার পর তার পালা হতো লুকোবার। তার প্রিয় জায়গা ছিল আলমারির পিছনটা। সেখানে সামান্যই জায়গা ছিল, কোনো রকমে ঠেলে ঠুলে সে ঢুকতো। ছেলেমেয়েরা জানতো সিংহছানাটা কোথায় লুকিয়েছে, কিন্তু তারা একথাও জানতো যে খুব তাড়াতাড়ি তাকে খুঁজে বার করা তাদের উচিত হবে না, তাতে সে চটে উঠবে, খেলতে চাইবে না। ছেলেমেয়েরা ঘোরাঘুরি করতো, হাসতো আর এমন ভাব দেখাতো, যেন তাকে তারা খুঁজে বার করতে পারছে না। 'কিনুলি কোথায় ?' — পরস্পরকে তারা প্রশ্ন করতো। — 'কিনুলি কী হয়েছে ?' এইভাবে তারা তাকে খুঁজে চলতো যতক্ষণ না সে নিজে লাফিয়ে বেরিয়ে আসতো।

তাদের প্রিয় খেলা ছিল 'সিংহ-শিকার'। করিডরে ছেলেমেয়েরা দু'দল হতো, একেক দল থাকতো একেক দিকে, আর কিনুলি থাকতো মাঝখানে। সে শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করতো। তারপর ছানাটার পাশ দিয়ে ইউরা যেতো দারুণ জোরে দৌড়ে। বেড়াল যেরকম ইঁদুরের ওপর লাফিয়ে পড়ে কিনুলি সেইভাবে লাফাতো তার উপর। যদি তার পা-টা সে ধরতে পারতো তাহলে তার মানে হতো শিকারী নিহত হয়েছে, যদি তাকে সে শুধু স্পর্শ করতে পারতো তাহলে তার মানে হতো সে আহত হয়েছে। আর সে যদি পালাতে পারতো তাহলে তার মানে হতো যে কিনুলি খেলায় হেরে গেছে। কিন্তু কদাচিৎ সে হারতো। আর যখন সে বড় হয়ে উঠেছিল তখন কখনো সে ফসকায় নি — তার পাশ দিয়ে কেউ দৌড়ে পালাতে পারতো না।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কিনুলি অনেক মজা করতো। গ্রীষ্মকালে তারা যখন সহরতলীতে চলে যেতো তাদের জন্যে তার কী মন কেমনই না করতো! একবার তলিয়া আর মাশাও চলে গিয়েছিল। তলিয়া ট্রেন থেকে লিখেছিল: 'মা-মণি, আমি বুঝতে পারছি না, যাবো না ফিরে আসবো, কিনুলি না থাকায় কিছু ভালো লাগছে না।' কিনুলিরও খুব খারাপ লেগেছিল। সমস্ত দিন ধরে দৌড়

ঝাঁপ করতে আর খেলতে সে অভ্যস্ত ছিল, আর এখন আমি যখন কাজে যেতাম সে একলা থাকতো পেরির সঙ্গে। পেরি ছিল শান্ত প্রকৃতির কুকুর, খেলাধুলো বিশেষ কিছু করতো না। তখন আমি স্থির করেছিলাম কিনুলির সঙ্গী হিসেবে একটা বাচ্চা বনবেড়াল নিয়ে আসতে।

তাস্‌কা

কিনুলির মতো তাস্‌কাও চিড়িয়াখানায় জন্মেছিল। তার মা হলো হলদে রঙের বিরাট একটা বনবেড়াল। প্রথম দু'মাস নিজের বাচ্চাদের ভালো করে সে দেখাশোনা করেছিল। সে তাদের গা চাটতো,খাওয়াতো, আর কোনো দর্শক খুব কাছে গেলে খাঁচার শিকের উপর লাফিয়ে পড়তো। বনবেড়ালের বাচ্চাগুলো চমৎকার বড় হয়ে উঠছিল। ইতিমধ্যেই তারা মাংস খেতে পারতো, আর নিজেদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতো খেলা করতে। তারা খেলা করতে বেরুলে খাঁচার সামনে ভিড় জমে যেতো। প্রত্যেকেই দেখতে চাইতো এই ছোট ছোট জন্তুগুলোর খেলা, আর চেষ্টা করতো যথাসম্ভব কাছে আসতে। সম্ভবত এই কারণেই মা বাচ্চাগুলোকে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করেছিল। বাচ্চাদের একটাকে দাঁতে কামড়ে সেটাকে নিয়ে খাঁচার মধ্যে সে ছুটোছুটি শুরু করলো। বাচ্চাটা লাগলো ছটফট আর আর্তনাদ করতে, দর্শকরা লাগলো চেঁচাতে, কিন্তু কিছুতেই তাকে সে ছাড়লো না। এক পরিচারক যখন দৌড়ে এলো ততক্ষণে খুব দেরি হয়ে গেছে — বনবেড়ালের বাচ্চাটা মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে মেঝের উপর, আর তাদের মা পরেরটাকে নিয়েছে তুলে। বহু কষ্টে পরিচারক তার কবল থেকে বাচ্চাটিকে উদ্ধার করলো।

তার সামনের থাবার একটা গিয়েছিল ভেঙে, আর তার আহত চোখটার উপর ছিল একটা সরের মতো আবরণ। বনবেড়ালের ছানাগুলোর মধ্যে সেটাই ছিল সবচেয়ে দুর্বল, অতি নগণ্য, রোগা ছোট্ট একটা জন্তু। ঘরের মধ্যে সেটা লুকিয়ে পড়তো আর সেখানে থাকতো সমস্ত দিন ধরে।

বনবেড়ালের ছানাটার অবস্থা এতো খারাপ ছিল যে আমি স্থির করলাম সেটাকে বাড়ীতে নিয়ে যেতে। পরের দিন ডিরেক্টরের অনুমতি পেয়ে ছানাটাকে আমি একটা কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে এলাম। আমার ফ্ল্যাটের দরজার কাছে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় না ভেবে আমি পারলাম না যে আমার অভ্যর্থনাটা কী রকম হবে? যখন আমি ঘরে ঢুকলাম তখন আমার স্বামী চোখ তুলে তাকালেন, কী বাড়ীতে এনেছি সে কথাটা অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে। বনবেড়ালের ছানাটাকে বার করতেই তিনি হুঙ্কার ছাড়লেন: 'ঐ ছোট্ট কুৎসিত জিনিসটা কী? তোমার কী সিংহতেও আশ মেটে না? কাল তুমি একটা হাতি নিয়ে আসবে দেখছি।' এতে আমার সহ্যের সীমা ভেঙে গেল: 'প্রথমত, এটা কোনো কুৎসিত জিনিস নয়, এটা একটা বনবেড়ালের বাচ্চা। দ্বিতীয়ত, ঘরটা যদি আর একটু বড় হতো তাহলে নিশ্চয়ই আমি একটা হাতিও নিয়ে আসতাম।' উনি কোনো উত্তর দিলেন না, শুধু একটা হতাশার ভঙ্গি করে মুখ ফেরালেন। পরমুহূর্তে কিন্তু বনবেড়ালটার জন্যে জায়গা করে দিতে তিনি আমাকে সাহায্য করলেন।
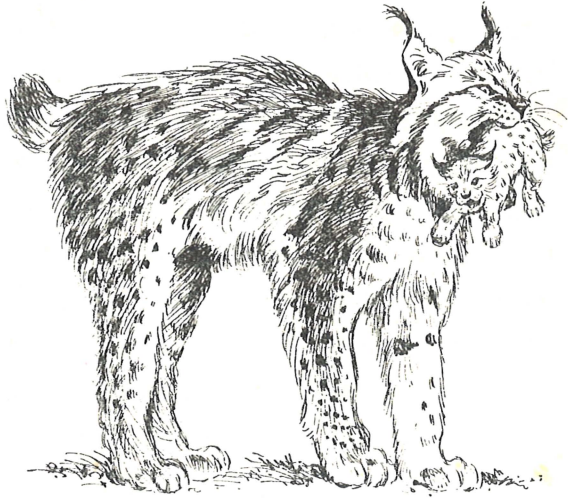
সেটাকে আমরা একটা বাক্সের মধ্যে ভরলাম, এক রেকাবী দুধ ও তার পাশে কিছু মাংস দিলাম রেখে, তারপর তক্তা দিয়ে সেটাকে দিলাম ঢেকে। নতুন পালিত শিশুটির কথা প্রতিবেশীদের জানানো হলো না। কিনুলিকে তাদের সয়ে গেছে, তাকে তারা ভালোও বাসে, কিন্তু কে বলতে পারে বনবেড়াল সম্বন্ধে তারা কী বলবে?

আমার স্বামী বনবেড়াল সম্বন্ধে আমাকে নানা প্রশ্ন করলেন আর ঘোষণা করলেন যে বনবেড়ালের এই ছানাটাকে তিনি পোষ্য নেবেন। সেটার নামকরণ তিনি করবেন, সেটার দেখাশোনা তিনি করবেন, সেটাকে তিনি পোষ মানাবেন -- যদি অবশ্য তাঁকে আমি ঠকিয়ে না থাকি, যদি সেটা বাস্তবিকই একটা বনবেড়াল হয়। পরের দিন আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী বিছানা ছেড়ে উঠেই ছুটে গেলেন তাঁর নতুন শিশুটিকে দেখার জন্যে। তিনি অত্যন্ত হতাশ হলেন। বনবেড়ালের ছানাটা তিনি যতটা ভেবেছিলেন মোটেই ততটা স্নেহপ্রবণ নয়। রাত্রে সেটা বাক্সটার ধারগুলো কামড়েছে আর দুধটাকে ফেলেছে উল্টে — মাংসটা সে স্পর্শও করে নি। বাচ্চাটার পিঠ চাপড়াবার জন্যে তিনি যখন হাত বাড়ালেন, সেটা তখন একটা কোণে পিছিয়ে গিয়ে গরগর করতে লাগলো। আর তার নামকরণ করতে গিয়েও তিনি সমান অসুবিধেয় পড়লেন। বহুক্ষণ ধরে আমাদের উত্তেজিত তর্ক হলো। আমার স্বামী চাইলেন বনবেড়ালের ছানাটাকে মুর্কা অথবা মুস্কা নামে ডাকতে, আর আমি চাইলাম তাকে ডাকতে তাস্কালি* বলে, কারণ তার মা তাকে মেঝের উপর টেনেছিল। শেষ পর্যন্ত আমরা স্থির করলাম তাকে তাস্কা বলে ডাকবো — 'উত্তরের তাস্কা'।

অশুভ পরিচয়

যে বাক্সটার ভিতর থেকে অদ্ভুত শব্দ এবং গন্ধ আসছিল সেটার উপর কিনুলির অত্যন্ত কৌতূহল হলো। এমন কি তার খিধে চলে গেল। বাক্সটার চারদিকে সে ক্রমাগত ঘুরে চলে আর সেটাকে শোঁকে। যখন আমি বনবেড়ালটার কিছু খাবার রাখার জন্যে একটা পাটা তুলতাম, কিনুলি উঁকি মেরে ভিতরটা দেখতে চেষ্টা করতো। বনবেড়ালটার চেয়ে সে অনেকটা বড় বলে আমার ভয় হতো যে সে হয়তো তাকে জখম করতে পারে। তাদের পরিচয় করানোটা আমি স্থগিত রাখলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাবনা করার প্রয়োজন ছিল না।

---

* 'তাস্কাৎ' ক্রিয়াপদ থেকে — মানে টানা। — অনুঃ

একদিন আমি বাক্সটাকে ঢাকতে ভুলে গিয়েছিলাম। যে মুহূর্তে আমি পিছন ফিরলাম কিনুলি সেই মুহূর্তে এসে খোলা জায়গাটার ভিতর দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে দিলো। বনবেড়ালটা দারুণ ভয় পেয়ে গেল। একটা কোণে লুকবার সে চেষ্টা করলো, আর লাগলো গরগর করতে। কিন্তু কিনুলি এটা লক্ষ্যই করলো না। বনবেড়ালটা ফোঁসফোঁস আর গরগর করতে লাগলো, আর কিনুলি মুখ ঢুকিয়েই চললো। তারপর বনবেড়ালটা একেবারে মরিয়া হয়ে উঠলো, আতঙ্কে তার চোখগুলো হয়ে গেল গোল গোল। অকস্মাৎ সেটা লাফিয়ে উঠে সিংহছানাটার মুখের উপর নখ আর দাঁত বসিয়ে দিলো। কিনুলি এতো আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল যে সে বাধা দেবার কোনো চেষ্টাই করলো না। পিছনে একবারও না তাকিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে করিডর দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড় দিলো। রান্নাঘরে পেঁছিবার পর সে সম্বিত ফিরে পেলো। সেখানে ল্যাজটাকে এপাশ ওপাশ আছড়াতে আছড়াতে আর ভীরু স্বরে মিউ মিউ করতে করতে সে পায়চারী করতে লাগলো। ইতিমধ্যে বনবেড়ালের ছানাটা তার কোণে ফিরে গিয়ে গুটিসুটি হয়ে রইলো, যেন কিছুই ঘটে নি।

সেদিন সন্ধেয় চিড়িয়াখানা থেকে একটা খাঁচা আনা হলো, আর বনবেড়ালের ছানাটাকে রাখা হলো তার মধ্যে। এই নতুন বাড়ীটা তাস্‌কার পছন্দ হলো না। বাক্সের মধ্যে পালাবার একটা অন্ধকার কোণ ছিল, জায়গা ছিল লোকদের কাছ থেকে লুকবার, কিন্তু এখানে সব সময়ই সে সবাইকার চোখের সামনে। শিকগুলোকে সে কামড়াতে লাগলো, চেষ্টা করলো খাঁচা ভেঙে পালাবার। সমস্ত রাত ধরে সে তীব্র কর্কশ গলায় চেঁচালো। পরের দিন সকালে প্রতিবেশীরা, যাদের গুপ্ত খবরটা বলা হয় নি, আমাকে প্রশ্ন করলো এবার আমি কী জন্তু এনেছি।

পরের রাত্রে তাস্‌কা আরো বেশী শব্দ করলো। এমন কি তার শব্দটা শোনা যেতে লাগলো দরজার বাইরেও। একটা গালচে, কম্বল, মাদুর আর কতকগুলো বালিশ দিয়ে আমরা খাঁচাটাকে ঢেকে দিলাম। সত্যিকথা বলতে কি আমার বিছানার সব কাপড়ই ব্যবহার করা হয়েছিল, কিন্তু তবু ওসব ভেদ করে তাস্‌কার কান্না শোনা যেতে লাগলো। সবাইকে থাকতে হলো জেগে। তারপর খাঁচাটাকে আমি বাইরের ছোট বারান্দাটায় রাখলাম। সে জায়গাটা অনেক চুপচাপ, কেউ কখনো

সেখানে যায় না। কিন্তু তবু তাস্‌কার ভয় গেল না। প্রত্যেকটি শব্দে চমকে চমকে উঠে সে লুকোতে চেষ্টা করে, আর আমাদের মধ্যে কেউ যখন খাঁচাটা পরিষ্কার করতে যায়, সে লাফিয়ে পড়ে আমাদের হাতগুলোকে কামড়ায়, আঁচড়ায়।

এই ছোট্ট বর্বরটাকে পোষ মানাবার জন্যে আমি কি না করেছি! তাকে আমি নিজে হাতে খাওয়াতাম, আমার সমস্ত অবসর সময় কাটাতাম তার সঙ্গে, আর তাকে যখন ছেড়ে যেতে হতো আমি চালিয়ে দিতাম রেডিওটা, যাতে তাস্‌কা অপরিচিত শব্দে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

অল্পদিনের মধ্যেই কিন্তু সে খানিকটা পোষ মানলো, এখন আর হাত বাড়ালে পালায় না, এমন কি নিজেকে সে স্পর্শ করতেও দেয়।

স্বাধীনতা

আমরা স্থির করলাম তাস্‌কাকে খাঁচার বাইরে ছেড়ে দিয়ে দেখতে হবে কী সে করে। কেউই জানে না তিনমাসের বুনো জন্তু চিড়িয়াখানার খাঁচা থেকে নিজেকে একটা ঘরের মধ্যে আবিষ্কার করলে কী রকম ব্যবহার করবে। তাস্‌কা কি সাবধানে বেরিয়ে এসে লুকবে, না কি সে ছুটোছুটি করবে আর চেষ্টা করবে পালাবার পথ খুঁজতে? আমি অত্যন্ত ঘাবড়ে পড়লাম। খাঁচাটার দরজা খোলার সময় বাস্তবিকই আমার হাত কাঁপতে লাগলো। তারপর আমি সরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তাস্‌কা সেখানে স্থির হয়ে বসে রইলো, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিটা হয়ে উঠলো তীক্ষ্ন আর মনে হলো তার শরীরটা যেন শক্ত হয়ে উঠেছে। তারপর তার শরীরটা শিথিল হয়ে এলো, সে আড়মোড়া ভাঙলো, উঠে দাঁড়ালো আর সতর্কভাবে এগিয়ে গেল দরজাটার কাছে। বহুক্ষণ ধরে মনস্থির করতে পারলো না দরজাটা পেরুবে কি পেরুবে না। প্রথমে সে একটা, পরে আর একটা থাবা বার করে চারিদিকে তাকালো। তাকে দেখতে ভারি মজা লাগছিল। অনায়াসেই সে বাইরে লাফিয়ে দৌড়ে পালাতে পারতো, কিন্তু তা না করে দোরগোড়াতেই সে রইলো। আমি তাকে একটা ঠেলা দিতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ তাস্‌কা

বেরিয়ে এসে আবার পিছিয়ে গেল। মনে হতে পারতো যে তার নরম থাবাটা গনগনে উনুন স্পর্শ করেছে, গালচে নয়, তাস্‌কা এতো ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সবকিছুই তার কাছে নতুন আর ভয়াবহ। গালচের উপর কয়েক পা সে সাবধানে হেঁটে থেমে গেল। আরো সামনে কাঠের মেঝে — চকচকে, মসৃণ, অপরিচিত। তাস্‌কা এগুলো আর কয়েকবার এলো ফিরে। এই ছোট্ট বনবেড়ালটা খুব সাবধানী। মনে হতে পারতো সে যেন রয়েছে এক গহন অরণ্যে, ঘরের মধ্যে নয়, আর যেন সর্বত্রই তার জন্যে বিপদ রয়েছে ওৎ পেতে।

নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে তার কিছু সময় গেল। কিন্তু স্বাধীনতা পেয়ে অল্পদিনের মধ্যেই তাস্‌কা গেল একেবারে বদলে।

সর্বত্রই তাকে দেখা যায়। মনে হলো এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে সে ঢুকতে পারে না। এক আলমারি থেকে আর এক আলমারির মাথায় সে লাফিয়ে বেড়ায়, ছবির ফ্রেমের উপর উঠে পড়ে, আর কখনো বাস্তবিকই ফর্তোচ্‌কার* ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পরের বাড়ীর জানালার কার্ণিশের উপর সে চলে যেতো। সত্যি কথা বলতে কি এমন ব্যবহার সে করতো যেন সে বনে বাস করছে, ঘরে নয়। অল্পদিনের মধ্যেই চিড়িয়াখানার তার ভাইদের চেয়ে সে বড়সড় হয়ে উঠলো। তার থাবাগুলো হলো সুন্দর, চোখগুলো পরিষ্কার, আর তার চামড়াটা চকচক করতে লাগলো রেশমের মতো। এমন কি তার চরিত্রটাও গেল বদলে। আগে আমি ঘরে এলে সে ফ্যাঁস করে আলমারির নীচে গিয়ে লুকতো। এখন আমার কাছে সে দৌড়ে আসে, তার শরীরটা ঘষে আমার পায়ে আর খুসির গরগর শব্দ করে। হুবহু বেড়ালের মতো সে গরগর করতো, শুধু কিছুটা জোরে।

* জানালার ভিতর দিয়ে বাতাস চলাচলের জন্যে ছোট ঘুলঘুলি। — অনুঃ
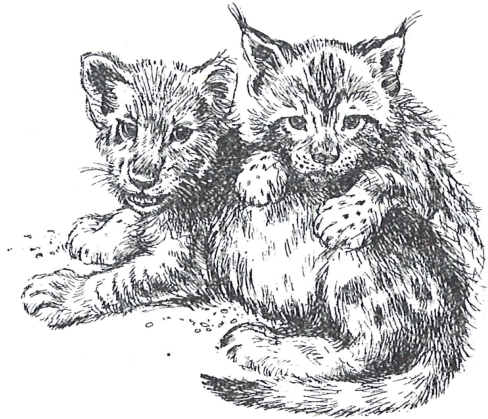
তাকে আমি খাওয়াতাম সেদ্ধ সব্জি, ডিম আর মাংস। মাংস খেতে কী ভালোই না সে বাসতো! মাংস ছিল তার প্রিয় খাদ্য। সে ভালোভাবেই জানতো কখন তার খাবার সময় হয়। সে অস্থির হয়ে উঠতো, দরজার কাছে থাকতো, চিৎকার করতো, আর যে মুহূর্তে আমি ঘরে ঢুকতাম, ছুটে আসতো আমার কাছে, যে টুকরোগুলো তার দিকে ছোঁড়া হতো সেগুলোকে সে নিপুণভাবে লুফে নিতো একটা লাফ দিয়ে, তারপর ফেলতো সেটাকে নিজের মুখের মধ্যে। সর্বদাই আলমারির তলায় ঢুকে সে তার খাবার খেতো।

মাংস খাবার আগে সেটা নিয়ে সে খেলা করতো — কখনো ছুঁড়তো সেটাকে উপর দিকে কিম্বা নিজের কাছ থেকে দিতো দূরে ঠেলে, তারপর ছুটতো সেটার পিছনে। তার থাবার মধ্যে মাংসের টুকরোটা মনে হতো যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বহুকাল ধরে তাস্‌কা ছিল একলা। আমি বুঝতে পারতাম সে একলা বোধ করছে। ছোট একটা কুকুরের মতো সে আমার পিছন পিছন দৌড়োতো। আর যখন আমি ঘরের বাইরে যেতাম সে আর্তনাদ করতো তীক্ষ্ন ও কর্কশ স্বরে। এটা তখন আর সেই মা-হারা হিংস্র জন্তুছানা নয়, এটা তখন হয়ে উঠেছিল একটা বাচ্চা বনবেড়াল, আর সব শিশুদের মতোই সেও চেয়েছিল সঙ্গী। তখন আমি স্থির করলাম, তাস্‌কা আর কিনুলির মধ্যে আবার ভাব করিয়ে দিতে হবে।

বিরুদ্ধ-প্রকৃতি

কিনুলি এমনভাবে ঘরে এলো যেন কখনো সেখানে কোনো বনবেড়ালের বাচ্চা থাকে নি। দৃঢ়, সাহসী পায়ে গালচের ধার পর্যন্ত সে এগিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়লো। প্রথমবারের অশুভ পরিচয়ের কথা মনে ক'রে, যেটা শেষ হয়েছিল মারামারিতে, আমি একটা পুরোনো তোয়ালে হাতের কাছে রেখেছিলাম, কিন্তু সেটার দরকার হয় নি। আলমারিটার তলা থেকে তাস্‌কার বদমাইসি ভরা গোল মুখটা উঁকি মারলো, আর তার চোখগুলো সিংহছানাটার চলাফেরা করতে

লাগলো অনুসরণ। তার কৌতূহলটাকে কোনো মতেই খারাপ ধরনের বলা যায় না। এই জন্তুদের ব্যবহার যাদের মধ্যে এতো মিল থাকা সত্ত্বেও বহু অমিল আছে, লক্ষ্য করা ভারি চিত্তাকর্ষক। কিনুলি একেবারে স্থির হয়ে শুয়ে রইলো, তার চোখ ছাড়া আর কিছুই নড়লো না। এদিকে তাসকা ক্রমাগত তার পাশ দিয়ে যেতে লাগলো দৌড়ে, মাঝে মাঝে তার থাবা দিয়ে করতে লাগলো তাকে স্পর্শ। কিন্তু সিংহছানাটা সামান্য নড়লেই তাস্‌কা তীরের মতো ছুটে পালাতে লাগলো আলমারিটার তলায়।

তখন থেকে প্রত্যহই তাদের আমি একত্রে থাকতে দিতাম। স্পষ্টতই কিনুলি তার অপমানটা ভুলে নি। সে এমন ভাব দেখাতো যেন বনবেড়ালটাকে সে লক্ষ্য করে নি, এদিকে তাস্‌কা তখন চাইতো বন্ধুতা পাতাতে। কিন্তু বহুকাল তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয় নি। অনেকদিন কাটার পর আমার পুষ্যিরা একসঙ্গে খেলা করতে শুরু করেছিল। প্রথম প্রথম তারা ছিল ভারি সাবধানী, পরস্পরকে তারা স্পর্শ করতো না, নিজেদের মধ্যে একটা দূরত্ব রাখতো। আলমারিটার তলা থেকে তাস্‌কা দৌড়ে আসতো, দারুণ জোরে ছুটে যেতো সিংহছানাটার দিকে, যেন সেটাকে সে তক্ষুণি ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে থেমে যেতো আর হঠাৎ এমন একটা আওয়াজ করতো যেটাকে শোনায় 'হুম'। এ শব্দটা ছিল খুব স্নেহপূর্ণ। মা যখন তার শিশুদের ডাকে তখন সে এই রকম শব্দ করে। তাস্‌কা কিনুলিকে বলতো যে তাকে সে আঘাত করতে চায় না।

প্রায়ই আমি বসে থেকে লক্ষ্য করতাম তাদের চলাফেরা, শুনতাম তাদের আওয়াজগুলো, আর চেষ্টা করতাম সেগুলো বুঝতে। মাঝে মাঝে আমি এ ব্যাপারে কৃতকার্য হতাম।

সিংহছানাটার দিকে তাস্‌কা কেন অমন শব্দ করে ছুটে যেতো? কেন সর্বদাই সে ছুটে যেতো কিনুলির মুখের কাছে? এর কারণ কি সেটা না করে সে পারতো না? না, না! বনবেড়াল তার নরম থাবায় ভর দিয়ে এমন নিঃশব্দে যেতে পারে যে তীক্ষ্নতম কানও তার শব্দ শুনতে পাবে না, আর বনবেড়াল তার শত্রুদের আক্রমণ করে পিছন থেকে। কিন্তু এ তার শত্রু নয়! তার বন্ধুও নয়! এখনো তারা পরস্পরকে ভালো করে চেনে না, পরস্পরকে বিশ্বাস করে না।

সিংহছানাটা হয়তো ভয় পেতে পারে, হয়তো পারে আঘাত করতে। তাকে সাবধান করে দেওয়া দরকার। আর তাস্‌কা তাকে করে সাবধান। তাদের লক্ষ্য করে নিজের মনে আমি বলতাম: 'এই পর্যবেক্ষণ হয়তো কাজে লাগতে পারে। যদি কখনো আমাকে কোনো জন্তুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হয় তাহলে তারা যেরকম ব্যবহার করছে আমিও সেরকম করবো।' জন্তুদের কাছ থেকেও শেখবার কিছু আছে। সর্বদাই আমি লক্ষ্য করি, সর্বদাই শিখি।

প্রতিদিন তারা পরস্পরের নিকটতর হতে লাগলো আরো সাহসের সঙ্গে। সাধারণ খেলাটা হলো কিনুলিকে তাস্‌কার আক্রমণ করা। সে ছিল নিপুণ আর তৎপর। সিংহছানাটার চারিদিকে রবারের বলের মতো সে লাফাতো। নিকট থেকে হতো সে নিকটতর। আর একদিন খুব বেশী দূর থেকে লাফিয়ে সে পড়লো গিয়ে কিনুলির উপর। কিন্তু না! তাস্‌কাকে আমি জানি। সে কিছুতেই ভুল করে নি। কতবার আমি মেঝের উপর একটা ফুটবল গড়িয়ে দিয়েছি, আর টেবিলের উপর থেকে শূন্যে তার থাবাগুলো ছড়িয়ে সেটার উপর সোজা সে পড়েছে লাফিয়ে, একবারও খুব বেশী দূর কিম্বা কম দূর লাফায় নি। এবার কি সে হিসেবে ভুল করেছে? আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে সেটা সে করেছে ইচ্ছে করে... কিন্তু ওরা দু'জনে কী ভয়টাই না পেয়েছিল! পরস্পরের কাছ থেকে ছিটকে তারা সরে গেল, যেন পরস্পরকে তারা ছ্যাঁকা দিয়েছে। অকস্মাৎ তাদের চোখগুলো ভীত, গোলগোল ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। আমি ভাবলাম এবার মারামারি লাগবে। কিন্তু তারপর এই ছোট ছোট ছানাগুলো মুহূর্তের জন্যে থেমে ঠাণ্ডা হয়ে এলো আর শুরু করলো খেলতে। এখন তারা অনেক বেশী স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে তাদের একটি অন্যটিকে যেন হঠাৎ ছুঁয়ে ফেলে, তারপর তারা পড়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, পরস্পরের দিকে তাকায় তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে, খেলাটা থাকে চলতে।
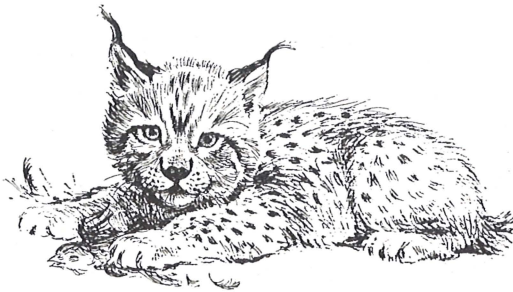
এইভাবে তাদের আলাপ শুরু হয়। আলাপ, বন্ধুত্ব নয়। বন্ধুত্ব হবার পক্ষে তাদের প্রকৃতিগুলো একেবারে আলাদা জাতের। হয়তো তোমরা বিস্মিত হচ্ছ এই ধারণায় যে জন্তুদের বিরুদ্ধ-প্রকৃতি থাকে। সত্যিই কি এটা সম্ভব? নিশ্চয়ই সম্ভব! তবে আমি জানি অনেক জন্তুর কথা, যারা পরস্পর একেবারে ভিন্ন ধরনের, কিন্তু তারা খুব ভালো মানিয়ে চলেছিল।

চিড়িয়াখানায় একই খাঁচায় থাকতো চারটে নেকড়ে আর একটা ছাগল। একসঙ্গেই তারা খেতো, খেলতো আর ঘুমতো। প্রায়ই নেকড়েরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতো, কিন্তু ছাগলটার সঙ্গে কখনো নয়। কিন্তু কিনুলি আর তাস্‌কা মানিয়ে চলতে পারলো না।

কিনুলি ছিল শান্ত প্রকৃতির, এমন কি সামান্য অলস ধরনের। সে খেলতে ভালোবাসতো, কিন্তু সর্বদাই তার এমন কিছুর দরকার হতো যেটাকে সে ধরতে পারে আর যেটাকে নিয়ে করতে পারে খেলা। তাকে রাগানো কঠিন ছিল, কিন্তু আরো কঠিন ছিল একবার রেগে উঠলে তার রাগ থামানো। কিনুলি বহুকাল ধরে উৎপীড়নকে মনে রাখতো। যদি তাকে আমি চটাতাম তাহলে সে ক্রুদ্ধ হয়ে আমার কাছ থেকে চলে যেতো, আর কয়েক দিন আমার কাছে আসতো না। তাস্‌কার প্রকৃতিটা ছিল একেবারে ভিন্ন ধরনের। সে দারুণ রেগে উঠতো, আক্রমণ করতো আর কামড়াতো — আর তারপর সবকিছু যেতো ভুলে... আচমকা সে নানা কাজ করতো। কেউ কখনো বলতে পারতো না পরের মিনিটে কিম্বা এমন কি পরের সেকেন্ডে সে কী করবে। কিনুলি প্রায়ই স্নেহ প্রকাশ করতো, তাস্‌কা কখনো প্রকাশ করতো না। তারা একসঙ্গে ভারি সুন্দর খেলতো, কিন্তু কখনো বাস্তবিকই পরস্পরকে তারা বুঝে নি। এই কারণে প্রায়ই তাদের হতো ঝগড়া।

একদিন তাস্‌কাকে আমি খানিকটা মাংস দিয়েছিলাম। সেটা নিয়ে সে গেল কিনুলির কাছে। খাবার আগে সেটা নিয়ে খানিক খেলতে তাস্‌কা চেয়েছিল। কিন্তু কিনুলি এই ইঙ্গিতটা বুঝলো না। যদি তোমাকে খাবার দেওয়া হয় তাহলে উচিত হলো সেটাকে খাওয়া। থাবা দিয়ে মাংসটাকে তুলে নিয়ে মেঝের উপর জুত করে বসে কিনুলি তার সকালের খাবার খেতে শুরু করলো। হাড়গুলোর মড়মড় শব্দ শুনে তাস্‌কা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলো। তার ছিপছিপে শরীরের

প্রতিটি রেখায় ফুটে উঠলো বিস্ময়। ব্যাপারটা কী? কেন কিনুলি এটা করলো? শুধু মজা করার জন্যেই তাস্কা মাংসটা এনেছিল তার কাছে। কিনুলির চারদিকে সে ঘুরতে লাগলো, লক্ষ্য করতে লাগলো তার চোয়াল নড়ানো, শুনতে লাগলো মড়মড় শব্দ। সে এমন কি চেষ্টাও করলো মাংসটাকে নিয়ে নিতে। কিন্তু কিনুলি তার কানগুলো চ্যাপটা করে এমন হুঙ্কার ছাড়লো যে তাস্কা লাফিয়ে গেল পিছনে। তাস্কার চোখগুলো হিংস্র ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। ঠিক সময়ে আমি একটা তোয়ালে তুলে নিলাম। তাস্কা সে অপমান সহ্য করতে পারলো না। তার গায়ের রোঁয়াগুলো খাড়া খাড়া হয়ে উঠলো, আর কুকুরের মতো গরগর করতে করতে সে ছুটে গেল কিনুলির দিকে। আমাকে বাধা দিতে হলো।

আর একবার কিনুলি সোফায় শুয়েছিল, তার ল্যাজটা ঝুলছিল নীচের দিকে। তাস্কা সেটাকে ভেবেছিল সোফার মখমলের ঝালর। এতো জোরে সে সেটা কামড়েছিল যাতে বেশ লাগে। আবার ঝগড়া। এই ধরনের ঘটনা প্রতিদিনে একাধিকবার ঘটতো।

একসঙ্গেও থাকতে পারে না,
আলাদাও থাকতে পারে না

প্রতিবার তাস্কাই করতো দোষ। কখনোই কিনুলিকে সে সুস্থির থাকতে দিতো না: সর্বদাই তার ল্যাজ ধরে টানতো কিম্বা লাফিয়ে বেড়াতো তার চারিদিকে। বেচারা কিনুলির মাথা ঘুরে উঠতো। সে লুকতো গিয়ে চেয়ারের তলায়, কিন্তু তাস্কা চেয়ারের উপরে লাফিয়ে উঠে ওপর থেকে তার দিকে তাক্ করতো। মাঝে মাঝে কিনুলি চটে উঠে তার ঘরে চলে যেতো। কিন্তু এক মিনিটের মধ্যেই তাস্কা করতো তার অনুসরণ। যে ঘরে কিনুলি থাকতো, সে ঘরে কখনো সে সোজা যেতো না। প্রথমে দেখা যেতো তার দীর্ঘ শীর্ণ ছায়াটা, তারপর একটা ছুঁচলো কান আর গোল একটা চোখ। তারপর এই সবই হতো অদৃশ্য, আর কয়েক মিনিট পরে তাস্কা লাফিয়ে আসতো ঘরের মাঝখানটায়, আর আওয়াজ করতো বন্ধুত্বপূর্ণ 'হুম', যেন কিছুই ঘটে নি।

নিজের ঘরে কিন্‌লির সাহস বেড়ে যেতো। সেখানে বনবেড়ালটাকে অতটা সে ভয় পেতো না, আড়ষ্ট হয়ে সরে যেতো না কোণে, আর তাস্‌কা তাকে খুব বেশী জ্বালাতন করলে তার কান মলে দিতে সে দ্বিধা করতো না। তাস্‌কা এটা একেবারেই পছন্দ করতো না। ক্ষুদে শয়তানটা চেষ্টা করতো কিন্‌লিকে ভুলিয়ে তার নিজের ঘরে আনতে। নানা ধরনের দুষ্টুমি সে করতো! মাঝে মাঝে খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে সে চলে যাবার ভাণ দেখাতো। তার কাটা ল্যাজটা খাড়া করে সে দৃঢ় পদে এগিয়ে যেতো দরজাটার দিকে। কিন্‌লি তাস্‌কার আগে দৌড়ে গিয়ে চেষ্টা করতো তাকে বাধা দিতে। তখন তাস্‌কা তাকে ভুলিয়ে নিয়ে আসতো নিজের ঘরে শুধু তাকে আঁচড়াবার জন্যে। তাদের ছাড়িয়ে দিতে হতো একটা তোয়ালে দিয়ে। বনবেড়ালটাকে তাড়াতে হতো তার নিজের ঘরে, আর কিন্‌লিকে নিয়ে যেতে হতো ধরে। তখন পরস্পরের জন্যে তাদের মন কেমন করতো। তাস্‌কা দরজা আঁচড়াতো আর তার ধারালো দাঁত দিয়ে সেটা সে কামড়াতো, আর এমন চিৎকার করতো যেটা ফ্ল্যাটের সর্বত্র শোনা যায়। তাস্‌কার চিৎকারে কিন্‌লি বিচলিত হয়ে উঠতো। ঘরের মধ্যে সে পায়চারি করতো, শুনতো আর ছটফট করতো তাস্‌কার কাছে ফিরে যেতে। আমি তাদের একত্র করে দিতাম। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার একটা ঝগড়া বাঁধতো।

তাস্‌কার মৃত্যু

যত দিন যেতে লাগলো বনবেড়ালটাকে একটা ঘরের মধ্যে রাখা কঠিন হয়ে উঠতে লাগলো। যা কিছু সে কাছে পেতো সে কামড়াতো আর ছিঁড়ে ফেলতো। সর্বত্র সে লাফিয়ে বেড়াতো, যেখানে সেখানেই করতো নোংরা, লণ্ডভণ্ড করে ফেলতো সমস্ত জায়গাটা। বহুকাল আগেই যথাসম্ভব জিনিসপত্তর আমরা সরিয়ে ফেলেছিলাম, কিন্তু তাতে চেয়ারের পা ও পিঠগুলো এবং সোফার গদিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে তার বাধা হয় নি — এমন কি বই রাখার তাকগুলোর খোদাই কাজের উপর তার তীক্ষ্ম দাঁতের চিহ্ন রয়ে গেছে। তাস্‌কাকে চিড়িয়াখানায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কথা বিবেচনা করতে হয়েছিল। প্রথমে স্বামী একথাটা কানেই তুলেন নি, আমাকে বলেছিলেন তাস্‌কাকে রেখে কিনুলিকে পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু তাস্‌কা যখন নতুন একটা পর্দা ছিঁড়ে ফেললো আর একটা ছবিকে করে ফেললো ময়লা, তিনি তখন তাকে ছেড়ে দিতে রাজি হলেন।

চিড়িয়াখানায় তার জন্যে একটা বড়সড় খাঁচা প্রস্তুত করা হলো। খাঁচাটাকে করা হলো ভালো করে পরিষ্কার, সেটার মেঝেয় ছড়ানো হলো বালি, আর তাস্‌কার চড়ার জন্যে একটা মোটা ডাল ভিতরে রাখা হলো। অল্পদিনের মধ্যেই তাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবার কথা। কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠলো না।

একদিন সকালে যখন আমি ঘরের মধ্যে গেলাম আমাকে সম্বর্ধনা করার জন্যে তাস্‌কা ছুটে এলো না, আমি যখন তার নাম ধরে ডাকলাম তখন দিলো না উত্তর।

ঘরের ভিতরটা অদ্ভুত চুপচাপ। এতো চুপচাপ যে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ‘সে কি জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়েছে?’ — প্রথমে আমি ভাবলাম। আমি ঘরের মধ্যে কয়েক পা এগিয়ে গেলাম আর... সোফার কাছে দেখলাম: তাস্‌কা একটা অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে শুয়ে। এক ফালি ঝালর তার গলার চারদিকে শক্ত করে জড়ানো। সম্ভবত সেটার পাশ দিয়ে ছুটে যাবার কিম্বা সেটা নিয়ে খেলা করার সময় ঝালরটা তার গলায় জড়িয়ে গিয়ে তার দম বন্ধ করে ফেলেছিল। এইভাবে তাস্‌কার ক্ষুদ্র জীবন অকস্মাৎ শেষ হয়ে গেল।

আবার একলা

একলা পড়ায় কিনুলির ভারি মন খারাপ হয়ে গেল। তার সঙ্গে লাফ ঝাঁপ করা ও খেলা করার কেউই রইলো না। তাস্‌কার কাছে তাকে নিয়ে যাবার জন্যে সে কাকুতি মিনতি করে কাঁদতে কাঁদতে, বন্ধ দরজাটার সামনে যাতায়াত করতে লাগলো। এমন কি মাথা দিয়ে দরজায় সে ধাক্কাও দিলো। আমি কিন্তু তাকে ঘরের মধ্যে যেতে দিলাম না। ঘরটাকে প্রথমে ভালো করে পরিষ্কার করা, গোছানো আর বাতাস খাওয়ানো দরকার। মূর্তিগুলোকে আবার যথাস্থানে রাখা হলো, পর্দাগুলো হলো ঝোলানো। ঘরটা আবার সুন্দর হয়ে উঠলো। তার ভিতরকার কোনো জিনিসই তাস্‌কার কথা মনে করিয়ে দিলো না। কিন্তু তবু তাকে আমি ভুলতে পারলাম না। যখনই আমি ঘরটার ভিতরে যেতাম তখনই মনে হতো যে তার লম্বা, শীর্ণ ছায়াটা যেন দেখতে পাচ্ছি। ছোট্ট বনবেড়ালটার কথা কিনুলিরও মনে ছিল। তিন সপ্তাহ পরে আমি যখন প্রথম কিনুলিকে সেই ঘরে ঢুকতে দিলাম, সে এমনভাবে ছুটে এলো যেন তিনটে সপ্তাহ কেটে যায় নি, যেন কৌতুক-প্রিয় তাস্‌কা প্রত্যেকটা কোণেই লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু তাস্‌কা নেই। আলমারি, টেবিল আর বিছানার তলায় কিনুলি তাকে খুঁজলো। বনবেড়ালটার যেসব জায়গায় লুকিয়ে থাকা সম্ভব সর্বত্র সে দেখলো, কিন্তু তাকে সে খুঁজে পেলো না। কিনুলি একেবারে একা হয়ে পড়লো।

বান্ধবীকে হারিয়ে কিনুলি হয়ে পড়লো মনমরা। তার খিধে চলে গেল, থাবাগুলোর মধ্যে মাথা রেখে সমস্ত দিন সে শুয়ে থাকতো, খুব কমই উঠতো।

অন্যদিকে তার মনযোগ আকর্ষণ করার জন্যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। আমরা কিনলাম নতুন একটা বল আর নানা ধরনের খেলনা। প্রতিবেশীদের একজন তাকে দিলো পুরোনো একজোড়া চটি, আর একজন তার মন ভালো করার জন্যে নিয়ে এলো নিজের গ্রামাফোনটা। সিংহ এবং গ্রামাফোন — এই দুটো জিনিসের সংযোগ অদ্ভুত ধরনের। গ্রামাফোনটা যখন বাজলো, কিনুলি ভয় পেয়ে সরে গেল সবচেয়ে দূরের কোণে, বেরিয়ে আসতে চাইলো না। অবশেষে কিন্তু কৌতূহলেরই জয় হলো।

এই অপরিচিত জিনিসটার দিকে কিনুলি বহুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। সেটার চার পাশে সে ঘুরলো। সেটাকে সে শুঁকলো। এমন ভাব দেখাতে লাগলো যেন সেটা জীবন্ত। সে চেষ্টা করলো সেটাকে ভয় দেখাতে। সেটার কাছে এসে বিকট চিৎকার করে, পা ঠুকে অপেক্ষা করে রইলো দেখতে গ্রামাফোনটা ভয় পেয়েছে কি না। কিন্তু গ্রামাফোনটা একেবারেই ভয় পায় নি আর দৌড়ে পালায় নি — যেখানে ছিল সেখানেই রইলো। কিনুলি ক্রমে শান্ত হয়ে এলো।

তার উপর বিভিন্ন সুরের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করাটা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ছিল। অবশ্যই সে বিভিন্ন সুরগুলোকে চিনতো। কতকগুলোকে সে পছন্দ করতো, কতকগুলোকে করতো না। যখন 'জীবন' নামে ফক্স-ট্রটটা চড়ানো হলো কিনুলি খুব কাছে এসে রইলো শুয়ে। কিন্তু অকস্মাৎ একটি পুরুষের গলা গান গেয়ে উঠলো। কিনুলি ঘাড় ফিরিয়ে উঠলো ফোঁসফোঁস করে।

ওয়াল্‌জ্‌ সুর সে মন দিয়ে শুনতো, কিন্তু সমবেত কণ্ঠে গান শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সে পালাতো ছুটে। বহু কণ্ঠের মিলিত সঙ্গীত শুনে সে ভয় পেতো, সর্বদাই সেই গানের কাছ থেকে ছুটে পালাতো ছোট বারান্দাটায়।

কিনুলির প্রিয় আশ্রয় স্থান ছিল এই বারান্দাটা। যদি আমরা তাকে তাড়া দিয়ে ঘরের মধ্যে এনে দরজাটা বন্ধ করে দিতাম তাহলে সে তার পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে, সামনের থাবা দিয়ে হাতলটা ধরে টানতো যতক্ষণ না দরজাটা যেতো খুলে। বারান্দাটায় তার মন আকর্ষণ করার অনেককিছু ছিল। একটা চেয়ারের উপর উঠে সে দেখতে পেতো উঠনে ছেলেরা খেলা করছে, মোটরগাড়ী আর ঘোড়া আসছে। তিন তলা থেকে সবকিছুকেই খুব ক্ষুদে, বাস্তবিক আকারের চেয়ে অনেক ছোট দেখায়। নীচ দিয়ে একটা মোটরগাড়ী চলে গেল। সেটা ঠিক তলিয়ার খেলার মোটরগাড়ীর মতো, যেটা নিয়ে কিনুলি করতো খেলা। কিনুলি লাফিয়ে উঠে বারান্দা ধরে ছুটতো সেটার পিছন পিছন।

কিন্তু গাড়ীটা যেতো অদৃশ্য হয়ে। বিষণ্ন দৃষ্টিতে কিনুলি চেয়ে থাকতো সেটার চলে যাবার পথের দিকে। আর নীচে থেকে ছেলেমেয়েরা তাকে দেখে হেসে উঠতো: 'কিনুলি, গাড়ীটা তোমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে।'

নতুন ঘরে কিন্‌লি

এর অল্পদিন পরেই আমার ভাই ভাসিয়া ছুটিতে চলে গেল। তার ঘরটা আমাদের ঘরের পাশেই ছিল। সে ঘরটা ছিল বড় আর তাতে আলোও আসতো প্রচুর। ঘরটার সঙ্গে ছিল একটা বারান্দা। আমি স্থির করলাম সাময়িকভাবে কিন্‌লি আর পেরিকে নিয়ে সেখানে গিয়ে থাকবো। এই চলে আসাটা তারা একেবারে অন্যভাবে নিলো। পেরি সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের তলায় ঢুকে ঘুমিয়ে পড়লো, কিন্তু কিন্‌লি ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো, সবকিছু শুঁকতে লাগলো, পরীক্ষা করতে লাগলো। অবশেষে তার কৌতূহল তৃপ্ত হবার পর সে শুয়ে পড়লো। তার জন্যে দরজার কাছে আমরা একটা ছোট্ট গালচে বিছিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু সেটা তার একেবারেই পছন্দ হলো না। সে আড্ডা গাড়লো বারান্দার দরজার কাছে। কয়েকবার আমি তাকে তাড়া দিলাম, ভয় হলো হয়তো তার ঠাণ্ডা লাগবে। কিন্তু কিন্‌লি বারবার ফিরে গেল। এই জায়গাটা তার প্রিয় হয়ে উঠলো।

সে জেগে উঠতো খুব সকাল সকাল। আমরা তখনো ঘুমতাম। আমি ঘুমতাম বারান্দায়। আমার স্বর প্রথমবার শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্‌লি দরজার কাছে ছুটে এসে মিউমিউ করতে করতে সেটাকে আঁচড়াতে শুরু করতো, আর দাঁড়িয়ে উঠে কাঁচের সার্সি দিয়ে চেষ্টা করতো আমাকে দেখতে।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই কী করতে হবে সে আবিষ্কার করলো। শিখলো একটা ইজি-চেয়ারকে দরজার কাছে ঠেলে আনতে। সে ইজি-চেয়ারটা ছিল খুব ভারি, এমন কি আমিও সেটাকে নড়াতে পারতাম না। কিন্তু কিন্‌লি একটা উপায় আবিষ্কার করলো। পিছু হটে গিয়ে দৌড়ে এসে সেটাকে সে ঠেলতো তার থাবা দিয়ে। তারপর আবার পিছিয়ে গিয়ে সেটাকে দিতো আর একটা ধাক্কা। চেয়ারখানা জানলার কাছে এলে সে লাফিয়ে উঠতো সেটার উপর আর তাকাতো দরজার ভিতর দিয়ে। সেখান থেকে সে আমাকে ভালো দেখতে পারতো। শুরাকে কিন্‌লি ভয় করতো, তাকে ঘাঁটাতো না। কিন্তু সর্বদাই সে আমার বিছানায় উঠতো লাফিয়ে, তার মাথাটা আমার গায়ে ঘষতো, আর আমাকে খেলার নিমন্ত্রণ জানাতো।

প্রায়ই আর একটু বিশ্রাম পাবার জন্যে আমি চোখ বুঁজে ঘুমবার ভাণ করতাম। কিন্তু তাতে কোনো ফল হতো না। কিনুলি আমার কম্বলটা টেনে সরিয়ে ফেলতো। সে কী জ্বালাতনই না করতো!

দিনের বেলায় বারান্দায় যখন রোদ এসে পড়তো পেরি বেরিয়ে আসতো তার বুড়ো হাড়গুলোকে গরম করার জন্যে। আর কিনুলি আসতো রাস্তার লোকদের দেখতে ও রোদ পোয়াতে। সে রোদে শুয়ে থাকতো, সর্বদাই চিৎপাত হয়ে, কিন্তু মাথাটা সে রাখতো ছায়ায়।

ছায়াটা যখন সরে যেতো কিনুলিও সরতো তার সঙ্গে সঙ্গে। বহুক্ষণ ধরে সে শুয়ে থাকতো, ঘণ্টাকয়েকের জন্যে, আর আমি খুব খুসি হতাম, কারণ রোদ জন্তুছানাদের জন্যেও উপকারী।

তখন আমি সমস্ত দিন কাটাতাম কাজে, শুধু দুপুরের ছুটির সময় বাড়ী আসতাম কিনুলিকে খাওয়াবার জন্যে।

ফুটোয় চাবিটা আমি যেই লাগাতাম, কিনুলি বুঝতে পারতো কে এসেছে। দরজার কাছে আমার সঙ্গে সে দেখা করতো, লাফাতো, আদর করতো আর আমার গায়ে গা ঘষতো। মাঝে মাঝে আমার পায়ের কাছে শুয়ে পড়ে সে তার থাবা দিয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরতো আর চাটতো আমার জুতো জোড়া। পেরিকে সে হিংসে করতো। কখনোই আমাকে পেরির কাছে যেতে দিতো না, পাছে তার গায়ে হাত বোলাই। আমি হাত বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে কিনুলি চলে আসতো আমাদের দু'জনের মাঝখানে। পেরি ছিল বুদ্ধিমান আর আত্মসম্মানী কুকুর। সর্বদাই সে হার মানতো। দূর থেকে ল্যাজ নেড়ে সে চলে যেতো। কিন্তু কিনুলি সেরকম ছিল না। তাকে প্রথমে না চাপড়ালে সে খেতো না। মাঝে মাঝে আমার কাজে ফিরে যাবার তাড়া থাকতো, খাবারের ছুটি হয়ে আসতো প্রায় শেষ, কিন্তু তাকে চাপড়াবার আর আদর করার জন্যে আমাকে হতো থাকতে! তখন আমি মনে মনে ভাবলাম: কেন নিজেকে আমি ক্লান্ত করি? ক্সেনিয়া স্তেপানোভনাকে বলবো আমি যখন থাকবো না তখন কিনুলির দেখাশোনা করতে আর তাকে খাওয়াতে।

ক্সেনিয়া স্তেপানোভনা আমাদের বহুকালের প্রতিবেশী। তাঁর বয়স ছিয়াত্তর,

তাই তাঁকে আমরা ডাকতাম দিদিমা বলে। তিনি ছিলেন ভারি ভালোমানুষ, পরের উপকার করতে সর্বদাই প্রস্তুত। প্রত্যেকেই তাঁকে ভালোবাসতো। অল্প দিনের মধ্যে কিনুলিও তাঁকে খুব ভালোবাসতে লাগলো। দ্বিতীয় দিন যেই তিনি বসলেন, কিনুলি তাঁর কোলে বসে খেলা করতে শুরু করলো। মাঝে মাঝে কিনুলি দৈবাৎ তাঁর মোজা কিম্বা এপ্রন ছিঁড়ে ফেলতো, দিদিমা কিন্তু কখনো চটতেন না। এমন কি একথা তিনি আমার কাছেও লুকতে চেষ্টা করতেন: পাছে তাঁর আদুরে জন্তুটি বকুনি খায়! কিনুলিকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। মাঝে মাঝে তাকে তিনি বাড়তি দুধ দিতেন, সর্বদাই খাবার পর পাত্রটা রাখতেন সাবধানে ধুয়ে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন আমি বাড়ীতে থাকতাম না তখন আমার দুর্ভাবনা হতো। ধরো, কিনুলি যদি বারান্দার দরজাটা খুলে বেরিয়ে উঠনে পড়ে? রেলিঙগুলো ছিল খুব ফাঁক ফাঁক, সিংহছানাটা অনায়াসেই তার ভিতর দিয়ে গলে যেতে পারতো। বাড়ী থেকে বেরুবার সময় সর্বদাই আমি সেই দরজাটাকে বার কয়েক টানতাম, সেটা ঠিকমতো বন্ধ হয়েছে কি না দেখার জন্যে। একবার আমি যে দারুণ ভয় পেয়েছিলাম সে কথাটা আমার মনে পড়ে। আমি যখন ঘরে এলাম কিনুলিকে কোথাও দেখা গেল না, আর এদিকে বারান্দার দরজাটা খোলা। আমার হাত-পা কাঁপতে লাগলো, ভয় হলো বারান্দা থেকে দেখতে — কিনুলি যদি উঠনে মরে পড়ে থাকে? আসলে সে কিন্তু সমস্তক্ষণই লুকিয়ে ছিল দরজাটার পিছনে। সে শুধু চেয়েছিল লুকোচুরি খেলতে। কিন্তু বেশীক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারলো না: যেই আমি পিছন ফিরেছি সে লাফিয়ে পড়লো আমার উপর, তার মুখটা দিয়ে আমাকে সে ধাক্কা মারলো আর আমার গায়ে গা ঘষতে লাগলো...

এরপর থেকে সাবধান হবার জন্যে আমরা রেলিঙগুলোর সামনে তারের জাল খাটিয়ে দিয়েছিলাম।

কাজ থেকে কখন আমার ফেরার কথা কিনুলি তা সঠিক জানতো। উৎকণ্ঠিত হয়ে সে অপেক্ষা করতো, প্রতিটি শব্দ সে শুনতো। তার জন্যে কখনো আমি কোথাও যেতে পারতাম না। একবার আমি দু দিনের জন্যে সহরতলীতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি সবাই দারুণ উৎকণ্ঠিত। আমি যখন ছিলাম

না সে তখন কিছুই খায় নি। আমাকে দেখে কী খুসিই না হলো! সমস্ত দিন ধরে আমাকে সে চোখের আড়াল হতে দিলো না। আমি যদি দরজার কাছে যাই, কিনুলি পিছন পিছন এসে আমার পা জড়িয়ে ধরে তার থাবা দিয়ে, যাতে আমি বাইরে যেতে না পারি। দিদিমা তার দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে বলতেন: 'ওরে শয়তান! তুই শুধু তোর মার পেছন পেছন ঘুরতে চাস!' স্বভাবতই সে তাই চাইতো — তার সঙ্গে খেলা করার আর কে-ই বা আছে! আগে ছেলেমেয়েরা থাকতো, কিন্তু এখন তারা চলে গেছে, কিনুলির একঘেয়ে লাগছে। সত্যি বটে পেরি রয়েছে, কিন্তু পেরি খেলার সঙ্গী নয় — সমস্ত দিন ধরে সে টেবিলের নীচে ঘুময়। কিনুলি তাকে ল্যাজ ধরে টেনে বার করতে চেষ্টা করতো, কিম্বা চেষ্টা করতো থাবা দিয়ে তাকে ছুঁতে, পেরি কিন্তু শুধু পাশ ফিরে শুয়ে আবার পড়তো ঘুমিয়ে।

বেড়াতে যাওয়া

কিনুলির যখন তিন মাস বয়েস তখন আমি স্থির করলাম তাকে নিয়ে বেড়াতে যাবো। চামড়ার একটা স্ট্র্যাপ দিয়ে আমি বকলেসের মতো একটা জিনিস তৈরি করলাম আর সেটাকে পরালাম। আমি কখনো আশা করি নি, বকলেসটা তার গলায় পরানোর পর সে অমন দারুণ চটে উঠবে। কিনুলি দারুণ ঘাবড়ে গিয়েছিল। সে গর্জন করে উঠে চামড়ার দড়িটা টানতে লাগলো, তারপর দাঁত দিয়ে চামড়াকে শুরু করলো টানতে। যতই সে টানতে লাগলো ততই বকলেসটা বসতে লাগলো আরও আঁট হয়ে। কিনুলি রেগে পাগল হয়ে উঠলো। মেঝের উপর সে গড়াতে লাগলো, লাগলো গরগর করতে আর থাবা ছুঁড়তে। বকলেসটা খুলে নিতে আমায় দারুণ বেগ পেতে হয়েছিল, এমন কি তারপরেও ঘরময় সে ছুটে বেড়াতে লাগলো, কিছুতেই শান্ত হলো না। একঘণ্টা পরে আবার আমি বকলেসটা তার গলায় পরালাম। খুব যত্ন করে, তার পেটে সুড়সুড়ি দিতে দিতে আঁকড়াটা এঁটে দিলাম। গলাটা নানাভাবে নাড়িয়ে কিনুলি বকলেসটা থেকে

বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করলো। কিন্তু আগেকার মতো বকলেসটায় অসুবিধে হলো না। অলপক্ষণের মধ্যেই সে শান্ত হয়ে এলো। কয়েক মিনিট পরেই কিনুলি, পেরি আর আমি রাস্তায় বেরুলাম।

কিনুলি দারুণ ভয় পেয়ে গেল! জানলা থেকে সবকিছুকেই খুব ছোট আর খুব দূরে দেখাতো, আর এখন সবকিছুই দারুণ বড় আর ভয়াবহ দেখাচ্ছে। প্রথমে ছানাটা ভয়ে প্রায় আড়ষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু অলপক্ষণের মধ্যেই সে শুরু করলো ছাড়া পাবার জন্যে ছটফট করতে। এই আঁচড়ায়, এই চেঁচায়, কখনও চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে, নড়তে চায় না, কখনও হঠাৎ একপাশে ছুটে যায়, আমাকেও টেনে নিয়ে যায় তার সঙ্গে। যাতে সে খুব ঘাবড়ে না যায় তার জন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। যথাসম্ভব স্বাধীনতা তাকে আমি দিলাম। তার সঙ্গে গেলাম যেখানেই সে আমাকে টেনে নিয়ে যায়। আদর করে সাধ্য মতো চেষ্টা করলাম তাকে শান্ত করতে। আমার মতো পেরিও যথাসাধ্য চেষ্টা করলো। বুদ্ধিমান কুকুরটা সাহায্য করতে চেষ্টা করলো তার নিজের ধাঁচে। কিনুলির পাশে পাশে শান্তভাবে সে হাঁটতে লাগলো, যেন দু'জনের গলাতেই ফাঁস আটকানো হয়েছে। আর যখন মনে হচ্ছিল কিনুলি বিশেষভাবে ঘাবড়ে গেছে কিম্বা সে যাচ্ছিল থেমে, পেরি চাটছিল তার মুখটা আর নিজের নাক দিয়ে দিচ্ছিল তাকে আস্তে আস্তে ধাক্কা।

ধীরে ধীরে, দিনে দিনে কিনুলিকে আমরা শেখালাম বেড়াতে যেতে। ইচ্ছে করে তাকে আমি নিয়ে যেতাম রাস্তায়, যাতে নানা আওয়াজ ও মানুষে সে অভ্যস্ত হয়ে যায়, যাতে বুনো জন্তুর মতো সে বড় না হয়ে ওঠে। অলপদিনের মধ্যেই বাস্তবিকই সে পথের গোলমালে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। আমার পাশে পাশে সে হাঁটতো একটা বড়সড় বাধ্য কুকুরের মতো, — এতো শান্তভাবে যে লোকেরা সব সময় তাকে লক্ষ্যও করতো না।

কিন্তু কেউ যদি তাকে সিংহ বলে চিনতে পারতো তাহলে কী সোরগোলই না বাধতো! মুহূর্তের মধ্যে কৌতূহলী দর্শকরা আমাদের ঘিরে ফেলতো। প্রায়ই পুলিশের লোক আসতো আমাদের উদ্ধার করতে। অকস্মাৎ দেখা দিয়ে, আমাদের কাছে এসে এই অদ্ভুত জন্তুটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে সে শুরু করতো

তার কাজ। এটা অবশ্য খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। কোনো বাড়ীর দোর গোড়ায় আমরা আশ্রয় নেবার পরই শুধু ভিড়টা ভাঙতো। মাঝে মাঝে বেড়াতে যাবার সময় নানা কুকুরের আমরা দেখা পেতাম। কিনুলিকে দেখে প্রত্যেকটা কুকুরই নিজের স্বভাব মতো ব্যবহার করতো। কোনটা দারুণ চিৎকার করতে করতে কিনুলির দিকে ছুটে আসতো, কোনটা সঙ্গে সঙ্গে পালাতো দৌড়ে, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই তাকে স্পর্শ করতে সাহস পেতো না। একদিন পথে আমাদের সঙ্গে এক মহিলার দেখা হলো, তাঁর পাশে পাশে দৌড়োতে দৌড়োতে চলেছিল একটা কুকুর। সেটা ছিল একটা থ্যাবড়া-নেকো কোল-কুকুর, তার পাগুলো ছিল ছোট ছোট আর লোমগুলো সিল্কের মতো। সে কর্ত্রীর সঙ্গে গম্ভীর মুখে হাঁটছিল — তার গলায় ছিল একটা নীল ফিতে।

অকস্মাৎ কিনুলিকে সে দেখতে পেলো। সম্ভবত প্রথমে তাকে সে ভেবেছিল একটা বড় কুকুর বলে। কুকুরটা গোঁ গোঁ করতে করতে দাঁড়িয়ে পড়লো, তারপর দারুণ ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছুটে এসে লাফিয়ে পড়লো কিনুলির উপর। কিনুলি যে কুকুর নয় সেকথা যখন সে আবিষ্কার করলো তখন খুব দেরি হয়ে গেছে।

বেচারা বেঁটে-সেঁটে কুকুরটা! যদি তোমরা তাকে দেখতে! তার উদ্ধত আক্রমণ পরিণত হলো ভয়ে, চোখগুলো আতঙ্কে এলো ঠিকরে বেরিয়ে, কিন্তু সে ফিরতে পারলো না, চেঁচাতে চেঁচাতে সে কিনুলির উপর লাফিয়ে পড়লো লড়াই করার ভঙ্গিতে। কুকুরটা পড়ে গেল, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে উঠে রাস্তার মাঝখান দিয়ে ল্যাজ গুটিয়ে ছুটতে লাগলো পাগলের মতো। তার কর্ত্রীও ছুটতে লাগলেন পিছন পিছন, নিষ্ফল চেষ্টা করতে লাগলেন তাকে ধরতে।

যতক্ষণ না সেই নীল ফিতেটা রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হলো কিনুলি তাকিয়ে রইলো সামান্য আশ্চর্য হয়ে, তারপর অলসভাবে মাথাটা ঘুরিয়ে সে হাই তুললো আর আবার হাঁটতে শুরু করলো ধীরে ধীরে, গম্ভীরভাবে। কিনুলি খুব বেশীক্ষণ হাঁটতে পারতো না। ঘণ্টা দেড়েক পরে সে কাকুতি মিনতি জানাতো তাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। আমাদের ফ্ল্যাটের পথটা সে চিনতো। দ্রুতবেগে লাফাতে লাফাতে সে উঠতো সিঁড়ি দিয়ে আর আঁচড়াতো আমাদের দরজাটা।

বেড়াবার পর কিন্নুলির খিধেটা বাড়তো। সকালে সে খেতে পেতো ডিম। তার খাবার পাত্রটা দাঁতে ধরে আমার কাছে সে নিয়ে আসতো। ডিমগুলোকে পাত্রটার মধ্যে ভেঙে আমি কিন্নুলির সামনে ধরতাম। সকালের খাবার পেরিও পেতো একই সঙ্গে। তারা খেতো পাশাপাশি, নিজের নিজের পাত্র থেকে। সর্বদাই কিন্নুলি শেষ করতো আগে। খালি পাত্রটা সে জিভ দিয়ে চেটে পরিষ্কার করতো, কিন্তু কখনো সে পেরির কাছ থেকে খাবার কেড়ে নিতে চেষ্টা করতো না। পেরি খেতো ধীরে ধীরে, বহুক্ষণ লাগতো তার খেতে। তার খাওয়া শেষ হলে সেইরকম ধীরে ধীরেই সে সিংহছানাটার কাছে গিয়ে তার মুখটা চেটে পরিষ্কার করে দিতো। তারপর দু'জনেই তারা পাশাপাশি শুয়ে ঘুমতো।

চতুষ্পদ 'চিত্র-তারকা'

আমার বন্ধুরা প্রায়ই আমাকে প্রশ্ন করতো কিন্নুলির ফিল্ম তোলা হয়েছে কিনা। তারা বলতো, 'সিংহের বাড়ীতে প্রতিপালিত হওয়ার এটাই সম্ভবত একমাত্র উদাহরণ! কী দুঃখের কথা তার ফিল্ম তোলা হয় নি!' অবশ্যই আমিও এজন্যে দুঃখিত ছিলাম। অনেক মজার ব্যাপার ছিল, তার ফিল্ম তোলা হলে খুব ভালো হতো। কিন্তু আমার ক্যামেরা ছিল না। আর আমি জানতাম না ফিল্ম তোলার জন্যে কোথায় যেতে হয়। তবে নিজে থেকেই একটা সুযোগ এসে গেল। চিড়িয়াখানার একটা ফিল্ম তোলা হচ্ছিল। প্রযোজক যখন শুনলেন যে আমার

ফ্ল্যাটে একটা সিংহ আছে, তিনি তার ফিল্ম তুলতে চাইলেন। বলাই বাহুল্য আমি সানন্দে মত দিলাম!

প্রযোজক একটি দৃশ্য-তালিকা লিখে ফিল্ম তোলার জন্যে লোক নিয়ে এক রবিবারে আমার বাড়ীতে এলেন। যাঁর ছবি তোলার কথা, তিনি নিয়ে এলেন ফিল্ম আর ক্যামেরা। প্রযোজক আনলেন একটা ট্রাইপড আর কী একটা বাক্স। বহু জিনিসপত্তর নিয়ে তাঁরা আমাদের ফ্ল্যাটে প্রথমবার এলেন। জিনিসপত্তরগুলো নামিয়ে তাঁরা গেলেন... 'তারকার' সঙ্গে আলাপ করতে।

নবাগতদের কিনুলি অবিশ্বাস করতে লাগলো। তাকে ছুঁতে দেবার আগে বহুক্ষণ ধরে সে তাঁদের জামাকাপড় আর জুতোগুলো শুঁকলো। সেদিন তার ছবি তোলা সম্ভব হলো না। তাঁদের ভয় কাটিয়ে ওঠার এবং নিজের স্বাভাবিক হওয়ার আগে কিনুলির সময়ের দরকার ছিল এই অপরিচিত লোকদের সঙ্গতে অভ্যস্ত হবার। তাই যিনি ছবি তুলবেন তিনি এবং প্রযোজক ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে মেঝেতে বসে রইলেন, মাংসের টুকরো দিয়ে তাকে লোভ দেখাতে লাগলেন এবং চেষ্টা করলেন চতুষ্পদ 'তারকার' বিশ্বাস অর্জন করতে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন ছিল। আমি যখন সেখানে রইলাম কিনুলি তাঁদের লক্ষ্যই করলো না। আমি যখন ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলাম কিনুলি তাঁদের কাছে যেতে, এমন কি তাঁদের হাত থেকে মাংস নিতেও চাইলো না। অবশেষে কিন্তু তাঁরা সফল হলেন — কিনুলি আর লজ্জা করলো না, ফিল্ম তোলা শুরু হলো।

আগে থেকেই সবকিছু প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল। এক সারি চেয়ারের উপর কম্বল বিছিয়ে ক্যামেরাটাকে হয়েছিল আড়াল করে রাখা। পর্দার আড়ালে যিনি ছবি তুলবেন তিনি লুকিয়ে রইলেন। এটাই ছিল একমাত্র উপায়, কারণ কিনুলি পোষ-মানা হলেও তখনো সে অবিশ্বাসী বুনো জন্তু। সবকিছু প্রস্তুত করার পর কিনুলি আর পেরিকে ঘরে আনা হলো। কিনুলিকে শান্ত রাখার জন্যে পেরিকে সেখানে থাকতে হলো — পেরি না থাকলে কিনুলি খেলতো না। দৃশ্য-তালিকা অনুযায়ী সোফার উপর তার শান্ত হয়ে শুয়ে থাকার কথা। সেটার উপর সে বেশ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই লাফিয়ে উঠলো, কিন্তু ক্যামেরার ঘড় ঘড় শব্দে ভয় পেয়ে সে গেল পালিয়ে। এইখান থেকেই শুরু হলো আমাদের মুস্কিলটা। কিছুতেই ফিল্ম

তুলতে কিনুলি রাজি হলো না। তাকে আমরা কাছে আনতে পারলাম না। অনুনয়-বিনয় কিম্বা ধমকে কোনো কাজ হলো না। ক্যামেরার শব্দটা চাপা দেবার কোনো উপায় বার করা দরকার।

কিন্তু কী করা যায়? অকস্মাৎ আমার মনে পড়লো কিনুলি বাজনা খুব ভালোবাসে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে গ্রামাফোনটার পাশে শুয়ে থাকে, তার চারি পাশে যা কিছু ঘটছে সেসব সে একেবারে ভুলে যায়। আমরা তাই গ্রামাফোনটাকে ক্যামেরার পাশে রাখলাম। নাচের বাজনার পরিচিত শব্দ ক্যামেরার ঘরঘরকে ডুবিয়ে দিলো, কিনুলি সঙ্গে সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলো। সে খেলা করলো, খেলো, সোফার উপর শুলো, তাকে যা যা করতে বলা হলো সবকিছু করলো। যিনি ক্যামেরা চালাচ্ছিলেন তিনি খুব খুসি হয়ে উঠলেন। তিনি কিনুলির ছবি তুলতে লাগলেন, আর প্রযোজক এদিকে লাগলেন গ্রামাফোনে দম দিতে আর রেকর্ড বদলাতে।

ভালো ছবি তোলার মতো ঘরে যথেষ্ট আলো ছিল না। সূর্য সরতে লাগলো, আর আমাদেরও তাকে অনুসরণ করতে হলো টেবিল, চেয়ার, 'তারকা' আর সবকিছু নিয়ে। তারপর, হয়তো কিনুলি পোজ দেবে না কিম্বা ক্যামেরাটা হয়তো রয়েছে ভুল জায়গায়... সত্যি কথা বলতে কি আমাদের বেজায় মুস্কিলে পড়তে হয়েছিল! পেরির ব্যাপারেও বিশেষ উন্নতি দেখা গেল না। তাঁরা বাজনার সাহায্যে কিনুলির ফিল্ম তুলতে পেরেছিলেন, কিন্তু পেরিকে নিয়ে কিছুই করা গেল না। একবার ফ্ল্যাস লাইট দিয়ে তার ছবি তোলা হয়েছিল, ফ্ল্যাস লাইটে সে দারুণ ভয় পেয়েছিল। তারপর থেকে ক্যামেরা দেখলেই সে চিৎপাত হয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করে মড়ার মতো পড়ে থাকে।

কিন্তু ক্রমশ সমস্ত অসুবিধেকে জয় করা গেল। কিনুলির খাওয়া, পেরির সঙ্গে খেলা করা, তার খাবার পাত্র আনা, বোতল থেকে দুধ পান করা — সবকিছুই ফিল্মে তোলা হলো। উঠনে ছেলেদের সঙ্গে সে খেলছে সেটাও তোলা হলো ফিল্মে। রবারের নিপ্‌ল্‌ নিয়ে কিনুলির ছবি তোলার ব্যাপারে তাঁদের কপাল ভালো ছিল, কারণ তার কয়েক দিন পরে সে রবারের নিপ্‌ল্‌টা ফেলেছিল গিলে।

শেষ নিপ্‌ল্‌

একদিন কাজ থেকে বাড়ী ফেরার পর দোর গোড়ায় আমার সঙ্গে দিদিমার দেখা হলো। তিনি কাঁদো কাঁদো গলায় আক্ষেপ করে উঠলেন:

'ভেরা ভাসিলিয়েভনা... বাছা... নিপ্‌ল্‌টা!'

আমি বুঝতে পারলাম না কোনো কথা।

কী ব্যাপার? কোন নিপ্‌ল্‌? অবশেষে কষ্টেসৃষ্টে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। বোতল থেকে নিপ্‌ল্‌টা টেনে কিনুলি সেটা গিলে ফেলেছে। 'আমি ঘুরে দাঁড়াবার আগেই...' — কাঁদতে কাঁদতে দিদিমা বললেন।

এ ঘটনা সত্ত্বেও কিনুলির ফুর্তির অভাব হলো না, সে যেমন হুড়োহুড়ি আর খেলা করতো সেরকমই করে চললো। কিন্তু দুর্ভাবনা না করে আমি পারলাম না। কে বলতে পারে শেষ পর্যন্ত কী হবে? রবারের জিনিস গেলার পর অনেক জন্তুকে মরে যেতে আমি দেখেছি। রবার হজম করা যায় না। পেটের মধ্যে সেটা ফুলে ওঠে, মাঝে মাঝে বাধার সৃষ্টি করে, ফলে জন্তুটা মরে। কিনুলির বেলাতেও সে ঘটনা ঘটতে পারে।

তাছাড়া কিনুলি খাবার পাত্র থেকে দুধ পান করতে পারে না, কিম্বা সত্যি কথা বলতে কি, সে চায় না। বাটি থেকে পেরির পাশাপাশি অনায়াসে সে সুপ আর পরিজ জিভ দিয়ে সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে খায়, কিন্তু নিপ্‌ল্‌ ছাড়া দুধ খেতে একেবারে চায় না।

তাড়াতাড়ি একটা নিপ্‌ল্‌ কেনা দরকার। কিন্তু কিনুলি সেটা ব্যবহার করলো না। মুখে করার পরের মুহূর্তে সেটাকে সে থুথু করে বার করে দিলো, শুঁকলো আর মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

আমি চটে উঠলাম। দুষ্টু বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে নিপ্‌ল্‌টা তার মুখে ঠেসে দিলাম। কিন্তু কিনুলি আমার হাত থেকে ছটফট করে বেরিয়ে নিপ্‌ল্‌টা থুথু করে ফেলে দিলো। মুহূর্তের জন্যেও সেটাকে সে তার মুখের মধ্যে রাখলো না। আমি বুঝতে পারলাম ভুলটা কোথায় হচ্ছে। পুরোনো নিপ্‌ল্‌টার স্পর্শ, গন্ধ ও স্বাদ একেবারে অন্যরকম ছিল। কিনুলি ছিল সেটাতে অভ্যস্ত। নতুনটার

উপর এমন সে হাবভাব দেখাতে লাগলো যেন সেটা তার নতুন এক মা। আমি অনেক চেষ্টা করলাম: প্রথমে সেটাকে নরম করার জন্যে ফোটালাম জলে, তারপর দুধে, যাতে রবারের স্বাদটা চলে যায়। কিন্তু তবু সেটাকে সে গ্রহণ করলো না। খিধেয় কিনুলি কান্না-কাটি করতে লাগলো, মাংস খেলো না, নতুন নিপ্‌ল্‌টা থেকে দুধও খেলো না।

তিন দিন কেটে গেল, আর তিন দিন ধরে কিনুলি কিছুই খেলো না। চার দিনের দিন, যখন সে বাস্তবিকই ক্ষুধার্ত হয়ে উঠলো তখন সে দুধ খেতে লাগলো নতুন নিপ্‌ল্‌টা থেকে। কিন্তু বেশী দিন সেটাকে সে ব্যবহার করলো না। পরের দিনেই সেটাকে সে ফেললো গিলে। সেটাই ছিল তার শেষ রবারের নিপ্‌ল্‌। কারণ সেটার পর আমি আর নিপ্‌ল্‌ কিনি নি। ক্রমশ বাটি থেকে কিনুলি দুধ খেতে শিখলো।

দোস্তি

তলিয়া, মাশা আর আমার ভাই ভাসিয়া সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় দক্ষিণাঞ্চল থেকে ফিরে এলো। আমি আমার ঘরে ফিরলাম, ইচ্ছে ছিল কিনুলিকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাই। কিন্তু ভাসিয়ার ঘরটা তার এতো পছন্দ হয়ে গিয়েছিল যে সে আসতে চাইলো না। সে আমাদের ঘরে আসতো, খানিক খেলা করতো, আর তারপর দরজা আঁচড়ে ছাড়া পাবার জন্যে সে চেঁচাতো, চাইতো ফিরে যেতে। কিনুলিকে তার ঘরে থাকতে দেবার জন্যে ভাসিয়াকে আমাদের অনুরোধ করতে হলো। ভাসিয়া রাজি হলো। জন্তুদের সে ভালোবাসতো, একটা সিংহছানাকে রাখতে তার আপত্তি হলো না। কিন্তু আপত্তি হলো ছানাটার। অপরিচিত লোকদের কিনুলি দারুণ অপছন্দ করতো! আর এখন কিনা এক অচেনা লোক তার ঘর চড়াও করেছে (কিনুলি মনে করতো সে ঘরটা তার নিজেরই!)। ভাসিয়া ফিরে আসায় কিনুলির মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটলো। তাকে সে দারুণ অপছন্দ করতে লাগলো। এই অপছন্দের ভাবটা সে প্রকাশ করতো তার নিজস্বভাবে। এমন কি আমার ভাইয়ের জিনিসপত্তরগুলো দেখলেও সে চটে উঠতো।

প্রথম দিন ‘জখম’ হলো তার স্যুটকেশটা। আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসার সময় ভাসিয়া সেটাকে মেঝের উপর রেখে গিয়েছিল। ফিরে গিয়ে সে দেখলো স্যুটকেশটা হাঁ হয়ে রয়েছে, তার ভিতরকার জিনিসগুলো চারদিকে ছড়ানো। একটা সার্ট ছিঁড়ে কিনুলি দ্বিতীয়টা শুরু করেছে। তার কাছ থেকে ভাসিয়া সেটা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলো। কিনুলি দিলো না। রেগে সে গর্জন করতে লাগলো। তার লম্বা লম্বা ভয়ঙ্কর নখগুলো বার করে থাবা দিয়ে ভাসিয়ার হাতে মারতে চেষ্টা করলো।

রাত্রেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হলো না। ভাসিয়া বিছানায় শুয়ে পড়লো। আর কিনুলি ক্রমাগত ঘুরতে লাগলো তার চারিপাশে, কখনো কম্বলটা টানে, কখনো বালিশটা। তাই সে ঘুমোতে পারলো না। ভাসিয়া তার বিছানাটাকে পাকিয়ে

সেটার উপর বসে রইলো সকাল অবধি। পরের রাতে সে ঠিক করলো টেবিলে শোবে। কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধে হলো না। একবার ঘরে এসে আমি তো সেটাকে প্রায় চিনতেই পারলাম না। ঘরময় পালক উড়ছে। মেঝের উপর পড়ে রয়েছে একটা ছেঁড়া মাদুর আর কোণে বসে কিনুলি শেষ বালিশটাকে শেষ করতে লেগেছে। কী করা যায়? ফিরে এসে আমার ভাই খুব চটে উঠবে।

আমি ছুটে গিয়ে ছুঁচ-সুতো এনে সবকিছু সেলাই করতে শুরু করলাম... সেলাই করতে আমার বিশেষ সময় লাগলো না, কিন্তু পালকগুলো জড়ো করা সোজা কাজ নয়। সেগুলোকে উড়ন্ত ধরে ধরে বালিশের খোলের ভিতরে আমি পুরতে লাগলাম, কিন্তু আবার যেতে লাগলো উড়ে। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, কিন্তু কিনুলির তাতে কী? সে আমার পিছন পিছন ছুটতে লাগলো, আমার চলা ফেরায় দিতে লাগলো বাধা, আমার গায়ে যেখানে পারলো সেখানে লাগলো তার মুখটা গোঁজড়াতে। ব্যাপারটা তার কাছে একটা মজার খেলা হয়ে উঠলো।

আমার ভাই একবার তার রেডিওটা টেবিলে রেখে ঘরের বাইরে গিয়েছিল, সেটাকে সে সারাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কিনুলি টেবিলের উপর লাফিয়ে উঠে সেটাকে থাবা দিয়ে দিলো ফেলে। ভাসিয়া যখন ঘরে ফিরলো তখন সেটা আবর্জনার স্তূপ ছাড়া আর কিছু নয়।

কিনুলি যে কত জিনিস নষ্ট করতো তার লেখা জোখা নেই: কোট আর পর্দা সে টুকরো টুকরো করে ফেলতো। তার নাগালের মধ্যে কোনো জিনিস রেখে যেতে ভাসিয়া ভয় পেতো। টেলিফোনে ডাক পড়লে তাকে বিছানা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হতো। প্রতিবেশীরা হেসে তাকে বলতো: 'তোমার ঘরের বাসিন্দা তোমায় খুব শান্তিতে থাকতে দেয় না, তাই না?' কিন্তু তার বাসিন্দার উপর ভাসিয়া কখনো রাগ করতো না। এই ছানাটার কাণ্ড দেখে সে ধৈর্য হারাতো না, তাকে সে স্নেহ করতো। তার বিশ্বাস অর্জন করার জন্যে সে সবরকম চেষ্টা করতো। প্রথম দিন থেকেই ছানাটাকে সে ভালোবাসতো। সুবিধে পেলেই সে তাকে খুব আস্তে আস্তে চাপড়াতো, আদর করতো যাতে কিনুলি ভয় না পায়।

ইচ্ছে করেই এখন আমি তার সামনে কম যেতাম। ভাসিয়া নিজে তার দেখাশোনা করতো আর খাওয়াতো। দিন পনেরোর মধ্যে কিনুলি তাকে ভালোবাসতে শুরু করলো। নিজে থেকে সে তার কাছে যেতো না, কিন্তু তাকে দেখে সে আর গরগর করতো না। তাকে সে ছুঁতেও দিতো। অনেকদিন পরে তাকে সে আদর করলো। সে ভালোবাসা দেখানো শুরু করলো ভাসিয়ার কাছে গিয়ে, তার পায়ের

কাছে শুয়ে পড়ে যখন তখন তার মাথাটা তার গায়ে ঘষে, যেন দৈবাৎ সেটা লেগে গেছে।

একবার ভাসিয়া সহরতলীতে গিয়ে সে রাত্রে আর ফিরলো না। কিনুলি দারুণ ঘাবড়ে গেল। ঘরময় সে ছুটোছুটি করতে লাগলো, কখনো সে মিউ মিউ করে, কখনো কান পেতে শোনে।

পরের দিন সকালে ভাসিয়া ফিরলো। করিডরে কিনুলি শুনতে পেলো তার পায়ের শব্দ। দরজা খুলে সে তার কাছে গেল ছুটে। থাবাগুলো দিয়ে জড়িয়ে ধরলো তার পা'টা। আর বহুক্ষণ ধরে তার গায়ে ঘষতে লাগলো নিজের শরীরটা।

কিনুলি আর ভাসিয়া দারুণ বন্ধু হয়ে উঠলো। ভাসিয়া বাড়ী থেকে প্রায় বেরুতোই না, তার অবসর সময়ের সবটা সে কাটাতো বাড়ীতে। কিনুলিকে খুসি করার জন্যে এমন কাজ নেই যা সে করতো না! তার সঙ্গে সে বল আর লুকোচুরি খেলতো। লুকবার কোনো জায়গা ছিল না, তাই সে আলমারির মধ্যে ঢুকে বলতো: 'কিনুলি, কোথায় আমি? কিনুলি!' সব জায়গায় কিনুলি খুঁজতো; কান পেতে শুনতো কিম্বা থাকতো ওৎ পেতে অপেক্ষা করে। ভাসিয়া মুখ বার করার সঙ্গে সঙ্গে সে চলে যেতো তার কাছে। তার উপর পড়তো সে লাফিয়ে। তার পা'টা ধরে তাকে সে বলতো আদর করতে। ভাসিয়া কিনুলিকে চেয়ারটায় বসে থাকতে শেখালো। চেয়ারের পিছনে হেলান দিয়ে কিনুলি বসার জায়গাটার উপর লাফাতো। ভাসিয়া চেয়ারটাকে ঘরময় টেনে বেড়াতো, কিনুলি বসে থাকতো তার উপর, ভারি গম্ভীরভাবে, আর চারিদিকে সগর্বে তাকাতো।

ভাসিয়া তখন এক কারখানায় কাজ করতো। সকাল সকাল সে উঠতো, সাতটার সময়। সর্বদাই কিনুলি তাকে জাগাতো। নখগুলো ঢেকে খুব সাবধানে থাবা দিয়ে তাকে সে চাপড়াতো, চাটতো তার চুল আর মুখটা। তার জিভটা জায় ফলের মতো কর্কশ ছিল, ভাসিয়ার চামড়ার উপর লাল দাগ পড়তো, কিন্তু ভাসিয়া সে সব সহ্য করতো, কাজে যাবার আগে তাকে আদর করতে কখনো ভুলতো না।

পথে সিংহ

সমস্ত সেপ্টেম্বর মাস ধরে আবহাওয়া খারাপ ছিল। প্রায় সব সময়ই বৃষ্টি হতো, আর সূর্য যদি দেখা দিতো তাও কয়েক মিনিটের জন্যে। কিনুলি বাইরে যেতে পারতো না, বাড়ীতে থেকে থেকে তার দারুণ একঘেয়ে লেগে গিয়েছিল, কারণ তার সঙ্গে খেলার কিম্বা দৌড় ঝাঁপ করার কেউ ছিল না। প্রায় সমস্তক্ষণ ধরে পেরি টেবিলের তলায় থাকতো, আর যে মুহূর্তে কিনুলি তাকে বিরক্ত করতে শুরু করতো বেরিয়ে আবার ঢুকতো টেবিলের তলায়। কিন্তু অবশেষে সূর্য আবার বেরিয়ে এলো। আমরা স্থির করলাম এই সুযোগে কিনুলির বাইরে ফিল্ম তুলবো।

সেদিন খুব সকাল সকাল আমরা ঘুম থেকে উঠলাম। আমার ভয় করছিল, আর সেই ভয়ের ছোঁয়াচ কিনুলিরও লাগলো। সে মাংস খেলো না, চঞ্চল হয়ে মিউ মিউ করতে লাগলো। দশটার সময় সবাই প্রস্তুত হলো। প্রযোজক আর যিনি ক্যামেরা চালাবেন তিনি এসে উপস্থিত হলেন।

যে জায়গায় ফিল্ম তোলা হবে সেখানে ভাসিয়া, কিনুলি, পেরি এবং আমি মোটরে করে রওনা হলাম। অন্যদের — ভূগর্ভ রেলে যাওয়ার কথা।

উঠনে আমাদের জন্যে একটা ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল। ড্রাইভার আমাকে একটা সিংহছানা আনতে দেখে চিৎকার করে তার গাড়ীর দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলো। আগে থেকে তাকে বলা হয় নি বলেই সে এ ধরনের যাত্রী আশা করে নি। সে ভয় কাটিয়ে ওঠার আগেই ভাসিয়া তাড়াতাড়ি অন্য দরজাটা খুলে কিনুলি, পেরি আর আমাকে ভিতরে ঢুকিয়ে নিজে ড্রাইভারের পাশে বসলো। ড্রাইভার এতো হকচকিয়ে গিয়েছিল যে সে কথা খুঁজে পেলো না। স্টিয়ারিং-এর উপর ঝুঁকে, পিছন ফিরে সভয়ে অস্থির সিংহছানাটাকে দেখতে দেখতে সে সাবধানে উঠনের বাইরে গাড়ী চালিয়ে আনলো। অনভ্যস্ত গতি এবং ইঞ্জিনের শব্দে কিনুলি প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। জানলার কাছ থেকে ছুটে দরজার কাছে গিয়ে সে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করলো। তারপর সে ঠাণ্ডা হয়ে শুরু করলো বাইরের দিকে তাকাতে। ড্রাইভারও ধাতস্থ হলো। সব সময় সে প্রশ্ন করে চললো কিনুলি

সম্বন্ধে—বাড়ীতে সে কীভাবে থাকে, তার মেজাজ, তার হাবভাবের বিষয়ে। 'আপনার একটা বই লেখা উচিত,' — সে উপদেশ দিলো। আর যখন তাকে আমি বললাম যে বই লিখছি তখন সে আরো বেশী আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলো।

আমাদের গল্পে আমরা এমন মশগুল ছিলাম যে ক্রোপতকিন স্ট্রীট পর্যন্ত পথটা আমরা প্রায় লক্ষ্যই করলাম না। সেখানে আমাদের সবাইকার একত্রিত হবার কথা। অন্যরা তখনো এসে পেঁছয় নি, তাদের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হলো। কিনুলি শান্তভাবে সিটের উপর শুয়ে রইলো। বাইরে থেকে তাকে দেখা যাচ্ছিল না বলে কেউই আমাদের বিরক্ত করলো না। একবার এক ভদ্রলোক ঐ ট্যাক্সিটা ভাড়া করার জন্যে কাছে এসে কিনুলিকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন, একবারও পিছন ফিরে তাকালেন না। অন্যরা যখন পেঁছুলো আমরা তখন গাড়ী থেকে নামলাম। ফিল্ম তোলার জন্যে সবকিছু প্রস্তুত। ভূগর্ভ রেল স্টেশনের অত কাছে একটা সিংহছানাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে পথিকদের মনোযোগ আকৃষ্ট হলো, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে উৎসুক দর্শকের এক ঘন ব্যূহের মধ্যে নিজেদের আমরা আবিষ্কার করলাম।

পথে কিনুলি দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো। কণ্ডাক্টর আর ড্রাইভাররা লাগলো ঝুঁকে পড়তে, যাত্রীরা লাফিয়ে নামতে লাগলো। চারিদিক থেকে ছেলেমেয়েরা এলো ছুটে।

কিন্তু পেত্রোভ্‌কা স্ট্রীটে আমাদের জন্যে যে ঘটনা অপেক্ষা করে ছিল তার তুলনায় এটা কিছুই নয়।

গাড়ীটা থামতে না থামতেই এক জনতা আমাদের ঘিরে ফেললো। আর আমরা যখন নামলাম তখন সবাইকার উত্তেজনাটা হলো অবর্ণনীয়! পুলিস কিম্বা পথ-পরিষ্কারকরা কিছুই করতে পারলো না। এক মিনিটের মধ্যেই সমস্ত ফুটপাথ, সমস্ত পথটায় ভিড় জমে উঠলো। লোকজনরা দেখতে লাগলো জানালা থেকে, বেরিয়ে এলো বারান্দাগুলোয়, ছোট ছোট ছেলেরা চিৎকার করতে লাগলো: 'সিংহ! সিংহ!'

সব যানবাহন আটকে গেল। বাস, ট্যাক্সি, মোটরগাড়ী গেল থেমে। ড্রাইভাররা এমন কি যাবার চেষ্টাও করলো না। খবরের কাগজের রিপোর্টার আর শখের

ফটোগ্রাফাররা কোথা থেকে যে গজিয়ে উঠলো একমাত্র ভগবানই তা জানেন। তাদের ক্যামেরাগুলো ক্লিক্ ক্লিক্ করতে লাগলো, কিনুলির ফিল্ম তোলা শুরু করা হয়ে উঠলো অসম্ভব।

চারবার আমরা ভাণ করলাম চলে যাচ্ছি বলে, চারবার আমরা নানা গলি দিয়ে সেই রাস্তাটা প্রদক্ষিণ করে ফিরে এলাম, কিন্তু কিছুই করা গেল না। ফুটপাথ দিয়ে কিনুলি হাঁটছে — অতি কষ্টে তার কয়েক ফুট ছবি তোলা গেল, তারপর সবাই আমরা বাড়ী ফিরলাম।

পরের দিনের কাগজে একটা খবর বেরুলো: 'গতকাল পেত্রোভ্কা স্ট্রীটে এক চিত্তাকর্ষক দৃশ্য দেখা গিয়েছিল — বাচ্চা সিংহী কিনুলির ফিল্ম তোলা।' তারপর ছিল ছবি তোলার একটা বর্ণনা। উক্ত অনুচ্ছেদ শেষ হয়েছিল এইভাবে: 'কিনুলির ফিল্ম তোলা পথিকদের মধ্যে দারুণ কৌতূহল জাগ্রত করেছিল। যে মোটরগাড়ীটা কিনুলিকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তার পিছনে ছিল বহু সাইকেল, মোটরসাইকেল আর মোটরগাড়ী। সেগুলো চিড়িয়াখানার কর্মচারী ভেরা চাপলিনার বাড়ী পর্যন্ত গিয়েছিল, যিনি সিংহছানাটাকে তার জন্মের দিন থেকে প্রতিপালন করে এসেছেন।'

ছুটির দিন

যে ফিল্মে কিনুলি অভিনয় করেছিল সেটা ৭ই নভেম্বরের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে গেল, সেদিন বিপ্লবের বাৎসরিক উৎসব। ছবিটা দেখবার জন্যে আমাদের পরিবারের সবাই নিমন্ত্রিত হলো। কিনুলি আর পেরিও অবশ্যই নিমন্ত্রিত হয়েছিল। ছবি তোলার সময় থেকে কিনুলি বার কয়েক মোটরগাড়ীতে উঠেছিল। ট্যাক্সিটা যখন আমাদের দোর গোড়ায় এসে থামলো কিনুলি নিজেই উঠে পড়ে। সিটের উপর আরাম করে বসে চারদিকে তাকালো শান্তভাবে। গাড়ী চালাবার আগে ড্রাইভার তার ঘাড়টা স্কার্ফ দিয়ে জড়িয়ে নিলো — কারণ যাত্রিনীকে সে খুবই বিপজ্জনক মনে করলো।

আমরা যখন সিনেমায় গেলাম প্রত্যেকেই লাফিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো: ‘সিংহটা এসেছে! সিংহটা এসেছে!’ দারুণ চিৎকার আর উত্তেজনা চলতে লাগলো। কিন্তু কিনুলি একটুও ভয় পেলো না। একটা সিটে উঠে সে শুয়ে পড়লো আরাম করে।

আলো নিভে গেল। ফিল্ম প্রজেক্টরটা করতে লাগলো ঘড় ঘড় শব্দ। এই অপরিচিত শব্দে কিনুলি পেয়ে গেল ভয়, সে হুংকার ছেড়ে শব্দটার দিকে মুখ ফেরালো। তারপর সে স্ক্রিনের দিকে তাকাতেই দেখলো নিজেকে, স্তব্ধ আর সতর্ক হয়ে বসে রইলো। প্রথম দিকে পেরিও দেখছিল, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই শরীরটাকে গুটিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। স্ক্রিনের উপর কিনুলি যা কিছু দেখলো তাইতেই সে সাড়া দিলো। হঠাৎ সেখানে সে দেখতে পেলো নিজের বলটাকে! একেবারে তার নিজের বলটা! এটা কিনুলি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারলো না, সিট ছেড়ে গোটা দুই লাফ মেরে স্ক্রিনের কাছে সে চলে গেল, লাফিয়ে উঠলো সেটার উপর আর চেষ্টা করলো তার প্রিয় খেলনাটাকে ধরতে... বহু কষ্টে ওকে আমি ফিরিয়ে আনলাম। বাকি ছবিটা কিনুলি মন দিয়ে দেখলো, একবারও স্ক্রিন থেকে চোখ ফেরালো না। এমন কি আলোগুলো যখন জ্বালানো হলো সে তাকিয়ে রইলো সেটার দিকে। তারপর সে আড়মোড়া ভেঙে পরিতৃপ্তির হাই তুললো।

সেদিন কিনুলি অন্যদিনের চেয়ে ভালো ঘুমলো। যদিও ঘুমের মধ্যে বার কয়েক সে চমকে চমকে উঠে থাবা নাড়িয়েছিল। সম্ভবত সে স্বপ্ন দেখছিল যে সে তার বলটাকে ধরে ফেলেছে।

তারপর কিনুলি আর তলিয়া ছেলেমেয়েদের এক উৎসবে নিমন্ত্রিত হলো।

এবারও সবকিছু নির্বিবাদে ঘটলো না। কিনুলির জন্যে যখন গাড়ী এলো তখন দেখা গেল সে তার নিজের ঘরে তালা বন্ধ হয়ে রয়েছে। আমার স্বর শুনে যথারীতি তার থাবা দিয়ে তালাটাকে সে খুলতে চেষ্টা করলো, কিন্তু দৈবক্রমে তালাটা গেল খারাপ হয়ে। তালাটাকে ভাঙতে হয়েছিল।

ছেলেমেয়েরা কিনুলিকে এমন জোরে আনন্দের চিৎকার করে সম্বর্ধনা জানালো যে আতঙ্কিত হয়ে আবার সে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে গেল নেমে। আর

একটু হলে আমাকে সে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতো। তাকে হলঘরে ফিরিয়ে আনতে আমাকে দারুণ বেগ পেতে হয়েছিল। এবার কিন্তু ছেলেমেয়েরা চুপ করে রইলো, আর কিনুলিও ফিরে পেলো তার স্থৈর্য। আমি বসলাম, কিনুলি আর পেরি বসলো আমার পায়ের কাছে আর আমাদের ঘিরে বসলো ছেলেমেয়েরা। সিংহছানাটার সব কটা লোম, তার চোখ, শক্তিশালী থাবা, আর গোল গোল কানগুলো তারা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। কিনুলি অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে রইলো। এমন কি নিজেকে ছেলেমেয়েদের স্পর্শ করতেও দিলো। ছেলেমেয়েরা সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে পালা করে তার নরম রোঁয়ায় হাত বোলালো আদর করে।

ভালো ব্যবহার করার পুরস্কার হিসেবে পরের দিন কিনুলিকে আমরা মস্কোয় গাড়ী করে ঘোরালাম। সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক রাস্তাগুলোর ভিতর দিয়ে তাকে আমরা নিয়ে গেলাম, তাকে আমরা দেখালাম উৎসব সাজে সজ্জিত আলোকোজ্জ্বল সহর। কিনুলি একবারও জানালা থেকে চোখ ফেরালো না। এক জায়গায় আমাদের ট্যাক্সিকে পেরিয়ে একটা গাড়ী গেল, তাতে ছিলেন কয়েক জন বিদেশী। সিংহটাকে দেখতে পেয়ে তাঁরা বহুক্ষণ আমাদের পাশে পাশে চললেন, তাঁদের ভাবভঙ্গী দিয়ে তাঁরা বোঝাতে চাইলেন যে কিনুলিকে তাঁরা চিনতে পেরেছেন।

বাড়ী ফিরতে আমাদের দেরি হলো। কিনুলি উৎকণ্ঠিত ভাব দেখাতে শুরু করেছিল। বাড়ীর সামনে গাড়ীটা থামতে না থামতেই দরজাটা খুলে সে সবেগে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে উঠলো। তার সঙ্গে তাল রাখতে পেরি আর আমাকে দারুণ বেগ পেতে হয়েছিল। আমাদের পালিত শিশুকে সবেগে পালাতে দেখে আমার মনে হলো পেরিও আমার মতো বিস্মিত হয়েছে। এই পালিত শিশুটি ইতিমধ্যেই হলঘরে একটি মহিলাকে ধাক্কা মেরে প্রায় ফেলে দিয়ে পাগলের মতো আমাদের ফ্ল্যাটে পোঁছেছে। তারপর ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে তার বালি ভরা বাক্সের মধ্যে বসে রইলো থাপ্পন জুড়ে। কিনুলি ভারি পরিষ্কার ছিল।

অসুস্থ

শরৎকালে কিনুলি অসুস্থ হয়ে পড়লো। তার অসুখটা ছিল অনেক দিন ধরে আর মারাত্মক ধরনের। সে শুয়ে থাকতো বিষণ্ণভাবে, কিছুই খেতো না, আর যখন সে পায়ে ভর দিয়ে উঠতে চেষ্টা করতো যন্ত্রণায় দারুণ চিৎকার করতে করতে সে যেতো পড়ে। তার শরীরটাকে ইলেকট্রিক হিটার দিয়ে গরম করার পরেই শুধু সে শান্ত হতো। প্রথমে সে সেটার এক পাশে শুতো, তারপরে শুতো অন্য পাশে, আর বাস্তবিকই নিজে না পুড়ে সেটাকে সে একটা থাবা দিয়ে টেনে আনতো কাছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিনুলির অবস্থা প্রতিদিন খারাপ হয়ে উঠতে লাগলো।

এক ডাক্তারকে ডাকা হলো। প্রথমে তিনি ঘরে ঢুকতে ভয় পেলেন। রোগী অদ্ভুত ধরনের — হাজার হলেও হিংস্র জন্তু! যদি সে তাঁকে আক্রমণ করে? একটা জায়গাকে চেয়ার দিয়ে ঘিরে দেবার পর ডাক্তার ভিতরে যেতে রাজি হলেন। কিনুলি এতো অসুস্থ হয়ে পড়েছিল যে তাঁকে সে লক্ষ্যই করলো না। এমন কি সে চোখও খুললো না। এক পাশে শুয়ে জোরে জোরে লাগলো নিশ্বাস ফেলতে। ডাক্তার তাকে সম্ভ্রমসূচক দূরত্ব থেকে দেখলেন। উপদেশ দিলেন ক্যাষ্টর অয়েল খাওয়াতে। তাকে পরীক্ষা না করেই তিনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

আমরা অন্যান্য ডাক্তার ডাকলাম। তাঁরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন ওষুধ বাতলালেন, কিন্তু এক বিষয়ে একমত হলেন যে যাই করা হোক না কেন কিনুলি সেরে উঠবে না।

কিনুলির অসুস্থতার কথা খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময় আমি যত চিঠি পেতাম, যত প্রশ্ন আমাকে করা হতো, যত উপদেশ আমি পেতাম, সেগুলোর সংখ্যা অগুন্তি। অধিকাংশ চিঠিই আসতো ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে: 'কিনুলি কী রকম আছে?' 'সে কি ভালো হয়ে উঠবে?' 'ডাক্তাররা কী বলছেন?' তার খবর নিতে ক্রমাগত লোকে আসতো। একেবারে অপরিচিত লোকেরাও আমাদের মতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। এমন কি উঠনে ছেলেমেয়েরা সচরাচর যে রকম হৈ-চৈ করতো সে রকম আর করতো না। প্রায়ই আমি লক্ষ্য করতাম তাদের

যে সঙ্গী খুব চেঁচামেচি করতো তাকে তারা থামিয়ে দিচ্ছে। প্রায়ই তারা দৌড়ে আসতো কিনুলির খবর নিতে।

ছানাটাকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের যথাসাধ্য আমরা করেছিলাম! কেউ না কেউ সর্বক্ষণ তার পাহারায় থাকতো। ঘুম যে কি জিনিস তা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। ক্লান্তিতে আমি প্রায় চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু তবু আমি বিশ্রাম করতে যেতে পারতাম না। দরজার দিকে আমি সামান্য এগুলেই কিনুলি আমার জন্যে ছটফট করতো, করুণ সুরে করতো মিউ মিউ, যেন সে ডাকতো: 'মা-মা-মা!' প্রতিবারই আমাকে ফিরে আসতে হতো। রাতগুলো শেষ হতে চাইতো না... ঘরের মধ্যে সবকিছুই একেবারে চুপচাপ। ঘড়ির টিক টিক আর কিনুলির অসম শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া আর কিছুই শোনা যেতো না।

প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে কিনুলি অসুস্থ ছিল। তিন সপ্তাহ ধরে সে লড়াই করেছিল মৃত্যুর সঙ্গে। তিন সপ্তাহ ধরে তাকে আমি খাওয়াতাম জোর করে। বহু কষ্টে তার মুখের মধ্যে এক টুকরো মাংস গুঁজে দিয়ে চেষ্টা করতাম তাকে সেটা গেলাতে! কিনুলি খেতে চাইতো না: মুখ ফিরিয়ে খাবারটা সে থু-থু করে ফেলে দিতো। মাঝে মাঝে আমরা কাকুতি মিনতি করে দেখতাম। পরিবারের সবাই তাকে অনুনয় বিনয় করতো — ভাসিয়া, শুরা, এমন কি ছোট্ট তলিয়াও।

'খাও, পুষি!' — তলিয়া অনুনয় বিনয় করে বলতো। — 'ছোট্ট একটা টুকরো।' — এবং মৃদু স্বরে যোগ করে দিতো: 'খুব ছোট্ট, এই টুকু! তোমাকে শুধু সেটাকে গিলে ফেলতে হবে!'

আমাদের অনুনয় বিনয়ের কোনো ফল কিনুলির উপর হয়েছিল কি না, কিম্বা সে শুধু আমাদের হাত থেকে ছাড়া পেতে চাইতো কি না, কী যে কারণ আমি জানি না, কিন্তু সে বাস্তবিকই খেতো — খুব সামান্য।

আমাদের সাহায্য করেছিল একটা মাছি — সাধারণ একটা মাছি। গরমে তার ঘুম ভাঙতো। কিনুলির সঙ্গে সেও খেতে শুরু করতো। সেটা একেবারে তার নাকের তলায় বসে ইলেকট্রিক হিটারে নিজেকে সেঁকে নিতো। এই মাছিটাকে কিনুলি দারুণ অপছন্দ করতো। সেটা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কিনুলি রাগে
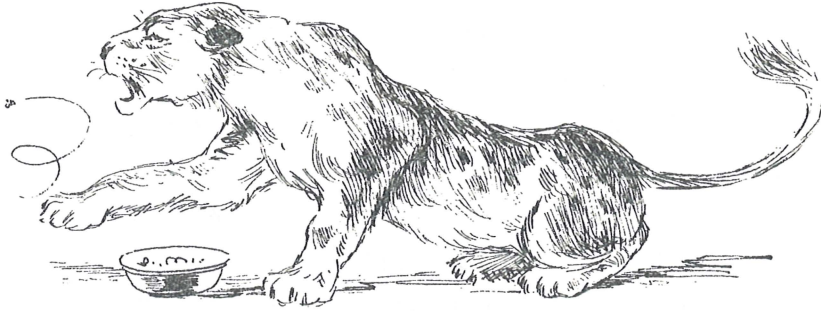
গর্জন করে উঠতো, সেটার দিকে ছুঁড়তো থাবা, আর শত্রু যাতে তার খাবারটা না খেয়ে ফেলে সেটা রদ করার জন্যে বাস্তবিকই খেতো — সত্যি বটে খুবই সামান্য, কিন্তু তাহলেও খানিকটা তো খেতো। এধরনের বন্ধু পাওয়ায় আমরা খুব খুসিই হয়েছিলাম।

শিগ্‌গিরই কিনুলি সেরে উঠতে লাগলো। তখনো তার খিধে বিশেষ হতো না। সে উঠতে পারতো না, কিন্তু খেলতে চেষ্টা করতে শুরু করলো। সে প্রধানত খেলতো একটা কাঠের চামচ আর তার বলটা নিয়ে। তার নাক দিয়ে বলটাকে সে গড়াতো কিম্বা চিৎপাত হয়ে শুয়ে চামচটাকে থাবা দিয়ে ধরে নিজের সামনে সেটাকে তুলে ধরতো বহুক্ষণ ধরে। একথা বলা কঠিন কেন এ দুটো জিনিস নিয়ে খেলা করতেই সে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতো। আমরা 'বল' বললেই তার চোখদুটো চকচক করে উঠতো, আর 'চামচ' বললেই সে সঙ্গে সঙ্গে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়তো। ছানাটা যে ভালো হয়ে উঠছে তার চিহ্ন প্রথম পেরিই লক্ষ্য করেছিল। কিনুলি যখন যন্ত্রণায় চিৎকার করে কুঁকড়ে উঠতো কুকুরটা তখন ভয় পেতো, আর লুকিয়ে পড়তো টেবিলটার তলায়, কিছুতেই তার কাছে যেতে চাইতো না। কিন্তু যেই সে ভালো হয়ে উঠতে শুরু করলো পেরি আবার এলো তার পাশে ঘুমতে। উৎসুক হয়ে সে তার লোম থেকে পোকা বাছতো, আর চাটতো তার মুখটা। একদিন অকস্মাৎ যখন ভাসিয়া দৌড়ে ঘরে ঢুকে আমাদের

বললো যে কিনুলি তার নতুন প্যান্ট আর টেবিলের উপর খুলে রাখা একটা বই ছিঁড়ে ফেলেছে, প্রত্যেকেই তখন দারুণ খুসি হয়ে উঠলো, কারণ এর মানে হলো কিনুলি পুরোপুরি সেরে উঠেছে।

কিনুলি বড় হয়ে উঠলো

সেরে ওঠার পর কিনুলির জন্যে একটা নতুন বকলেস তৈরি করা হলো। আমি স্থির করলাম তাকে বেড়াতে নিয়ে যাবো বলে। এতো দিন বাদ পড়ায় আমি ভয় পেয়েছিলাম যে সে হয়তো খুব ভয় পাবে। কিন্তু হয় কিনুলি বড় হয়ে উঠেছিল, মানুষদের তার আর অত লম্বা বলে মনে হতো না, কিম্বা হয়তো তার বুদ্ধিটা পেকেছিল। পেরির মতোই শান্তভাবে সে রাস্তা দিয়ে হাঁটলো।

তাকে নিয়ে আমি উঠনে গেলাম। ছেলেমেয়েরা আগে তাকে যেভাবে সম্বর্ধনা জানাতো সেভাবে আর জানালো না। কয়েকটি সাহসী ছেলেমেয়ে তাদের হাত কিনুলির দিকে বাড়ালো, কিন্তু মায়েরা তাঁদের শিশুদের তুলে নিয়ে দ্রুত প্রস্থান করলেন। কৌতূহলী পথিকরা আমাদের ছোট্ট উঠনটায় আসতো, ছেলেমেয়ে আর বাসিন্দাদের তারা জিজ্ঞেস করতো কিনুলির কথা। বিস্মিত চিৎকার শোনা যেতো আর বাড়ীর ম্যানেজারকে লোকে হিংসে করতো এ ধরনের 'ভাড়াটে' পাবার জন্যে।

আর এই 'ভাড়াটেটি' তখন খুব বড় হয়ে পড়েছে আর গেছেও খুব বদলে। তার মুখটা হয়ে উঠেছে লম্বা, সেটাকে দেখায় একটা পূর্ণ বয়স্ক সিংহের মুখের মতো। নতুন গোঁফগুলোর দরুন তার চেহারাটা গেছে একেবারে বদলে। শুধু তার নাকের উপরকার ছোট ছোট দুটো তিল আর ছোট্ট একটা দাগ আগেকার কিনুলির কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়। তার দিকে তাকিয়ে এ কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব যে এটাই সেই ছোট্ট জন্তুটা যেটাকে বাস্তবিকই হাতের তালুর মধ্যে রাখা যেতো! এখন এই 'ছোট্ট' জন্তুটা আকারে পেরির চেয়ে বড়, এখন সে টেবিলের তলায় ঢুকতে কিম্বা ইজি-চেয়ারে বসতে প্রায় পারেই না।

যদিও এখন সে ও রকম বড় হয়ে উঠেছে, তবু তার অভ্যেসগুলো বদলায় নি। যখন সে বেড়াল বাচ্চার চেয়ে সামান্য একটু বড় ছিল তখন সে যেরকম জোরে আর সস্নেহে আমার দিকে নাচতে নাচতে আসতো এখনও সেভাবেই আসে। তফাৎটা শুধু এই যে এখন আমাকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতে হয়, নইলে 'বেড়াল ছানাটার' আদর হয়তো আমাকে মেঝেতে পেড়ে ফেলবে। কিনুলি আমার হাতটা নিয়ে খুব সাবধানে খেলা করতো: সেটাকে তুলে নিতো একেবারে তার মুখের মধ্যে এবং চাটতো সেটা। কিন্তু একবারও আমাকে সে ব্যথা দেয় নি। যদি সে মুহূর্তের জন্যে আত্মবিস্মৃত হতো তাহলে আমাকে শুধু সামান্য চড়াতে হতো গলাটা। সঙ্গে সঙ্গে সে আমার হাতটা ছেড়ে দিতো।

গলার স্বর কিনুলি অদ্ভুত বুঝতো। হয়তো সে কোনো দুষ্টুমি করছে, যেমন ধরো ভেঙে ফেলছে কোনোকিছু। ভাসিয়ার পায়ের শব্দ পাওয়া মাত্রই সে টেবিলের তলায় সেঁধিয়ে লুকিয়ে থাকতো, আর কী ঘটে দেখার জন্যে করতো অপেক্ষা। ভাসিয়া যদি মেজাজ খারাপ করে ঘরে ঢুকে তাকে বকতে শুরু করতো তাহলে সেখান থেকে সে বেরুতো না, কিন্তু যদি তার মেজাজটা ভালো বলে মনে হতো তাহলে সে লাফিয়ে উঠে তার সামনের থাবাদুটো রাখতো তার বুকে, কিম্বা শুয়ে পড়ে তার মাথাটা ঘষতো তার পায়ে। আমার কিম্বা ভাসিয়ার পায়ের উপর মাথা রেখে শুয়ে থাকতে সে ভালবাসতো। এটাই ছিল তার শুয়ে থাকার প্রিয় ভঙ্গি।

সন্ধেবেলা সবাই কাজ থেকে ফিরে আসার পর ভাসিয়ার ঘরে আমরা রীতিমতো সার্কাস শুরু করে দিতাম। আমাদের বন্ধুদের জন্যে চেয়ারগুলো রাখতাম দেয়াল দিয়ে। সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হিসেবে টেবিলটাকে রাখা হতো বক্স বলে, আর গ্যালারি হতো সামনেটা। প্রোগ্রামের মধ্যে থাকতো: 'সিংহ ফুটবল খেলছে', 'কুস্তি লড়ছে', 'ইজি-চেয়ারে বসে ঠেলাগাড়ী খেলছে' এবং 'মানুষ সিংহের মুখে মাথা ঢোকাচ্ছে'। শেষেরটাকেই দারুণ বিপজ্জনক বলে মনে করা হতো। এটা ছিল ভাসিয়ার খেলা। সে মেঝেয় শুয়ে পড়তো, এদিকে বাজনাটা যেতো থেমে, সার্কাসে ঠিক যেমনটি হয়, আর কিনুলি তাকে সাবধানে থাবা দিয়ে জড়িয়ে চাটতো তার মাথাটা।

এটাই ছিল প্রোগ্রামের সবচেয়ে প্রধান খেলা। আর সর্বদাই সেটা দারুণ জমতো। ভাসিয়া উঠে দাঁড়াতো, আমি রেডিওটা চালিয়ে দিতাম আর দর্শকরা দারুণ হাততালি দিতো; এদিকে কিনুলির চাটার ফলে তখনো চটচটে মাথাটা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে ভাসিয়া কিনুলির পিঠে একটা স্নেহের চাপড় মারতো।

ভাসিয়া কিনুলিকে দারুণ ভালবাসতো। আর সেও ভালবাসতো তাকে, নানাভাবে আদর করে সে তার অনুরাগ দেখাতো। মাঝে মাঝে কিন্তু ভাসিয়া তাকে নিজের ঘর থেকে বার করে দিতো। তখন কিনুলি চটে গিয়ে আমার কাছে আসতো অভিযোগ করতে: শুয়ে পড়ে সে ভারি করুণ সুরে মিউ মিউ করতো।

অন্য সময় ভাসিয়ার কাছে গিয়ে সে আমার নামে লাগাতো, আর আমরা দু'জনেই তাকে বকলে সে যেতো পেরির কাছে। ভাসিয়া তাই তাকে বলতো 'লাগিয়ে', আর মাঝে মাঝে যাতে সে অভিযোগ জানায় সেইজন্যে ইচ্ছে করেই তাকে সে চটিয়ে দিতো। তখন কিনুলিকে লক্ষ্য করতে ভারি মজা লাগতো!

কিনুলি গালাগালিও করতে পারতো। ব্যাঙের মতো শব্দ করতে করতে সে চলে যেতো নিজের জায়গায়। আমাদের তখন তার কাছে ক্ষমা চাইতে হতো।

'কিনুলি, লক্ষ্মীটি, আর আমি করবো না', — ভাসিয়া বলতো, আর কিনুলি তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকতো। কিন্তু শেষটায় সর্বদাই তার রাগ ভাঙতো।

এ ধরনের শান্ত ও স্নেহশীল জন্তু আর হয় না! আদর করে তাকে যতক্ষণ না চাপড়ানো হতো সে এমন কি মাংসটাও খেতো না। কিন্তু অপরিচিতদের প্রতি এখন তার ব্যবহারটা সম্পূর্ণ বদলে গেল। মাঝে মাঝে তাদের উদ্দেশ্যে সে গর্জন করতো, আর তারা যদি পিছন ফিরতো তাহলে তাদের উপর এমন কি সে ঝাঁপিয়েও পড়তো। এটা শুধু ছিল তার মজা করা। কিন্তু প্রতিবেশীরা তাকে ভয় পেতে শুরু করলো। বিশেষ করে সে দিদিমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবার পর থেকে।

এটা ঘটেছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে, এমন কি কিনুলির পক্ষেও সেটা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। নিজের শক্তির কথা সে জানতো না। একদিন বৃদ্ধা

যখন মেঝে ধুচ্ছিলেন, কিনুলি লাফিয়ে পড়লো তাঁর উপর। দিদিমা পড়ে গেলেন। দিদিমার মতো কিনুলিও দারুণ ভয় পেয়ে হুংকার ছেড়ে ঘর থেকে পালালো।

একবার কিন্তু কিনুলি আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করেছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল আমার ছুটির দিনে। গালিয়া নামে একটি ছোট্ট মেয়ে আর আমি ছাড়া ফ্ল্যাটে আর কেউ ছিল না। হঠাৎ সামনের দরজার ঘণ্টা বেজে উঠলো আর গালিয়া গেল সেটা খুলতে। পিঠে একটা থলি নিয়ে এক মাঝ বয়েসী লোক ভিতরে এলো। আমরা যখন তাকে প্রশ্ন করলাম কী সে চায়, বললো আমাদের ফ্ল্যাটের ছারপোকা মারতে সে এসেছে। তাকে আমরা বললাম যে ফ্ল্যাটে ছারপোকা নেই, বললাম প্রতিবেশীদের ফিরতে দেরি হবে — কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না। তাকে চলে যেতে বলাতেও কোনো কাজ হলো না। 'ছারপোকা-মারিয়ে' দৃঢ়ভাবে যেতে অস্বীকার করলো। আমি বুঝতে পারলাম না কী করা দরকার। তাকে একলা ফেলে আমি চলে যেতে পারি না, আর সেখানে আমি সমস্ত দিন ধরে দাঁড়িয়েও থাকতে পারি না।

কিনুলি আমাকে উদ্ধার করলো। হেলতে দুলতে সে এলো, আর সেই অপরিচিত লোকটিকে দেখে সেইখানে একেবারে স্থির হয়ে পড়লো দাঁড়িয়ে। বন্য জন্তুর তীক্ষ্ন স্থির দৃষ্টিতে অপরিচিত লোকটির মুখের দিকে সে তাকিয়ে রইলো। লোকটা মাথা ঘুরিয়ে অকস্মাৎ দেখতে পেলো এক বন্য জন্তুর সেই স্থির ভয়ংকর দৃষ্টি। কিনুলি আড়মোড়া ভেঙে এক মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়ালো, বড়-হয়ে-ওঠা সিংহীর চকচকে দাঁতগুলো সে বার করলো। 'ছারপোকা-মারিয়ে' চমকে উঠে সামনের দরজার দিকে ভীরু পা বাড়ালো। দরজাটা ছিল তালা বন্ধ।

'ভয় পাবেন না,' — তার হাবভাব লক্ষ্য করে গালিয়া বললো। — 'এটা শুধু একটা সিংহ।'

'সিংহ! তাহলে আপনারা আমায় যেতে দিচ্ছেন না কেন?' — সে চিৎকার করে উঠলো।

উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে আমার হাত থেকে চাবিটা ছিনিয়ে নিয়ে,

সবেগে দরজাটা খুলে, একসঙ্গে দুটো করে সিঁড়ি টপকাতে টপকাতে সে ছুটে নেমে চললো।

আমরা 'ছারপোকা-মারিয়েকে' আর কখনো দেখি নি।

কিন্তু তারপর আরেকটা ব্যাপার ঘটেছিল।

চোরের গল্প

একদিন আমি কাজ থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলাম। আমি ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখি সামনের দরজাটা খোলা আর করিডরে কিনুলি পায়চারি করছে।

আমি বিস্মিত হলাম। এর মানে কী? কে ওকে ঘরের বাইরে ছেড়ে দিয়েছে? আমরা কখনো দরজায় তালা দিতাম না। কিন্তু প্রত্যেকেই জানতো যে আমাদের ঘরে একটা সিংহ আছে। আমরা যখন বাড়ীতে থাকতাম না তখন কেউই ভিতরে যেতো না। 'কে কিনুলিকে ছেড়ে দিতে পারে?' — বিস্মিত হয়ে আমি ভাবলাম। ঘরে ঢুকে দেখি: একটি অপরিচিত লোক। সে একটা আলমারির মাথায় চড়ে বসেছে। মুখটা তার লাল লাল ছোপে ভরা, তার চোখগুলো ঘন ঘন এদিক ওদিক ছুটছে। আর সে কাঁপছে থর থর করে।

অপরিচিত লোকেরা সর্বদাই সিংহকে দেখতে আসে, তাই তাকে দেখে আমি অবাক হলাম না। তবু ব্যাপারটা জানবার জন্যে আমি তাকে প্রশ্ন করলাম:

'কমরেড, কী করে আপনি ভেতরে ঢুকলেন?'

ভয়ে 'কমরেডের' দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল। সে উত্তর দিলো:

'আপ... আপ... না...র ঐ সিংহটা আমাকে এখানে তাড়া দিয়ে এনেছে।'

আমি বললাম, 'ভালো কথা। ওখানে আপনি অনেকক্ষণ রয়েছেন। এখন নেমে আসুন।'

কিন্তু নামতে সে চাইলো না। সে শুধু দেয়ালের আরো কাছে সরে যেতে লাগলো।

সে বললো, 'পু... পু... পুলিস! পুলিসকে ডাকুন।'

আমি তাকে বার বার নেমে আসতে বললাম, কিন্তু সে ক্রমাগত বলে চললো: 'পুলিস।'

তার কথা শুনে থানায় খবর দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। পুলিসের লোক তাড়াতাড়ি এলো। তারা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমার 'কমরেড' ছুটে গিয়ে, তাদের পিছনে লুকিয়ে বার বার অনুরোধ করতে লাগলো তাকে তৎক্ষণাৎ নিয়ে যাবার জন্যে।

কয়েক দিন কেটে গেল। ঐ ঘটনার কথা আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম, এমন সময় 'ইজভেস্তিয়া' খবর কাগজে একটা খবর বেরুলো।

সাময়িক ঘটনার শিরোনামার তলায় সেটা ছাপা হয়েছিল। তাতে ছিল চোরের বিষয়ে এক বিশদ বিবরণ। উক্ত খবরটিকে কোনো রকম পরিবর্তন না করে পুরোপুরি উদ্ধৃত করছি:

'বেশীদিন আগে নয় আমরা খবর ছাপিয়েছিলাম যে ভেরা চাপলিনা, মস্কো চিড়িয়াখানার জন্তুছানাদের বিভাগের ডিরেক্টর, কিনুলি নামে একটি সিংহছানাকে তাঁর নিজের বাড়ীতে প্রতিপালন করছেন।

'কিনুলি এখন সুন্দরী এক তরুণী সিংহী হয়ে উঠেছে, প্রায় একটা গ্রেটডোগের মতো বড়। সে থাবা দিয়ে হাতল টেনে দরজা খোলে, আর যখন তার ক্ষিদে পায় তখন সে তার পাত্রটা দাঁতে করে তুলে নিয়ে রান্নাঘরে যায়।

'কয়েক দিন আগে ভেরা চাপলিনা কাজ থেকে ফিরে কিনুলিকে অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় দেখেন। সে তার দরজার সামনে শুয়ে মেঝের উপর ল্যাজ আছড়াচ্ছিল। তার গায়ের চামড়াটা শিউরে শিউরে উঠছিল, আর সে এক দৃষ্টিতে চেয়েছিল উপর দিকে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে কমরেড চাপলিনা দেখলেন একটা উ'চু আলমারির উপরে একটা লোককে বসে থাকতে। লোকটা ভয়ে কাঁপছিল আর পাগলের মতো চারিদিকে তাকাচ্ছিল।

'আশ্রয় স্থান ত্যাগ করতে অস্বীকার ক'রে আলমারি থেকে না নেমে এই অপরিচিত লোকটি তার গল্প বলেছিল। চুরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে দরজা ভেঙে সে বাড়ীতে ঢুকেছিল। বিনা বাধায় খালি ফ্ল্যাটের এক ঘর থেকে আর এক ঘরে সে

গিয়েছিল। তারপর সে আসে কিন্নুলি যে ঘরে থাকে সেই ঘরে। ঘরে ঢোকার পর সে লক্ষ্য করে যে সে এক সিংহীর সামনে হাজির হয়েছে।

‘এই চোর আপনা থেকেই দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কিন্নুলি ভয়ঙ্কর গর্জন করতে করতে দাঁড়িয়ে ছিল পথ আগলে। ঐ লোকটি একটা টেবিলের উপর ওঠে পড়ে, কিন্তু কিন্নুলি সেখানে যায় তার পিছন পিছন। তখন হতভাগ্য চোর একটা উঁচু আলমারির উপর লাফিয়ে ওঠে আর সেখানে থাকে দু’ঘণ্টা ধরে। এই সাংঘাতিক জন্তুটি তাকে সাবধানে পাহারা দিচ্ছিল।’

যে কাগজে এই খবরটি ছিল, সেটি ছাপা হয় খুব সকালে, আমি তখনও ঘুমিয়ে ছিলাম। আমার ঘুম ভাঙলো টেলিফোনের শব্দে। রিসিভারটা তুলে নিলাম। এক বন্ধুর গলা শুনতে পেলাম:

‘ভেরা ভাসিলিয়েভ্‌না, তুমি বেঁচে আছো ?’

আমি উত্তর দিলাম:

‘হ্যাঁ, ধন্যবাদ। কেন ?’

‘কেন ? তুমি কী খবরের কাগজ দেখো নি ? দেখো নি ? তোমায় দেখতেই হবে। কাগজে লিখেছে যে একটা চোর দরজা ভেঙে তোমার ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল আর কিন্নুলি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল একটা আলমারির মাথায়, আর একটু হলেই তাকে সে খেয়ে ফেলতো। আমার স্ত্রী আর আমি অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম, তাই আমি ভাবলাম তুমি কেমন আছ জানার জন্যে তোমাকে ফোন করি।’

গলপটা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তাকে আমায় বলতে হলো। রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে না রাখতেই আবার বেজে উঠলো।

আমার কী হয়েছে এতো লোক জানতে চেয়েছিল যে রিসিভারটা নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই ঘণ্টাটা উঠছিল বেজে। ঘণ্টাটা একবারও থামছিল না। ক্লান্ত আর বিরক্ত প্রতিবেশীরা চটে উঠলো আর সেটার কাছে গেল না, কয়েক ঘণ্টা পরে আমিও বাড়ী থেকে পালালাম।

কিন্তু একদিনে আমার বিপদ কাটলো না। ঐ খবরের কাগজ শুধু আমার নাম দেয় নি, ঠিকানাও দিয়েছিল।

হাজার হাজার চিঠি আসতে লাগলো, এলেন অনেক নতুন অতিথি। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত মাশা তাঁদের জন্যে দরজা খুলে দিতো। দিনের বেলা অবস্থাটা অত খারাপ হতো না, কিন্তু সন্ধের সময় আমরা না পারতাম কাজ করতে, না পারতাম বিশ্রাম করতে। সদর দরজাটা খোলা আর বন্ধ করায় আমাদের সমস্ত সময় কেটে যেতো।

আবার কিনুলিই আমাদের বাঁচালো। যে সব লোক ঘরে আসতো তাদের পা শোঁকা তার অভ্যেস ছিল। কিম্বা, যেটা আরো ভয়ের ব্যাপার, অতিথিদের গোড়ালিটা তার থাবা দিয়ে জড়িয়ে, সে সামান্য কামড়াতো। কিনুলির দাঁতগুলো ছিল বড় বড় আর ভয়ঙ্কর, অপরিচিত লোকে বুঝতে পারতো না যে সে বাস্তবিকই কামড়াবে কি না। বেচারি লোকেরা সরে সরে গিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই বিদায় নিতো। ক্রমশ সিংহটিকে দেখতে আসা লোকের সংখ্যা কমে গেল।

ভালোবাসার জয়

কিনুলি এখন বড়সড় সিংহী হওয়া সত্ত্বেও আগেকার মতো প্রতিবেশীরা তাকে ভালোবাসতো। তাদের কাছে তখনো সে ছিল সেই ছোট্ট কিনুলি, মা যাকে ছেড়ে গিয়েছে। প্রত্যেকেই তাকে ভালোবাসতো—শুধু ছোট্ট গালিয়ার ঠাকুমা ছাড়া। সিংহটাকে তাড়াবার জন্যে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন!

একদিন তিনি আমার ফ্ল্যাটে এসে হাজির হলেন, তাঁর পিছনে ন'দশজন লোক। আমাকে ডেকে হাসি মুখে তিনি এক পাশে নিয়ে গেলেন। জানা গেল, এঁরা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যাপারে নিযুক্ত একটি দল। ডাক্তারদের একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন:

'কমরেড, এ কথা কি সত্যি যে আপনি আপনার ঘরে একটা সিংহ রেখেছেন?'

আমি উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ। তাতে কী হয়েছে?'

তিনি বললেন, 'শুনুন, কয়েকজন বাসিন্দার কাছ থেকে অভিযোগ এসেছে

যে এই সিংহটা ফ্ল্যাটটাকে অপরিষ্কার করে। তাই আমরা এসেছি তদন্ত করতে।’

আমার প্রতিবেশীদের অধিকাংশই বিরক্ত হয়ে উঠলো:

‘অভিযোগ ? কে করেছে ? কেন, কিনুলি তো বেড়ালের চেয়েও পরিষ্কার!’

আমি স্থির করলাম তর্ক করবো না।

‘ভেতরে এসে তাকে দেখুন,’ — আমি বললাম।

দরজাটা খুললাম। আর দলটি ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল, চোখ বড় বড় করে তাঁরা একে অন্যের পিছনে লুকিয়ে পড়লেন।

কিনুলি আমার কাছে আদর খেতে এলো। পেরিও এলো। এই দলের লোকেরা যখন দেখলেন যে বিশেষ কিছু ভয়ের ব্যাপার নয় তখন তাঁরাও এলেন কাছে, আর সেই ডাক্তারটি ঘরের অবস্থার কথা একেবারে ভুলে গিয়ে সিংহীর দিকে তাকিয়ে রইলেন প্রসংশাপূর্ণ দৃষ্টিতে। কিনুলি চাল মারতে শুরু করলো: কখনো সে শুয়ে পড়লো চিৎপাত হয়ে, কখনো তার গা'টা ঘষতে লাগলো আমার সঙ্গে, কখনো আমার হাতটা ধীরে ধীরে সে তুলে নিলো নিজের মুখে, এতো ধীরে ধীরে যেন বাস্তবিকই সে একটা পোষা বেড়াল। আর ঘরটাও সম্পূর্ণ পরিষ্কার, কোথাও সামান্য ধুলোও নেই। এমন কি সিংহীর গা থেকেও একটুও গন্ধ বেরুচ্ছিল না। তাঁদের নোট বইতে তাঁরা এইসব কথা টুকে নিলেন।

কিন্তু এই ঘটনায় বৃদ্ধা নিরাশ হলেন না। তিনি আর একটা অভিযোগ পাঠালেন, যেন সমস্ত প্রতিবেশীদের তরফ থেকে। এটা নিয়ে কী যে করবো আমি ভেবে পেলাম না। প্রতিদিনই আসতে লাগলো নতুন নতুন দল। সিংহীকে উচ্ছেদ করতে বলে অসংখ্য নোটিশ তাঁরা পাঠাতে লাগলেন। বৃদ্ধা বিজয়িনীর ভঙ্গীতে লাগলেন ঘুরে বেড়াতে।

‘সিংহীটা এখানে থাকবে না। আমি ওটাকে তাড়িয়ে ছাড়বো।’

কিন্তু অন্যান্য বাসিন্দারা যখন দেখলেন যে তাঁদের নাম দিয়ে অভিযোগ করা হয়েছে তখন তাঁরা দারুণ চটে উঠলেন:

‘আমরা কিনুলির হয়ে বলবো! আমরা একসঙ্গে গিয়ে ওঁদের বলবো যে কিনুলি আমাদের কোনো অসুবিধের সৃষ্টি করে নি।’

পুলিসকে তাঁরা একটা বিবৃতি লিখে পাঠালেন:

'আমরা, বোলশায়া দিমিত্রোভ্‌কা স্ট্রীটের অমুক নম্বর বাড়ীর, অমুক নম্বর ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা, ঘোষণা করছি যে আমাদের ফ্ল্যাটে যে সিংহছানা থাকে তার বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। সেটা সম্পূর্ণ পোষ-মানা আর তাকে সব সময় রাখা হয় তালা বন্ধ করে। সেটা কখনো করিডর, রান্নাঘর কিম্বা স্নানের ঘরে যায় না, আর যে ঘরে সে থাকে সে ঘরটাকে রাখা হয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে। উক্ত সিংহী আমাদের, যারা এই ফ্ল্যাটে থাকি, কখনো অসুবিধের সৃষ্টি করে না, আর সে হাঁকডাকও করে না।'

এই বিবৃতিতে ফ্ল্যাটের সবাই সই করলো। এবং একটি মহিলা সেটির তলায় পুনশ্চ দিয়ে লিখে দিলেন:

'আমার তিনটি ছেলেমেয়ে আছে — সাত, দশ আর এগারো বছর বয়েসের। সিংহীটি ফ্ল্যাটে থাকলে তাদের কোনো বিপদ হবে বলে আমি মনে করি না। জন্তুটি পোষ-মানা এবং তার উপর সর্বদা নজর রাখা হয়।'

কিনুলির পক্ষ নিয়ে ফ্ল্যাটের সবাই কোমর বেঁধে দাঁড়ালো।

সিংহীর উচ্ছেদের কথাটা আদালত পর্যন্ত গড়ালো। অবস্থাটা হয়ে উঠলো অন্য ধরনের। থানার বড় কর্তাকে নিয়ে বাড়ীর ম্যানেজার আর ঝাড়ুদার আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমি ভাবলাম 'ওকে এবার যেতে হবে।' তাঁদের আমি আমার ঘরে নিয়ে গেলাম, কিন্তু নিজেকে আমি সামলাতে পারলাম না, আমি প্রশ্ন করে উঠলাম:

'আপনারা কি ওকে তাড়িয়ে দেবেন?'

তাঁরা বললেন:

'না, না! আমরা শুধু দেখতে এসেছি ঘটনাটা কী। আমরা স্বাস্থ্য-বিভাগ থেকে একটা বিবৃতি পেয়েছি যে অন্যান্য বাসিন্দারা আপনার সিংহীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন। তাঁরা লিখেছেন যে তাঁরা ঘর থেকে বেরুতে ভয় পান, এবং যখন বেরোন তখন আত্মরক্ষার জন্যে লাঠি কিম্বা অন্যান্য জিনিস তাঁদের নিতে হয়। তাই আমরা এসেছি তদন্ত করতে।'

তাঁদের আমি আমার ঘরে নিয়ে এলাম। সব কথা তাঁদের আমি বললাম।

আর প্রতিবেশীরা যে বিবৃতিটা লিখেছিলেন সেটা দেখলাম। ঠিক তখনই একজন প্রতিবেশী এলেন খবরের কাগজটা ধার নিতে।

মহিলাটি বললেন, 'ঐ বুড়ি আবার আর একদলকে পাঠিয়েছে?'

পুলিস অফিসার হেসে উঠলেন।

তিনি বললেন, 'আপনি আমাদের বলুন এই সিংহটাকে কি আপনি একটা আপদ বলে মনে করেন?'

মহিলাটি হাত নেড়ে বললেন, 'একটুও না! আমাদের কিনুলি যেন আপদ হতে পারে?!'

তারপর ঘরে এলেন আর একজন প্রতিবেশী।

'আমাদের কিনুলিকে নিয়ে যেতে আমরা ওঁদের দেবো না! আমরা ওকে পালন করি নি বটে, কিন্তু যতদিন ধরে সে বড় হয়ে উঠেছে ততদিন আমাদের অনেক ঝক্কি পোয়াতে হয়েছে।'

তারপরে আমরা গেলাম কিনুলির কাছে। বিরাট হলদে বেড়ালটা অলসভাবে দাঁড়িয়ে উঠলো। আমার কাছে এসে সে তার মাথাটা সস্নেহে আমার হাঁটুর সঙ্গে ঘষতে লাগলো।

বাকী বাসিন্দারা উক্ত অফিসারের বেরিয়ে আসার জন্যে করিডরে অপেক্ষা করছিলেন। প্রত্যেকেই বৃদ্ধার উপর চটে উঠেছিলেন। তলিয়ার বন্ধু ইউরা জোর করে বললো যে কিনুলিকে নিয়ে যেতে সে কোনো মতেই দেবে না। সে ভুলে গেল কিনুলি একবার কীভাবে তার হাফ প্যান্টটা টেনে খুলে নিয়েছিল, যার ফলে তাকে উলঙ্গ অবস্থায় ছুটে যেতে হয়েছিল তার ঘরে।

বিদায় নেবার সময় এই অফিসারটি আমার সঙ্গে আন্তরিকভাবে হাত মেলালেন।

তিনি বললেন, 'আমরা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়েছি। সবকিছুই এখন একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর আপনি কোনো অসুবিধেয় পড়বেন না। যদি কেউ আপনাকে বিরক্ত করে তাহলে আপনি আমাকে টেলিফোন করবেন।'

খোলা দরজার কাছে আমরা বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে বলতে লাগলাম:

'ধন্যবাদ, অফিসার! ধন্যবাদ!'

আর পরের দিনেই আমি একটা চিঠি পেলাম। তাতে লেখা ছিল:

'এখন স্পষ্ট করে বোঝবার এবং এ কথা বিবেচনা করার পর যে, যে-সিংহীটি আপনার ফ্ল্যাটে আছে সেটি বিপজ্জনক নয় এবং তার বর্তমান স্বাস্থ্য ভালো নয়, সিংহীটিকে তিনদিনের মধ্যে চিড়িয়াখানায় স্থানান্তরিত করার যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল সেটি রদ করা হচ্ছে। জন্তুটি যতদিন না সম্পূর্ণ সুস্থ হয় এবং তার স্থানান্তরের জন্যে আবহাওয়ার অবস্থা যতদিন না উপযুক্ত হয়ে ওঠে ততদিন সে আপনার কাছে থাকতে পারে।'

কিনুলিকে আমাদের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হলো। আর তারপর কেউ আমাদের বাধা দেয় নি।

জন্মদিন

খুব সকালে দরজার ঘণ্টা শুনে আমার ঘুম ভাঙলো। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে, ড্রেসিং গাউনটা জড়িয়ে তাড়াতাড়ি আমি গেলাম দরজাটা খুলতে। কে হতে পারে ? এতো সকালে কেন ?

চিঠি বিলি করার পিয়ন। অমায়িকভাবে হেসে সে আমার দিকে একটা চিঠি বাড়িয়ে দিলো। খামটার উপর ধরে ধরে ছেলেমানুষি হাতের লেখায় লেখা:

কিনুলি চাপলিনা
বোলশায়া দিমিত্রোভ্‌কা স্ট্রীট
মস্কো

প্রথমটায় ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারলাম না। খামটার উপর বাড়ীর কিম্বা ফ্ল্যাটের নম্বর কোনোটাই লেখা নেই। ভারি অদ্ভুত ! তারপর অকস্মাৎ আমার মনে পড়লো — আজ ২০শে এপ্রিল, কিনুলির এক বছর পূর্ণ হয়েছে, তার বাচ্চা বন্ধুর দল তাকে জন্মদিনের শুভ কামনা জানাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এতে আমার মেজাজটা খুব খুসি হয়ে উঠলো। আমি হেসে উঠলাম আর পিয়নও উঠলো

হেসে। যাবার আগে আমাকে সে অনুরোধ করলো যে কিনুলিকে জন্মদিনে তার অভিনন্দনটাও যেন আমি জানাই। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় বারবার সে পিছন ফিরে আমার দিকে তাকাতে আর মাথাটা নাড়াতে লাগলো।

যখন আমি ভাসিয়ার ঘরে গেলাম তখন কিনুলি ঘুমিয়ে রয়েছে। ভাসিয়ার সঙ্গে সেও সর্বদা সকাল সকাল উঠতো, কিন্তু যেই সে যেতো কাজে কিনুলি ফিরে যেতো বিছানায়। পেরি আমাকে সস্নেহে সম্বর্ধনা জানালো, কিন্তু কিনুলির উঠে পড়ার কোনো তাড়া নেই।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কিনুলি! উঠে পড়, কুঁড়ের সর্দার! আজ তোর জন্মদিন, তোর একবছর বয়েস হলো, আর তুই কিনা ওখানে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে রয়েছিস!'

কিনুলি অলসভাবে আড়মোড়া ভাঙলো আর হাই তুললো। তার ঘুম জড়ানো আধা বোঝা চোখদুটো যেন বলে উঠলো: 'আমি কি উঠবো, না উঠবো না?' কিন্তু যে মুহূর্তে পেরি আমার কাছে এলো কিনুলি উঠলো লাফিয়ে। অন্য কাউকে আদর করলে তার সহ্য হয় না, হিংসুটের মতো কুকুরটাকে ঠেলে সরিয়ে সে শুরু করলো আমার পায়ে গা ঘষতে।

সেদিন ছিল অনেক কাজ। জন্মদিনের রাত্রিভোজের জন্যে কিনুলির প্রিয় খাবার জিনিসগুলি কিনতে হবে। আর একটা বড় ফুটবলও নিশ্চয়ই হবে কিনতে। কিনুলিকে বল কিনে দেবার কথাটা তলিয়ার মাথা থেকে বেরিয়েছিল। বহুদিন থেকে সে পয়সা জমাচ্ছিল একটা বল কেনার জন্যে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দোকানে বল পাওয়া গেল না। অনেক খুঁজতে হলো। সন্ধের সময় সবকিছু প্রস্তুত। টেবিলটা হলো সাজানো, মাশা ভাজলো কাটলেট আর কিনুলির উপহারগুলো রাখা হলো সোফার উপর। তাদের মধ্যে ছিল — নতুন একটা খাবার পাত্র, একটা দম দেওয়া মোটরগাড়ী, আর তিনটে ফুটবল, সেগুলোকে এমন বড় করে ফোলানো হয়েছিল যে মনে হচ্ছিল এক্ষুনি বুঝি ফেটে যাবে। একটা দিয়েছিল তলিয়া, অন্য দুটি অপরিচিত লোকেরা দিয়ে গিয়েছিল জন্মদিনের শুভ কামনার সঙ্গে।

অলপক্ষণের মধ্যেই অতিথিরা এলো।

সেদিন কিনুলি আমাদের সঙ্গে রাতের খাবার খেলো। সে সোফায় বসে

নতুন পাত্রটা থেকে সাবধানে খেলো স্যুপ। পাত্রটা ছিল টেবিলের উপর, কিন্তু কিনুলি এমন পরিছন্ন খাইয়ে ছিল যে শাদা টেবিলের কাপড়টার উপর এক ফোঁটাও দাগ পড়লো না। সেটা শেষ করার পর সে তার থাবাটা বাড়িয়ে টেবিলের উপর আস্তে আস্তে ঠুকে আরো খানিকটা স্যুপ চাইলো। কিন্তু তাকে আর স্যুপ দেওয়া হলো না, কারণ ঐ দিনের সম্মানার্থে মাশা তার কাটলেটগুলো তৈরি করেছিল আর বানিয়েছিল একটা বড় অমলেট। রাত্রের খাবার পর কিনুলির জন্মদিনের চিঠিগুলো চেঁচিয়ে পড়া হলো। প্রায় অধিকাংশই এসেছিল ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে। আর শুরু হয়েছিল এইভাবে: 'প্রিয় কিনুলি, আমরা তোমাকে খুব ভালোবাসি। তোমার জন্মদিনে আমরা পাঠাচ্ছি শুভ কামনা।'

প্রথমটায় কিনুলি মন দিয়ে শুনছিল, কিন্তু তারপর শুনতে শুনতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। অনেক অনেক চিঠি ছিল, আর তাছাড়া অমলেটও আর নেই। সোফা থেকে সে লাফিয়ে নেমে... অকস্মাৎ ফুটবলগুলোর মুখোমুখি দাঁড়ালো। সেগুলো ছিল সুন্দর নতুন তামাটে রঙের বল। তার পুরোনো বলটাকে বহুকাল আগেই সে ছিঁড়ে ফেলেছিল। এখন এক লাফে সেগুলোর উপর সে ঝাঁপিয়ে পড়লো, থাবা দিয়ে ধরলো সেগুলোকে, চেষ্টা করলো একসঙ্গে ধরতে। বলগুলো গড়িয়ে গেল, আর কিনুলি, একবছর বয়েসের সিংহী, জগতের সবকিছু ভুলে বেড়ালছানার মতো ছুটলো তাদের পিছন পিছন। তাকে দেখে হাসি চাপা অসম্ভব। ঘরময় বলগুলো ছুটোছুটি করতে লাগলো, গড়িয়ে গড়িয়ে ঢুকতে লাগলো টেবিল, চেয়ার আর সোফার তলায়। মনে হলো যেন আসবাবপত্তরগুলোও
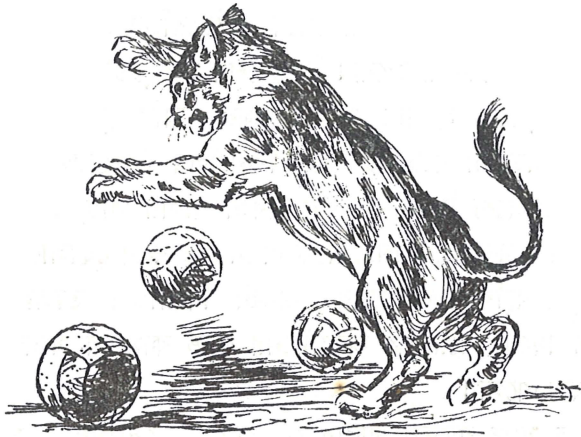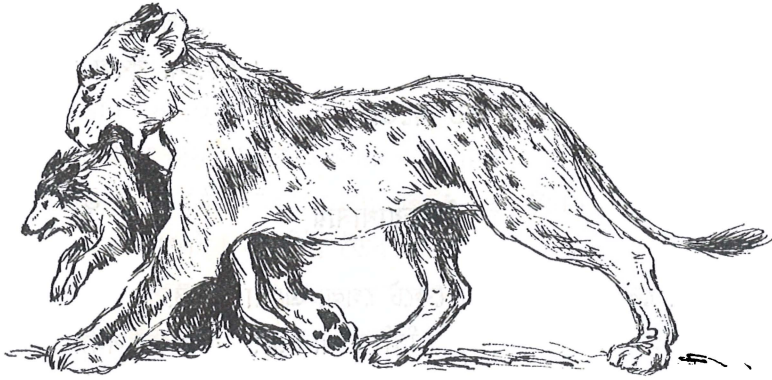
জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ঘরের সবকিছুই লাগলো নড়তে। বলটা খাটের তলায় গড়িয়ে ঢোকার পর খাটটাও কিনুলির কাঁধে চেপে চলে গেল ঘরের অন্যদিকে।

কিনুলি খেলায় এতো মত্ত হয়ে উঠলো যে তাকে শান্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়লো। আমরা চেষ্টা করলাম বলগুলোকে নিয়ে নিতে। কিন্তু থাবা দিয়ে ধরে কিনুলি শুয়ে রইলো সেগুলোর উপর, বল দিতে চাইলো না। এ থেকে উদ্ধারের একটা পথ মাশা আবিষ্কার করলো। পেরিকে ডেকে ভাণ করলো যেন তাকে সে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কিনুলি বলগুলো ফেলে কুকুরটার পিছন পিছন দৌড়োলো। একা থাকতে সে ভালোবাসতো না।

কিনুলিকে না নিয়ে কুকুরটাকে বাইরে নিয়ে যেতে আমাদের সর্বদাই দারুণ অসুবিধেয় পড়তে হতো! পেরি ঘর থেকে বাইরে যাবার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গেই কিনুলি তার পিছন পিছন গিয়ে নিজের থাবা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিতো দরজা থেকে। আমাদের নানা রকম মতলব আঁটতে হতো। কিনুলির পিঠ চাপড়ে তার মন আমি অন্যদিকে ফেরাতে চেষ্টা করতাম, ভাসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াতো যাতে সময় মতো সেটাকে সে বন্ধ করতে পারে আর মাশা পেরিকে তুলে নিয়ে করিডর ধরে যেতো দৌড়ে চলে। কিন্তু গোপনে হরণ করার ব্যাপারটা সব সময় সফল হতো না। মাঝে মাঝে কিনুলি সবাইকে ছাড়িয়ে মাশার কাছে ছুটে যেতো, তার কাছ থেকে নিয়ে নিতো পেরিকে, আর তারপর কুকুরটার ঘাড়টা ধরে টানতে টানতে

নিয়ে আসতো ঘরের ভিতরে। এ ব্যাপারটাকে আমরা বলতাম 'পেরি-হরণ'। এরকম ব্যবহারে পেরি খুব অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কোনো রকম বাধা না দিয়ে সে নিজেকে শান্তভাবে টেনে আনতে দিতো।

চিড়িয়াখানায়

দেখতে না দেখতে শীতকাল কেটে গেল, এলো বসন্ত, আর তারপর গ্রীষ্ম। গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গেই এলো কিনুলিকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবার সময়। এটার কারণ এই নয় যে তাকে নিয়ে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, কিম্বা তাকে আমরা মনে করতাম আপদ বলে। একেবারে তার উল্টোটা। যত তার বয়েস বাড়ছিল ততই সে বাধ্য আর শান্ত হয়ে উঠছিল। এখন তার থাবাগুলোর শক্তি সম্বন্ধে অনেক ভালো জ্ঞান হয়েছে, অনেক ভালো জ্ঞান হয়েছে তার নখগুলোর তীক্ষ্নতা সম্বন্ধে — এক একটা নখ এক একটা আঙুলের মতো লম্বা। খেলা করার সময় থাবাটা যদি দৈবাৎ কারো গায়ে লেগে যায় তাহলে কখনোই সে জখম করে না। সে জিনিসপত্তরও আর নষ্ট করে না। মাশা টেবিলের উপর বাসনগুলো রাখতে পারে, এমন কি মাংসও, কিনুলি কিছুই ছোঁয় না। এক কথায় বলতে গেলে বড় সুশিক্ষিত কুকুরের মতো সে ব্যবহার করতো।

পেরির প্রতিও তার মনোভাবটা বদলায় নি। কুকুরটার কাছে কিনুলি তখনো ছিল শুধু একটা ছোট্ট বেড়ালছানা। পেরি কিনুলির পায়ে-পায়ে ঘুরতো, আগেকার মতোই খাবার পর তার মুখটা করতো চেটে পরিষ্কার, তার পক্ষ সমর্থন করতো, তার দেখাশোনা করতো। সিংহীও প্রতিদান দিতো একইভাবে। কুকুরটার জন্যে সামান্য মাংস না রেখে একবারও সে তার ভাগের সব মাংসটা খেয়ে ফেলতো না। তাই কিনুলিকে যখন খাওয়ানো হতো পেরি সামান্য দূরে শান্তভাবে থাকতো শুয়ে। মাঝে মাঝে আমাদের কথাও কিনুলির মনে পড়তো। সে আমার কিম্বা ভাসিয়ার জন্যে নিয়ে আসতো এক টুকরো জঘন্য চেবানো হাড়, আর সেই লাল ঝোল মাখা জিনিসটা আমাদের একেবারে মুখে চেপে সে আমন্ত্রণ জানাতো এক কামড় খেতে।

তাকে বিদায় দেবার কথাটা আমাদের খুব খারাপ লাগতো। কিন্তু তাকে আমাদের বিদায় দিতে হবেই। পুলিস আর আমাদের ফ্ল্যাটে একটা সিংহীকে রাখতে দেবে না। সে ছিল একটা বিরাট জন্তু, আর চারদিকে ছিল বহু লোক। ধরো, সে যদি কোনো দিন কাউকে একবার কামড়ায়!

তাই চিড়িয়াখানায় কিনুলির জন্যে একটা বাড়ী তৈরি করা শুরু হলো, বাচ্চা জন্তুদের এলাকার পাশেই। বাড়ীটা তৈরী হবার পর তার ভিতরে রাখা হলো একটা টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার; কিনুলির খেলার আর দৌড় ঝাঁপের জন্যে একটা ছোট্ট উঠন আর বড় খোলা জায়গার চারদিকে দিয়ে দেওয়া হলো রেলিঙ।

তার যাবার দিন এলো। আমরা খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠলাম। স্থির হয়েছিল কিনুলিকে একটা মোটরে করে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু কেউ জানতো না সে এটা কীভাবে নেবে, কারণ এখন সে এক বিরাট, শক্তিশালী সিংহ। স্থির করা হয়েছিল যে গাড়ীটা আসার আগে সব ব্যবস্থা করে রাখা হবে। এই যাত্রার জন্যে বিশেষ করে একটা বকলেস তৈরি করা হয়েছিল। সেটাকে তার গলায় পরানো আর চামড়ার ফিতেটার দৃঢ়তা পরীক্ষা করা দরকার। কিন্তু তারপর এমন একটা ঘটনা ঘটলো যেটা কেউই আমরা আগে থেকে ভাবি নি। বকলেসটা আমি তার গলায় পরাবার আগেই কিনুলি হুংকার ছেড়ে থাবা দিয়ে আমার হাত থেকে সেটা ফেলে একপাশে লাফিয়ে সরে গেল। পরে বোঝা গেল বকলেসটায় আলকাতরা লাগানো হয়েছিল আর এই অপরিচিত গন্ধে সে পেয়েছিল ভয়। আমরা নানাভাবে চেষ্টা করলাম! বকলেস ঘষলাম মাংস আর মাখন দিয়ে, কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হলো না। এমন কি বকলেসটা যখন পেরির গলায় পরিয়ে কুকুরটাকে পাঠালাম কিনুলির কাছে, কিনুলি কিছুতেই তাকে তার কাছে আসতে দিলো না। আমাদের তাড়াতাড়ি লোক পাঠাতে হলো ডাক্তারখানায় একটা চওড়া ব্যান্ডেজের জন্যে। সেটাকে আমরা পাঁচ ভাঁজ করে একটা কলার বানালাম। কিনুলি সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে তার গলায় পরাতে দিলো।

মোটরগাড়ীটা এলো দশটার সময়। ড্রাইভার উঠনে গাড়ী থামালো। আমরা বাইরে গেলাম কিনুলির সঙ্গে। বেচারা পুষি! সে এমন ঘাবড়ে গিয়েছিল যে আমরা যখন বকলেসটা তাকে পরালাম সেটা সে লক্ষ্যও করলো না। তিনজনে

আমরা সেই চামড়ার ফিতেটা ধরে রইলাম — ভাসিয়া, শুরা আর আমি। তলিয়া সামনে সামনে চললো পেরিকে নিয়ে। আমাদের কেউ পিছনে পড়লে কিনুলি হাঁটা বন্ধ করছিল।

এইভাবে আমরা ফ্ল্যাটের বাইরে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামলাম। এমন সময় কিনুলি হঠাৎ ভয় পেয়ে ছুটে ফিরে গেল। চামড়ার ফিতেটা টানাটানিতে গেল ছিঁড়ে। বিরাট চেহারার হলদে সিংহীটা বেড়ালছানার মতো ভয় পেয়ে দৌড়ে বাড়ীতে চলে গেল। দরজার তালা ভেঙে সেটা খুলতে তার এক মিনিটও লাগলো না, আমরা যখন পৌঁছুলাম ততক্ষণে সে তার ঘরের টেবিলের তলায় সেঁধিয়েছে।

অবশেষে বহু কষ্টে তাকে আমরা বার করে ভুলিয়ে গাড়ীটায় নিয়ে গেলাম। ভাসিয়া, শুরা, ছোট্ট তলিয়া, পেরি আর আমি গাদাগাদি করে গাড়ীর মধ্যে ঢুকে সেখান থেকে কিনুলিকে ডাকলাম আর চেষ্টা করলাম কিনুলিকে ভিতরে ঢোকাতে। ঢুকতে মনস্থ করার আগে বহুক্ষণ ধরে গাড়ীটার চারপাশে সে ঘুরতে লাগলো করুণ সুরে মিউ মিউ করতে করতে। কিন্তু ভেতরে ঢোকার পর সে সোজা হয়ে সিটের উপর বসলো। সে বসলো তার পিছনের থাবাগুলোর চাপ ভাসিয়ার উপর রেখে। আর তার সামনের থাবাগুলো রইলো আমার কোলে। সমস্ত পথটা সে থাকলো খুব শান্ত হয়ে।

চিড়িয়াখানায় কিনুলির জন্যে অপেক্ষা করেছিল রৌদ্রস্নাত একটা খোলা জায়গা। কয়েকজন আগন্তুক খুব সকাল সকাল এসেছিল। তারা খবর পেয়েছিল যে কিনুলি আসছে। নিজেকে একটা অপরিচিত জায়গায় দেখে কিনুলির মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেল। সে মাটির উপর গুঁড়ি-শুঁড়ি মেরে বসে পেরির তলায় তার বিরাট মাথাটা লুকিয়ে দারুণ কাঁপতে লাগলো।

সে রাত তার সঙ্গে আমি খাঁচায় কাটালাম। সমস্ত রাত কিনুলি হয় ছটফট করে পায়চারী করলো, চেষ্টা করলো থাবা দিয়ে দরজাটা খুলতে, কিম্বা হঠাৎ হঠাৎ থেমে পড়তো রাত্রির চিড়িয়াখানার অদ্ভুত শব্দগুলো শোনার জন্যে। রাত্রি কেটে গেল... সকাল হলো।

সকালে আমি বাড়ী ফিরলাম। আমার পিছন পিছন কিনুলি চেষ্টা করলো বাইরে বেরুতে। বার বার সে শিকগুলোর উপর ঠুকলো তার মাথাটা। তারপর সে

আর বাইরে বের‍ুতে পারবে না হঠাৎ যেন একথাটা ব‍ুঝতে পেরে জড়সড় হয়ে শ‍ুয়ে পড়লো।

বহ‍ুদিন ধরে কিন‍ুলি নড়লো না এবং খেলো না। শিকগ‍ুলোর ভিতর দিয়ে গাছ, বাড়ী, বেড়া পেরিয়ে দ‍ূরের দিকে শ‍ূন্য দ‍ৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকতো। তার সদাজীবন্ত অর্থবোধক চোখগ‍ুলো এখন পড়লো বিষণ্ণ হয়ে, সেগ‍ুলোকে জীবন্ত জন্তুর চোখের চেয়ে ম‍ৃত জন্তুর চোখ বলেই বেশী মনে হতে লাগলো। তার চোখের এই উদাস উৎসাহহীন দ‍ৃষ্টি দেখে আমি সবচেয়ে বেশী ভয় পেলাম। মনে হলো আমাকেও যেন সে চিনতে পারছে না। মাঝে মাঝে বহ‍ু সাধ্য সাধনার পর আমার হাত থেকে সে এক টুকরো মাংস খেতো। মাঝে মাঝে সেটাকে সে গিলে ফেলতো, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই সেটা ঝুলে থাকতো তার শিকারী দাঁত থেকে, তারপর যেতো পড়ে। কিন‍ুলি এমন কি ঘাড়ও ফেরাতো না।
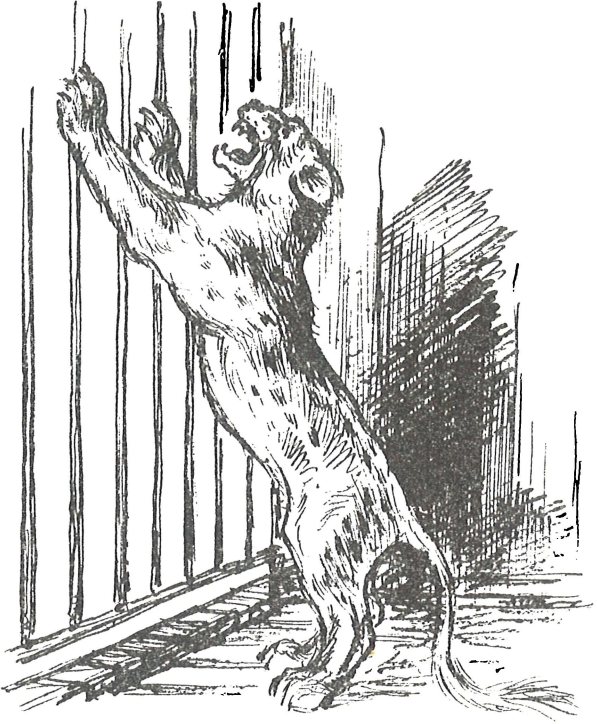
দশ দিন কাটার পর কিন‍ুলি ধাতস্থ হতে শ‍ুর‍ু করলো। দ‍ুর্বল থাবায় ভর দিয়ে প্রায় নড়তেই পারতো না, কিন্তু সে তার চারিপাশের জন্তুজানোয়ার আর মান‍ুষদের উপর কৌত‍ুহল দেখাতে শ‍ুর‍ু করলো। আমাদের পরিবারের সবাই প্রতিদিন তাকে দেখতে যেতো। যখন ভাসিয়া, শ‍ুরা, তলিয়া আসতো তখন কিন‍ুলি

সবচেয়ে বেশী খুসি হয়ে উঠতো। তাদের পায়ে সে সস্নেহে নিজেকে ঘষতো, অনুনয় করতো আদর করতে।

খুব সকালে, চিড়িয়াখানা খোলবার আগে, আমি তাকে বেড়াতে নিয়ে যেতাম। তাকে আমি নিয়ে যেতাম বকলেস না পরিয়ে। চিড়িয়াখানায় আসার পর থেকে কিনুলি গলায় বকলেস পরাতে দেয় নি। তাই তাকে আমি চামড়ার ফিতে দিয়ে না বেঁধেই নিয়ে যেতাম। আমার পাশে পাশে সে হাঁটতো একটা বিরাট শান্ত কুকুরের মতো। তাকে দেখে অন্যান্য জন্তুরা কী অবাকই না হতো! হরিণগুলো আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকে অনুসরণ করতো, দৌড়ে পালাতে উদ্যত হতো। একদল পাহাড়ী ছাগল পাথর থেকে পাথরে লঘু পায়ে লাফাতে লাফাতে ছোট পাহাড়টার পাশে হয়ে যেতো অদৃশ্য, আর হাতির বাচ্চাটা প্রথমে কিনুলির দিকে তেড়ে এসে তার বাড়ীর পিছনে পড়তো লুকিয়ে, যেন নিজের ধৃষ্টতায় সে নিজেই ভয় পেয়ে গেছে। কিনুলি তাদের পাশ দিয়ে চলে যেতো তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগ না দেখিয়ে। দর্শকদের চিৎকারকেও সে ভ্রূক্ষেপ করতো না।

কিনুলির খাঁচার সামনে সর্বদাই দর্শক থাকতো। ধৈর্য ধরে তারা বাড়ী থেকে সিংহীটার বেড়িয়ে আসার সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতো। অনেকেই প্রতিদিন আসতো দেখতে সে কেমন আছে।

একদিন খুব সকালে চিড়িয়াখানা খোলবার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি ছোট্ট মেয়ে কিনুলির খাঁচা পর্যন্ত দৌড়ে এসেছিল। তাদের আমি কখনো ভুলবো না। প্রথম জন দৌড়বার ফলে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করলো:

'কিনুলি কী রকম আছে?'

যখন তাকে বলা হলো যে কিনুলি ভালো হয়ে উঠছে সে তার দৌড়ে আসা সঙ্গীদের দিকে ফিরে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো:

'কিনুলি ভালো হয়ে উঠছে!'

শেষবার তারা যখন কিনুলিকে দেখেছিল তখন সে ছিল অসুস্থ। তাদের এমন দুর্ভাবনা হয়েছিল যে তাদের পরীক্ষার আগে তারা দেখতে এসেছিল কিনুলিকে।

এমন অনেক লোক ছিল যারা আমাকে নিয়েও দুর্ভাবনা করতো। যদি

কোনো কারণে আমি কিনুলির ঘেরা জায়গাটাতে না থাকতাম তাহলে তারা পরিচারককে প্রশ্ন করতো আমার কী হয়েছে। তারা জানতে চাইতো কিনুলিকে আমি ভয় পাই কিনা, সে আমাকে মেরে ফেলতে পারে কিনা। আমি তাদের বলতাম যদি ও কাজ সে করে তাহলে পরে মনের দুঃখে সে নিজেই যাবে মরে।

কারণ এখন যদিও কিনুলি খাঁচায় থাকে তবুও আমার প্রতি তার ব্যবহারটা একেবারেই বদলায় নি। আগেকার মতোই সে ছিল স্নেহশীল আর পোষ-মানা। ঠিক আগেকার মতোই আমি বললেই সে শুয়ে পড়তো। দিতো তার লোমগুলোকে আঁচড়াতে আর বুরুশ করতে। আমি তার থাবা ধরে টানতাম, তাকে পাশ ফিরিয়ে দিতাম এবং এমন কি টানতাম তার ল্যাজ ধরেও। কিনুলি এ সবকিছু সহ্য করতো — তার খাঁচায় আমি আরো অল্প কিছুক্ষণ থাকার জন্যে সে সবকিছু করতো! মাঝে মাঝে সে দুষ্টুমি করলে আমি চলে যাবার ভাণ করতাম। কিনুলি তখন আমার পিছন পিছন ছুটে এসে থাবা দিয়ে ধরে আমাকে যেতে দিতো না। তার নখগুলো ছিল লম্বা আর তীক্ষ্ন, কিন্তু সেগুলো দিয়ে কখনো আমাকে লাগিয়ে দেয় নি। আমার আঙুলের ভিতর থেকে সে সাবধানে মাংসের টুকরোগুলো নিতো, আর আমি যখন চলে যেতাম সে বহুক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকতো আমার দিকে, এবং অবশেষে তার মাথাটা তুলে সত্যিকারের সিংহের হুঙ্কার ছাড়তো।

গ্রীষ্ম শেষ হলো, এলো শীতকাল। কিনুলি আর পেরিকে নিয়ে যাওয়া হলো শীতের বাড়ীতে। কিনুলি এখন পূর্ণবয়স্কা সিংহী, অন্যান্য সিংহদের খাঁচার পাশে তাকে রাখা হলো। তার খাঁচার সামনে সর্বদাই থাকতো কৌতূহলী দর্শক। ওরকম বড় সিংহীকে একটা কুকুরের সঙ্গে থাকতে দেখে সবাই বিস্মিত হতো। কিনুলি আর পেরি ছিল দারুণ বন্ধু। কিনুলিকে যখন মাংস দেওয়া হতো সর্বদাই সে খানিকটা রেখে দিতো পেরির জন্যে। আর কুকুরটা যখন খেতো তখন সিংহী তাকে দিতো পাহারা। পেরির যতক্ষণ না পেটভরে খাওয়া হয় ততক্ষণ সে পরিচারককে জায়গা পরিষ্কার করতে দিতো না।

একবার পেরি অসুখে পড়লো। পেরি বুড়ো হয়ে পড়েছিল। কিছু দিন ধরে তার পায়ে ব্যথা হচ্ছিল। এখন সে উঠতে পারে না। কিনুলি দারুণ ঘাবড়ে

গিয়েছিল। পেরি ওঠে না কেন? কেন সে তার মাংসটা খায় না? কিন্‌লি তার নিজের ভাগের মাংস কুকুরটার কাছে নিয়ে যেতো, মিউ মিউ করতে করতে চেষ্টা করতো তাকে তার থাবা দিয়ে তুলতে। কিন্তু পেরি উঠতো না। তখন এক ডাক্তারকে ডাকা হলো। ডাক্তার পেরিকে পরীক্ষা করতে চাইলেন, কুকুরটাকে খাঁচা থেকে বার করা দরকার, কিন্তু কিন্‌লি তার বন্ধুকে ছাড়তে চাইলো না — যখনই কেউ পেরিকে নিতে আসতো তখনই হিংস্র সিংহীর মতো হুঙ্কার ছেড়ে সে শিকগুলোর উপর লাফিয়ে পড়তো। বহু চেষ্টার পর তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে অন্য একটা খাঁচায় নিয়ে যাওয়া হয়, শুধু তারপর সম্ভব হলো পেরিকে বাইরে আনা।

কিন্‌লি যখন দেখলো যে ওরা পেরিকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে সে শিকগুলোর উপর মাথা ঠুকতে শুরু করলো, চেষ্টা করলো খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে। সেদিন, তার পরের দিন সে কিছুই খেলো না। সে বিষণ্ণ, অবসন্ন এবং বদমেজাজী হয়ে উঠলো। কাউকে সে তার কাছে আসতে দিলো না। প্রায়ই সে হুঙ্কার ছাড়তে লাগলো, তাতে চিড়িয়াখানার অন্যান্য জন্তুরা পেতো দারুণ ভয়।

পেরিও তার হুঙ্কার শুনতো। চিড়িয়াখানার অন্যান্য সিংহদের স্বরের মধ্যে কিন্‌লির হুঙ্কার সে চিনতো। সে তার ছুঁচলো কানগুলো খাড়া করে মৃদু করুণ সুরে ডাকতে শুরু করতো।

দু'মাস কেটে গেল। পেরি সুস্থ ও সবল হয়ে উঠলো। আবার সে তার পায়ে বেশ দৃঢ়ভাবে পারে দাঁড়াতে। সময় হলো তাকে কিন্‌লির খাঁচায় ফিরিয়ে আনার। বহুদূর থেকে পেরিকে আসতে কিন্‌লি দেখলো। সে কানদুটো খাড়া করে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। আবার দু'জনে একত্র হয়ে তারা কী খুসিই না হলো! মিউ মিউ করতে করতে কিন্‌লি পেরির কাছে ছুটে গেল। আর তার মাথাটা পেরির গায়ে এতো জোরে লাগলো ঘষতে যে আমাদের মনে হলো কিন্‌লি বুঝি তাকে থেঁতো করে ফেলবে। কুকুরটাও তার দুর্বল পা আর বয়েসের কথা ভুলে কুকুরছানার মতো সিংহীটার চারিপাশে লাগলো দৌড়ে বেড়াতে।

সেদিন কিন্‌লি আর পেরি ভালো করে খেলো। পরস্পরের গায়ে গা লাগিয়ে ঘুমলো সারা রাত। কিন্‌লির বিষণ্ণ হুঙ্কার আর শোনা গেল না।

বিচ্ছেদ

এলো ১৯৪১-এর জুন। যুদ্ধ শুরু হলো।

চিড়িয়াখানাটা এমন বদলে গেল যে চেনাই যায় না। চিড়িয়াখানার মসৃণ পথগুলোকে ট্রেঞ্চগুলো ক্ষত-বিক্ষত করে ফেললো। যেসব বোর্ডে নানা জন্তুদের খাঁচায় যাবার পথের কথা লেখা থাকতো সেগুলোতে এখন কালো কালো অক্ষরে এই ছোট্ট তিনটি কথা লেখা আছে: ‘বোমা থেকে আশ্রয়’। সহরের মধ্যে বিপদসূচক সঙ্কেত ধ্বনি শোনা যায়, শত্রু বিমানের আগমনের কথা জানিয়ে করে দেওয়া হয় সাবধান। খাঁচার মধ্যে ছুটোছুটি করতে করতে আতঙ্কিত চিৎকার ক'রে জন্তুরা ভয় পেয়ে সাইরেনের বিলাপ শোনে। সবচেয়ে বেশী ভয় পেয়েছিল সিংহরা। তাদের তীব্র গর্জনের সঙ্গে মিশে যেতো মস্কোর উপর আসা শত্রুর প্রথম উড়োজাহাজগুলোর গুনগুনানি।

প্রথম বোমাবর্ষণের সেই স্মরণীয় রাত্রে আমরা কেউ বাড়ী যাই নি। আমরা সবাই জন্তুদের উপর লক্ষ্য রেখেছিলাম। এবং যে কয়েকটি ঘরে আগুন লেগেছিল সেগুলোকে নিভিয়েছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে সেগুলো জন্তুদের ঘর নয়, জন্তুদের বাড়ী হলে হিংস্র জন্তুরা ছাড়া পেয়ে প্রচুর ক্ষতি করতে পারতো। স্পষ্টই বোঝা গেল সব বিপজ্জনক জন্তুদের তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরিত করা দরকার।

স্থির হলো, সিংহদের মধ্যে থেকে শুধু কিনুলিকে রাখা হবে সবচেয়ে পোষ-মানা আর সবচেয়ে কম বিপজ্জনক জন্তু হিসেবে। সে খাঁচা থেকে বেরুলেও কাউকে স্পর্শ করবে না।

দুঃসময় সত্ত্বেও মস্কোর ছেলেমেয়েরা কিনুলিকে ভুললো না। বোমা পড়ার সময় কোথায় সে থাকে সে সম্বন্ধে তারা প্রশ্ন করতো আর উপদেশ দিতো তাকে ভূগর্ভ রেল ষ্টেশনে নিয়ে যেতে। জন্তুদের অন্যান্য চিড়িয়াখানায় পাঠানো হলো, তাদের কিছুটা স্ভের্দলভ্স্কে। শরৎকালে কিনুলির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি গেলাম স্ভের্দলভ্স্কে। সেখানে আমি চিড়িয়াখানায় কাজ করতে লাগলাম। আমার সমস্ত অবসর সময় আমি কাটাতাম হাসপাতালে, আহতদের করতাম

শুশ্রূষা। অল্পদিনের মধ্যেই তারা আবিষ্কার করলো যে আমি চিড়িয়াখানায় কাজ করি।

রোগীদের মধ্যে কয়েকজন এমন কি কিনুলির কথাও শুনেছিল। তারা আমাকে অনুরোধ করতো তার গল্প বলতে। যে মুহূর্তে আমি অন্যকিছু করতে শুরু করতাম আমাকে অনুরোধ করা হতো: 'দিদি, সিংহীটার কথা আরো কিছু আমাদের বলুন।' অন্যান্য ওয়ার্ড থেকেও আহতরা আসতো তার কথা জিজ্ঞেস করতে। এজন্যে মাঝে মাঝে তর্কও বেধে যেতো।

'তোমাদের তো নিজেদের নার্সরা রয়েছে, তারা তোমাদের গল্প বলুক, আমাদের নার্সকে ছেড়ে দাও!' — আমার ওয়ার্ডের আহত লোকরা বলতো।

এমন কি যারা মারাত্মকভাবে আহত তারাও কিনুলির প্রতি কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। তারা প্রশ্ন করতো কোথায় কিনুলি, কেমন সে আছে।

মস্কোর প্রতিটি চিঠিতে আমি কিনুলির খবর পেতাম। ওরা আমায় লিখতো কিনুলি সম্পূর্ণ ভালো আছে। আর যদিও চিড়িয়াখানায় খুব কম দর্শকই আসে তবু সর্বদাই কেউ না কেউ তার খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আমি শুনলাম পেরি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এবং পরে শুনলাম সে মারা গেছে। কিনুলি এখন একা।

মিলন

আঠারো মাস পরে আবার আমি মস্কোয় এসে তাড়াতাড়ি গেলাম চিড়িয়াখানায়...ঐতো কিনুলির ঘরটা। খাঁচার এক কোণে শুয়ে সে মাংস খাচ্ছিল। কয়েকজন দর্শক তাকে দেখছে।

আমি খাঁচার কাছে গিয়ে তাদের দলে যোগ দিলাম। আমার পাশের একটি লোক আমাকে বলতে শুরু করলো কিনুলির কথা — কীভাবে সে একটা ফ্ল্যাটে পালিত হয়েছে, কীভাবে সে একটা চোরকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল আলমারির মাথায়, এবং তার জীবনের আরো নানা ঘটনা। কিন্তু আমি খুব মন দিয়ে শুনছিলাম না। আমি কিনুলির খুব কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু তাকে ডাকতে আমার সাহস হচ্ছিল না। সে আমায় চিনতে পারবে না বলে যে আমি ভয়

পাচ্ছিলাম তা নয়। না, একেবারেই তা হয়! সেটা ঈর্ষান্বিত সংশয় ছাড়া আর কিছু নয়: ধরো সে যদি তার মাংসটা ছাড়তে না চায়, ধরো সঙ্গে সঙ্গে সে যদি না আসে আমার কাছে, আগের মতো স্নেহ আর যদি না দেখায়?
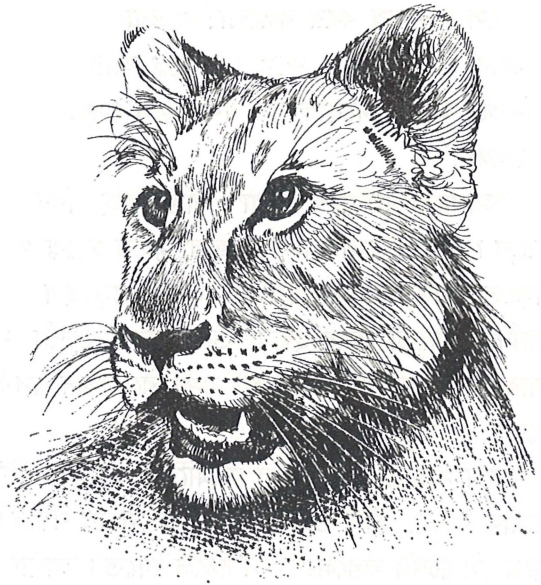
আমি খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে এই বিরাট হলদে সিংহীটার দিকে তাকিয়ে রইলাম, তাকিয়ে রইলাম তার নাকের কাছে সেই দুটি পরিচিত বিন্দুর দিকে আর ফিস ফিস করে ডাকলাম কিনুলিকে। কিনুলি সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বর শুনতে পেলো। সে খাওয়া বন্ধ করে কান খাড়া করে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর সে দাঁড়িয়ে উঠে আমার দিকে দ্বিধান্বিতভাবে কয়েক পা এগিয়ে এসে থেমে গেল।

তখন আর আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না:

'কিনুলি! কিনুলি! পুষ, পুষ!'

কথাগুলো বলতে না বলতেই এবং আমার হাতগুলো খাঁচার শিকের ভিতর ঢোকাতে না ঢোকাতেই কিনুলি আমার দিকে ছুটে এলো। এতো জোরে শিকগুলোর সঙ্গে সে ধাক্কা খেলো যে তার নাক আর ঠোঁট থেকে রক্ত পড়লো গড়িয়ে। কিন্তু যন্ত্রণাটাকে সে লক্ষ্যই করলো না, সস্নেহে আমার হাতে গা ঘষতে লাগলো। এক ঘণ্টার উপর আমি কিনুলির কাছে ছিলাম। কিন্তু আমি যখন যাবার উপক্রম করছি তখন সিংহ ঘরের একজন পরিচারক আপিসে আমাকে ধরে ফেললো।

সে অনুনয় করে বললো: ‘ভেরা ভাসিলিয়েভনা, কিনুলির কাছে যান। সে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছে আর ক্রমাগত চিৎকার করছে। আমি তাকে খানিকটা মাংস দিয়েছিলাম, কিন্তু সে সেটা ছোঁয় নি। বারবার সে দরজার দিকে তাকাচ্ছে।’

আমাকে ফিরতে হলো। বাস্তবিকই কিনুলি খাচ্ছিল না। খাঁচার মধ্যে সে দারুণ জোরে ছুটোছুটি করছিল, মাঝে মাঝে পড়ছিল থেমে, আর করুণ হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে শিকগুলোর উপর পড়ছিল লাফিয়ে। দর্শকরা তার খাঁচার চারদিকে জড়ো হয়েছিল। তারা সবাই চেষ্টা করছিল তাকে শান্ত করতে। যে লোকটি আমাকে কিনুলির কথা বলেছিল সে-ই চেষ্টা করছিল সবচেয়ে বেশী করে।

যে মুহূর্তে কিনুলি আমাকে দেখলো সেই মুহূর্তে সে প্রথমে ছুটে এলো আমার কাছে, আর তারপর গেল মাংসটার কাছে। মাংসটাকে তুলে শিকের ভিতর দিয়ে সে চেষ্টা করলো সেটা ঠেলে দিতে। আমার ইচ্ছে করছিল খাঁচার মধ্যে গিয়ে তাকে আদর করি, কিন্তু তা করা নিষিদ্ধ ছিল।

কিনুলির খাঁচার মধ্যে যাবার অনুমতি পেলাম কয়েক দিন পরে, যাতে সবরকম সাবধানতা মান্য করা হয় এই সর্তে। খুব সকালে কিনুলিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো বাইরের খাঁচাটায়। খোঁচা দেবার লোহা, রড, দড়ির ফাঁস রাখা হলো প্রস্তুত করে। আর একটা বিরাট রবারের নল এনে সেটাকে জুড়ে দেওয়া হলো জলের পাইপের সঙ্গে।

এক কথায় নির্দিষ্ট সময় যখন আমি পৌঁছুলাম তখন সবরকম তোড়জোড় শেষ হয়েছে। কিনুলি তার খাঁচায় ভয় পেয়ে হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে করে চলেছে দারুণ ছুটোছুটি। আমাকে দেখতে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে অনেকক্ষণ ধরে আদরের মৃদু ডাক ডাকলো। আর আমি খাঁচার দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে এলো আমার কাছে। কিনুলির স্নেহের অভিব্যক্তিটা এমন তীব্র ধরনের হয়েছিল যে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে আমাকে দারুণ বেগ পেতে হচ্ছিল।

এখন সবাই নিশ্চিত যে কিনুলি আমাকে কখনো ভুলবে না। এবং আমিই এতে নিশ্চিত ছিলাম সবার চেয়ে বেশী।

নেকড়ের পোষ্য

অপরের খাঁচায়

কোন এক খাঁচায় থাকতো একটি নেকড়ে, আর নেকড়েটির পাশের খাঁচায় — একটি আলসেশিয়ান কুকুর।

এই খাঁচাদুটো লোহার শিক দিয়ে আলাদা। দুটো জন্তুরই বাচ্চা হবার কথা। প্রায় একইসঙ্গে তাদের বাচ্চা হলো। দুই মা-ই তাদের ছেলেপিলেদের সযত্নে দেখাশোনা করছিল, এমন সময় হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে। সে কথাই আমি এখন বলবো।

একদিন যখন কুকুরটা তৃপ্তির সঙ্গে একটা হাড় চিবুচ্ছিল, তার একটা বাচ্চা, সবচেয়ে ছোট আর ছটফটেটা, খানিকটা দূর দিয়ে হামা টেনে গেল চলে। হামা টানতে টানতে সে খাঁচাদুটোর মাঝখানকার শিকগুলোর কাছে পড়লো এসে, সে জায়গাটার শিকগুলো একটু বাঁকা ছিল। এই ছোট্ট ফাঁকটাই কুকুরছানাটার পক্ষে নেকড়ের খাঁচায় গলে যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

পরিচারক তা দেখে চেষ্টা করলো কুকুরছানাটাকে ধরতে। যেটা দিয়ে খাঁচাগুলো পরিষ্কার করা হয় সেই ধাতুর রডটাকে শিকগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে ছানাটাকে আনতে লাগলো নিজের দিকে টেনে। সমস্তক্ষণ নেকড়ে-মা এই দুঃসাহসিক অপরিচিত জীবটির দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। কয়েক বার মনে হলো সে বুঝি তার দিকে ছুটে আসবে, কিন্তু প্রতিবারই রডটার ভয়ে সে আত্মসংবরণ করলো।

কুকুরছানাটা খাঁচার খুব কাছে এসে পড়লে নেকড়ে অকস্মাৎ এক লাফে সেটাকে ধরলো দাঁতে করে। পরিচারক ভয় পেয়ে উঠলো। সে ভাবলো নেকড়েটা কুকুরছানাটাকে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলবে। নেকড়েটা যাতে সেটাকে ছেড়ে দেয় তার জন্যে সে চিৎকার করতে আর মুগুরটাকে ঠুকতে লাগলো। কিন্তু নেকড়েটা কুকুরছানাটাকে ছাড়লো না। সেটাকে সে খাঁচার এক কোণে নিয়ে গিয়ে তার ছানাগুলোর সঙ্গে যত্ন করে রাখলো।

এইভাবে কুকুরছানাটা থাকতে শুরু করলো নেকড়েছানার সঙ্গে।

সেটা ছিল একটা ছটফটে কালো জীব। একই স্তন্যে লালিত-পালিত তার অন্যান্য ভাই-বোনদের সঙ্গে তার চেহারাটার ছিল দারুণ তফাৎ। যদিও সে তাদের চেয়ে খুব বেশী ছোট ছিল তবুও সে খুব চটপট বড় হয়ে উঠতে লাগলো।

তার পালিতা মা'র স্তনের বোঁটায় সে-ই পৌঁছুতো সবচেয়ে আগে। সে-ই প্রথম নিজেকে খাড়া করেছিল তার দুর্বল পায়ে। সে-ই প্রথম খেতে শুরু করেছিল মাংস।

নেকড়েছানাগুলো যখন বড় হয়ে খেলতে শুরু করলো এটাকেই তাদের সবাইকার মধ্যে সবচেয়ে চালাক আর প্রাণবন্ত বলে দেখা গেল।

সে সম্পূর্ণ বুনো স্বভাবের হয়ে উঠলো। পরিচারক যখন ভেতরে আসতো তখন সে অন্য নেকড়েছানাগুলোর মতো খাঁচার এক কোণে পালাতো, আর কেউ তার দিকে হাত বাড়ালে নিঃশব্দে তার শিকারী দাঁতগুলো বার করতো।

উপযুক্ত নাম

নেকড়েছানাগুলোর বয়েস তখন আড়াই মাস। তারা আর প্রায় তাদের মায়ের দুধ খায় না, কারণ তারা স্বচ্ছন্দে মাংস খেতে পারে। অল্পদিনের মধ্যেই তাদের

বাচ্চা জন্তুদের ঘেরা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে ছিল শেয়ালছানা, ভালুকছানা, দুটো ছাগলছানা, কতকগুলো ডিঙ্গো আর উস্সুরীয় র‍্যাক্কুন। কুকুরছানাটাও নেকড়েছানাগুলোর সঙ্গে সেখানে গেল।

পরিচারিকা নেকড়েছানাগুলোকে ঝুড়ি থেকে বার করার সময় ভালো করে দেখলো। প্রত্যেকটিকে দিলো এক একটা নাম। তাদের সব বিশেষত্ব চিহ্নগুলো একটা নোটবইয়ে টুকে নেবার পর নেকড়েছানাগুলোকে ঘেরা এলাকাটার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হলো। পরিচারিকার হাত থেকে ছানাগুলো দুলতে লাগলো — তাদের মাথাগুলো ভারি ভারি আর উদাস, তাদের মুখগুলো আধখোলা, তাদের ল্যাজগুলো পায়ের মধ্যে গোটানো। মুক্তি পাবার পর তারা মাটিতে খানিকক্ষণ মরার মতো শুয়ে রইলো। তারপর টলতে টলতে চলে গেল একটা নির্জন কোণে।

কুকুরছানাটার ব্যবহারটা ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকমের। পরিচারিকা যখন তাকে তুললো তখন সে তীক্ষ্ন সুরে ঘেউ ঘেউ ক'রে, হাতের মধ্যে খলবল ক'রে, তার হাতটা কট করে কামড়ে দিলো। এতে সে এতো অবাক হয়ে গিয়েছিল যে তাকে সে ফেলে দিলো হাত থেকে। ছানাটাকে সে আবার তুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওটা ঘেরা জায়গাটার ভিতর দিয়ে দৌড়ে পালালো।

পরিচারিকা কুকুরছানাটার দিকে তাকিয়ে হাত থেকে রক্ত মুছে, তার নোটবইয়ে 'নাম' এই শিরোনামার তলায় লিখলো: কুস্কা।* নামটা কুকুরছানাটাকে খুব মানালো। প্রথম প্রথম পরিচারকরা এই ক্ষুদে হিংস্র জন্তুটাকে পোষ মানাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কুস্কা একগুঁয়ের মতো মানুষের সঙ্গ এড়িয়ে চলতো, আর কেউ তার পিঠ চাপড়াতে গেলে রেগে উঠে দিতো কামড়ে। তাই কেউ আর তাকে ঘাঁটাতো না।

অন্য জন্তুদের সঙ্গে খেলাধুলার সময় কুস্কা দিন দিন সবার চেয়ে বেশী তৎপরতা আর উদ্ভাবন শক্তি দেখাতে লাগলো।

পুরো বেগে দৌড়োতে দৌড়োতে সে ঘুরে তার পশ্চাদ্ধাবনকারীর উপর পারতো লাফিয়ে পড়তে, কিম্বা মাঝারি বড় ভালুকছানার জোরালো আলিঙ্গন

---

* 'কুসাৎ' ক্রিয়াপদ থেকে — কামড়ানো। — অনুঃ

থেকে পারতো কিলবিল করে বেরিয়ে আসতে। চারিধার থেকে তার উপর সে পড়তো লাফিয়ে, ফলে ভালুকটার মাথা ঘুরে উঠতো আর সেটাকে পালাতে হতো একটা গাছের উপর। কুস্‌কার খেলাটা প্রায়ই পরিণত হতো আসল শিকারে। মাঝে মাঝে অন্যান্য জন্তুদের সে এমন হিংস্রভাবে তাড়া করতো যে পরিচারককে দিতে হতো বাধা।

পরিচারকরা কুস্‌কাকে ভালোবাসতো না — তার দরুন মুহূর্তের জন্যেও তারা ঘেরা জায়গাটা ছেড়ে যেতে সাহস করতো না। সব সময় তাদের নজর রাখতে হতো সে অন্য কাউকে যেন আহত না করে। ছাগলছানাগুলোকে ঐ ঘেরা জায়গাটা থেকে সরাতে হয়েছিল, কারণ আর একটু হলেই কুস্‌কা তাদের মেরে ফেলতো। এই বিরক্তিকর কুকুরটাকে তিন মাস সহ্য করা হয়েছিল, কিন্তু শরৎকালে সে যখন দুটো শেয়ালছানাকে মেরে ফেললো এবং একটা ভালুকছানাকে সাঙ্ঘাতিকভাবে জখম করলো, স্থির করা হলো তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

এইসব সত্ত্বেও কুস্‌কাকে আমি ভালোবাসতাম। সে দেখতে বিশেষ সুন্দর ছিল না, কিন্তু তার প্রাণশক্তি ও তৎপরতা আমার ভালো লাগতো। তার রঙটা ছিল ভারি অদ্ভুত — শরীরটা কালো, থাবা আর গালগুলো কমলা রঙের। এর ফলে তার মুখটা হয়েছিল খুব অভিব্যক্তিপূর্ণ, রাগ থেকে আনন্দে সেটা খুব তাড়াতাড়ি যেতো বদলে। হাসবার সময় মুখটা সে এমন হাঁ করতো যে তার কমলা রঙের গালগুলো পৌঁছুতো প্রায় তার কান পর্যন্ত, আর তার চোখগুলো তেরচা হয়ে গিয়ে আনন্দে করতো জ্বলজ্বল। তার অদম্য জীবনী শক্তির জন্যে তাকে আমি ভালোবাসতাম।

তাই যখন শুনলাম কুস্‌কাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, আমি তাকে চাইলাম। একথা আমি বলতে পারি না যে আমার পরিবারের সবাই এতে খুব খুসি হয়েছিল। কুস্‌কা সম্বন্ধে তারা অনেককিছু শুনেছিল, তাই তারা তাকে নিজেদের বাড়ীর মধ্যে পেতে খুব একটা চায় নি।

আমি যখন কুস্‌কাকে নিতে গেলাম তখন সে ঘেরা জায়গাটার মধ্যে দৌড়ে বেড়াচ্ছিল। সেখানে তাকে ধরতে যাওয়া খুব কঠিন বলে স্থির করা হয়েছিল তাকে ভুলিয়ে খাঁচার মধ্যে ঢোকানো হবে। খাঁচাটার দরজাটা খুলে আমরা

একটুকরো মাংস তার ভেতর ছুঁড়ে দিলাম। কোনো রকম সন্দেহ না করে কুস্‌কা সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে গেল। তার পিছন পিছন গিয়ে আমি তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। একজন অপরিচিতকে অত কাছে দেখে কুস্‌কা দারুণ ভয়ে খাঁচার মধ্যে জোরে দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াতে লাগলো, তারপর হঠাৎ তার ব্যবহারটা গেল বদলে। সে তার লোমগুলো খাড়া খাড়া করে, নিজেকে গুটিয়ে, ধীরে ধীরে একটা কোণে চলে গেল দাঁতগুলো বার করে। প্রথমে আমি ভাবলাম তাকে স্নেহ দেখালে কী ফল হয় দেখবো, কিন্তু আমার প্রথম প্রচেষ্টায় তার চোখগুলো এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো যে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সে কল্পনাটা ত্যাগ করতে হলো। তারপর আমি একটা চামড়ার ফিতে নিয়ে চেষ্টা করলাম ফাঁসটা তার গলায় পরাতে। একেবারে প্রথম বারেই আমি সেটা পারলাম, কিন্তু সেটাকে সময়মতো আঁট করতে পারলাম না। তার ভিতর থেকে খুব বুদ্ধিমানের মতো এঁকেবেঁকে কুস্‌কা বেরিয়ে আমার দিকে ছুটে এলো। সে বারবার আমাকে আক্রমণ করলো, নেকড়ের মতো নিঃশব্দে দাঁতগুলো কিড়মিড় করতে লাগলো আর একগুঁয়ে রাগে চেষ্টা করতে লাগলো আমার মুখের কাছে পৌঁছতে। কিন্তু অবশেষে আমি ফাঁসটা তার গলায় পরালাম। ফিতেটা যখন সে তার গলার চারিধারে অনুভব করলো তখন কুস্‌কা কী দারুণ চটে উঠেছিল! মুক্তি পাবার জন্যে সে পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগলো, যাকিছু সামনে পেলো সবকিছুকেই লাগলো কামড়াতে। তারপর অকস্মাৎ সে নিজের শরীরটাকে লাগলো কামড়াতে, পাঁজর আর থাবাটাকে সে আঁচড়াতে লাগলো, যেন কোনো শত্রুকে আঁচড়াচ্ছে। কুস্‌কার চকচকে কালো লোমগুলোয় রক্তের দাগ লেগে গেল, আর সে মাটির উপর গড়াতে লাগলো বারবার নিজেকে কামড়াতে কামড়াতে...

প্রাণপণ চেষ্টায় আমি তার ঘাড় ধরে মাটির সঙ্গে চেপে রাখলাম। তারপর আর একটা চামড়ার ফিতে তাড়াতাড়ি বার করে সেটা দিয়ে বেঁধে দিলাম তার মুখ আর থাবাগুলো। এখন সে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ে রইলো, তার চোখগুলো এমন ভয়ঙ্করভাবে জ্বলতে লাগলো যে আমি অনিচ্ছায় মুখ ফেরালাম। কিন্তু এসব সত্ত্বেও নেকড়ের সেই পালিত বাচ্চাকে আমার ভালো লেগেছিল।

চিড়িয়াখানার পশুবিজ্ঞানী আর আমি কুস্‌কাকে খাঁচার বাইরে এনে একটা মোটরগাড়ী করে তাকে নিয়ে চললাম। সে সময় আমি চিড়িয়াখানার 'নতুন এলাকায়' ছোট আলাদা একটি কুটীরে থাকতাম। কাছেই একটা বড় গাছের পাশে কুস্‌কার জন্যে আমি জায়গা করে দিলাম। একটা শক্ত চওড়া বকলেস তার গলায় লাগিয়ে সেটাকে আটকালাম এক লম্বা শেকলের সঙ্গে, আর তারপর তার মুখ আর থাবাগুলো খুলে সরে গেলাম।

কুস্‌কা খানিকক্ষণ স্থির হয়ে পড়ে থেকে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে সামনের দিকে এতো জোরে ছুটে গেল যে চেনে বাধা পেয়ে সে ছিটকে পড়লো পিছনে। আবার সে সামনে ছুটে গেল, চেষ্টা করলো সেটা ছিঁড়ে ফেলতে আর করুণ সুরে লাগলো কাঁদতে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে চুপিচুপি নিজের ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। সমস্ত দিন সেখানে রইলো, খাবার খেলো না। সমস্ত রাত তার টানাটানির আর করুণ কান্নার শব্দ আমরা শুনতে পেলাম। অনেকক্ষণ ধরে সে চেঁচাতে লাগলো নেকড়ের মতো। পরের দিন সকালে যখন আমি গেলাম, কুস্‌কা পালালো ঘরের মধ্যে। তার খাবার সে ছোঁয় নি, জমির উপর রক্তাক্ত গ্যাঁজলা দেখে বোঝা গেল যে সে তার চেনটা কামড়ে পালাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে।

হিংস্র জন্তু কুকুর হয়ে উঠলো

আমাদের সঙ্গে কুস্‌কার ভাব হতে অনেক দিন লাগলো।

দিনের পর দিন সে রইলো ঘরের মধ্যে, আর আমরা কেউ কাছে থাকলে সে তার খাবার ছুঁতো না। আমরা চলে যাবার পরেই সে শুধু খেতো। সন্দেহজনকভাবে চারিদিকে চাইতে চাইতে সে যেতো তার পাত্রটার দিকে, আর তার ভিতরকার খাবারটা খেয়ে ফিরে আসতো নিজের জায়গায়। রাত্রে সে নেকড়ের মতো গর্জন করতো, কুকুরের মতো কখনো ডাকতো না। আমি সবাইকে তার কাছে যেতে বারণ করে দিয়েছিলাম, পাছে সে তাদের

কামড়ায় — বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের। আমি জানতে খুব উৎসুক ছিলাম কখন নেকড়ের হাবভাবের ভিতর থেকে তার কুকুরের প্রকৃতিটা প্রকাশ পাবে। বহুকাল আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল, কিন্তু অবশেষে প্রকাশ পেয়েছিল তার কুকুরের প্রকৃতি। আমি চলে যাবার সময় যখন সে আর উদাস থাকতো না তখন থেকেই তার কুকুরের প্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছিল। যখন সে আমাকে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে দেখতো, সে কান খাড়া করে মুখটা বার করতো ঘর থেকে, আর অবশেষে আসতো বেরিয়ে, আর মন দিয়ে তাকিয়ে থাকতো আমার যাবার পথের দিকে। মাঝে মাঝে আমার বাড়ীর এক কোণের পিছনে আমি অল্পক্ষণের জন্যে লুকিয়ে থেকে হঠাৎ ফিরে আসতাম। কুস্‌কা অপ্রস্তুতভাবে তার ল্যাজটা গুটিয়ে ধীরে ধীরে ফিরে যেতো। কিন্তু কখনো সে আমার ছেলেমেয়ে তলিয়া আর লিউদার দিকে বিন্দুমাত্রও মনোযোগ দিতো না, এমন কি মনে হতো না তাদের সে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের থেকে আলাদা করে চেনে।

কিন্তু আসলে ব্যাপারটা ওরকম ছিল না। একবার প্রকাশ পেলো যে সে বাস্তবিকই তাদের চেনে।

কয়েকজন ছেলেমেয়ে আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। একজনের হাতে ছিল একটা বল, অন্যজন খেলার ছলে বলটা দিলো তার হাত থেকে ফেলে। বলটা মাটির উপর লাফাতে লাফাতে গড়িয়ে গেল কুস্‌কার ঘরে। ছেলেরা চেষ্টা করলো সেটা একটা লাঠি দিয়ে বার করতে, কিন্তু কুস্‌কা এমন রেগে লাঠিটা তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলো যে তাদের সে প্রচেষ্টা ত্যাগ করতে হলো। তারা আমাকে বললো বলটা এনে দিতে। এ কাজ আমি করতে পারতাম কুস্‌কাকে শেকল ধরে টেনে বার করে। কিন্তু আমাকে সে যে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল সেটা আমি ভাঙতে চাইলাম না। বলের জন্যে পরের দিন আসতে ছেলেদের আমি রাজি করালাম। তারপর আমি যখন চলে যাচ্ছি এমন সময় দেখতে পেলাম লিউদাকে। শিশুসুলভ সরলতা এবং নির্ভয়তার সঙ্গে সে বুক ফুলিয়ে গেল কুস্‌কার কাছে। আমি তাকে চেঁচিয়ে বারণ করে তার কাছে দৌড়ে যাবার উপক্রম করছিলাম, কিন্তু ততক্ষণে খুব দেরি হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যেই লিউদা বলটার ওপর ঝুঁকে পড়েছিল, পাঁচ বছরের শিশুর সরু গলাটা সেই হিংস্র কুকুরের মুখের

কাছে পড়েছিল নুয়ে। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম, নড়তে ভয় হলো। আমি জানতাম যে সামান্য শব্দ কিম্বা নড়াচড়া করলেই কুস্‌কা হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়বে লিউদার ওপর। লিউদা তার হাতটা বাড়ালো বলটার দিকে... কুস্‌কা একটু পাশে সরে গেল... লিউদা বলটা তুলে নিলো... সেটা নিয়ে এলো চলে... আমি তাকে টেনে কোলে তুলে নিলাম, বারবার তাকে চুমু খেতে লাগলাম। শিশুকে স্পর্শ না করার জন্যে আমি ভাবলাম কুস্‌কাকে ভালো কিছু একটা জিনিস দিতে হবে। দৌড়ে আমি বাড়ীর ভিতরে গিয়ে স্যুপ থেকে একটুকরো মাংস তুলে নিয়ে ধরলাম কুস্‌কার কাছে। কিন্তু একটা বিশেষ জায়গার পর সে আর আমাকে এগোতে দিলো না। সে দাঁত বার করে গর্জন করতে করতে আমাকে সাবধান করে দিলো... মাংসটা রেখে আমি চলে গেলাম।

সেদিন থেকে ছেলেমেয়েদের আমি আর বারণ করতাম না কুস্‌কার কাছে যেতে। তাদের শুধু বললাম খুব কাছে যেন তারা না যায়। তলিয়া আর লিউদা কিন্তু আমার কথা মানতো না। তারা আমার অনুমতির গণ্ডিটা খুব বাড়িয়ে নিয়েছিল। তাদের প্রিয় খেলবার জায়গাটা ছিল কুস্‌কার পাশেই। লিউদা বানাতো কাদার পিঠে, দুর্গ আর বাড়ী। স্পষ্টত দেখা যেতো কুস্‌কা এতে খুব কৌতূহল দেখায়। তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দূর থেকে বসে সে ছেলেমেয়েদের দেখতো।

কুস্‌কা এখন আমাদের পরিবারের সবাইকে চেনে। প্রতিদিন সে আমাকে একটু একটু করে কাছে আসতে দেয়। মাঝে মাঝে এমন কি সে আমার কাছে আসতে চেষ্টা করে, কিন্তু শেকলটা তাকে দেয় বাধা। তবে এখনো সে শেকলটার সামান্য টান কিম্বা নড়াচড়ায় ভয় পায়। এটা লক্ষ্য করে আমি স্থির করলাম কুস্‌কার চেনটা খুলে দেবো। প্রত্যেকেই আমাকে বাধা দিতে চেষ্টা করলো, আমাকে জোর করে বললো যে সে পালিয়ে যাবে। কিন্তু আমার মনে হলো সে পালাবে না। আমি একটা ধারালো ছুরি লাঠিতে আটকে সাবধানে তার বকলেসটা কেটে দিলাম। বকলেস আর চেনটা সশব্দে মাটিতে পড়লো।

কুস্‌কা মুক্তি পেলো। যেখানে খুসি সেখানে সে যেতে পারে। সে পারে একেবারে পালাতে, কিছুই তাকে বাধা দেবে না। কুস্‌কা কিন্তু পালালো না।

সেদিনও নয় কিম্বা তার পরের কয়েক দিনও নয়। কী যেন তাকে বেঁধে রেখেছিল, — এমন একটা জিনিস যেটা শেকলের চেয়েও শক্ত।

প্রতিদিন আমি যখন কাজে যেতাম সে আমার পিছন পিছন আসতো ফটক পর্যন্ত। প্রতি সন্ধ্যায় সে ছুটে আসতো আমার কাছে। সে তার ঘরে আর ঘুময় না। রাত কাটায় বারান্দার তলার একটা গভীর গর্তে। এই গর্তটা সে খুঁড়েছিল তার থাবা দিয়ে। এখন আর সে নেকড়ের মতো অত গর্জন করে না। একদিন তাকে আমরা শুনলাম কুকুরের মতো ডাকতে। সে ডেকেছিল রাতে। রাতে নির্জন চিড়িয়াখানার ভিতর সে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসতো। একদিন সে এক পাহারাওলার সামনে পড়েছিল। তার গোটানো ল্যাজ, টিকালো নাক, খাড়া কান আর সমস্ত চেহারাটা দেখাচ্ছিল ঠিক একটা নেকড়ের মতো। আর ঠিক নেকড়ের মতোই সে মানুষের দেখা পেয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিলো। পাহারাওলা তাকে ভেবেছিল খাঁচা থেকে পালানো একটা হিংস্র জন্তু। তাই সে তার অনুসরণ করলো।

কুস্‌কা ভীরুভাবে তার কাছ থেকে পালিয়ে আমাদের বাড়ী পর্যন্ত এলো। জানালায় আলো দেখে পাহারাওলা এলো তার কাছে, আর তখন... তখন কুস্‌কা ব্যবহার করলো নেকড়ের ঠিক উল্টো। চটপট ঘুরে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকটার উপর। তখনই আমরা প্রথম তার কুকুরের মতো ডাকটা শুনেছিলাম — তীক্ষ্ন ভাঙা ভাঙা শব্দ, দাঁতের কটকট আওয়াজের মধ্যে বাধা পাওয়া। প্রথমে আমি আমার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না, কিন্তু তারপর যখন সাহায্যের জন্যে চিৎকারের সঙ্গে কুকুরের ডাক শোনা গেল আমি দৌড়ে বাড়ী থেকে বেরুলাম।

বেচারা পাহারাওলা! কুস্‌কাকে সে কিছুতেই তাড়াতে পারছিল না। কুস্‌কা ক্রমাগত তার চারিদিকে লাফাচ্ছিল, চেষ্টা করছিল তার গোড়ালিটা কামড়াতে।

তাকে তাড়াতে গিয়ে বিপদ হতে পারে বলে আমার মনে হলো। তাকে কিন্তু তাড়ানো গেল খুব সহজেই। যে মুহূর্তে আমি তার নাম ধরে ডাকলাম সে সেই লোকটিকে আক্রমণ করা থামালো, কথা শুনে তার কাছ থেকে সরে গিয়ে তাকে যেতে দিলো।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও কুস্‌কা খুব কৌতূহল দেখাতো। যদি আমরা কখনো দরজাটা খুলে রাখতাম সে এসে দরজার সামনে বসে আমাদের চলাফেরা চোখ দিয়ে অনুসরণ করতো। রাত্রে যখন দরজাটা বন্ধ করা হতো তখন প্রায়ই সে তার সামনের থাবা জানালার কার্ণিশের উপর রেখে আলোকিত ঘরের মধ্যেটা দেখতো।

কুস্‌কা কিন্তু বহুদিন তার পিঠ চাপড়াতে দেয় নি। কয়েক দিন আমি বাড়ীতে ছিলাম না, ফিরে আসার পর সে তার পিঠ চাপড়াতে দিয়েছিল। আমার অনুপস্থিতি কুস্‌কা কীভাবে গ্রহণ করে দেখার জন্যে ইচ্ছে করেই আমি অন্য জায়গায় ছিলাম। তলিয়া এসে আমায় জানালো কুস্‌কার সব হাবভাবের কথা। সে বললো সাধারণত আমি যখন কাজ থেকে ফিরি সেসময় সর্বদা কুস্‌কা চিড়িয়াখানার প্রবেশ পথে যেতো ছুটে, আর দরজার দিকে তাকিয়ে থাকতো অনেকক্ষণ ধরে, পথিকদের মধ্যে খুঁজতো আমাকে। তাকে মনমরা বলে মনে হতো। আর তার খিধেও ছিল না। আমি দিনের বেলায় ফিরে এলাম, কুস্‌কা তখন আমাকে আশা করে নি। বাড়ীর পাশে সে শুয়েছিল, কিন্তু আমাকে দেখতে পাওয়া মাত্র সে দৌড়ে আমার কাছে এলো। আমি হাত বাড়ালাম, কুস্‌কা সরে গেল না। তার নাকটা আমার হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইলো স্থির হয়ে, আর আনাড়ির মতো নাড়াতে লাগলো ল্যাজটা। তার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে আমি সাবধানে আমার হাতটা তার মাথায় রেখে তাকে চাপড়াতে লাগলাম। তার কালো মসৃণ মাথাটাকে প্রথমে ধীরে ধীরে এবং ক্রমশ সাহস করে জোরে জোরে আমি চাপড়াতে লাগলাম। তার মাথাটা ছোঁবার জন্যে বহুদিন ধরে আমার ইচ্ছে ছিল। আমি যখন তাকে ছুঁলাম তখন যেন সে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর আমার হাতের তলা থেকে সরে অবিকল কুকুরের মতো সে শুরু করলো আনন্দ প্রকাশ করতে। সে লাফাতে লাগলো আমার বুক পর্যন্ত, নাড়াতে লাগলো তার ল্যাজ, চাটলো আমার হাত আর মুখ। সন্দেহজনক হিংস্র জন্তু থেকে সে হয়ে উঠলো একটা কুকুর, মানুষের বিশ্বাসী বন্ধু।

কুস্‌কার চেয়ে প্রভুভক্ত কুকুরের কথা ভাবা কঠিন। সে যে খুব সাহসী ছিল সে কথা আমি বলতে পারি না। তখনো তার মধ্যে বুনো জন্তুর প্রচুর আড়ষ্টতা

আর সাবধানতা ছিল। কিন্তু যখনই তার মনে হতো ছেলেমেয়েরা কিম্বা আমি বিপদে পড়েছি তখনই সে আমাদের আগলাবার জন্যে বুক ফুলিয়ে আসতো ছুটে।

একদিন আমি গেলাম গুদাম ঘরে। সেটা ছিল 'নতুন এলাকায়', আমাদের বাড়ী থেকে খুব দূরে নয়। কুস্‌কা কিন্তু কখনো সেখানে যায় নি, কারণ যে বিরাট বিরাট চেহারার পাঁচটা কুকুর ওখানে পাহারা দিতো, তারা ছিল কুস্‌কার জন্মশত্রু। আমার সঙ্গে সঙ্গে সে এলো ফটক পর্যন্ত, তারপর অপেক্ষা করতে লাগলো বাইরে। কিন্তু আমি উঠনে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সেই কুকুরগুলো করলো আমাকে আক্রমণ। আমাকে বিপদে পড়তে দেখে কুস্‌কা অসম যুদ্ধের মধ্যে পড়লো ঝাঁপিয়ে। সেই পাঁচটা বিরাট বিরাট হিংস্র কুকুর মুহূর্তের মধ্যে তাকে ফেললো পেড়ে। দোমড়ানো মোচড়ানো আর্তনাদ-করা পিণ্ডের মধ্যে কোনোকিছু বোঝাই কঠিন। গুদামরক্ষীর সহায়তায় বহু কষ্টে আমি একটা কুকুরকে টেনে সরাতে পারলাম। কিন্তু বাকিদের আমরা কিছুই করতে পারলাম না। যতবারই তাদের টেনে সরানো হয় ততবারই তারা ছুটে কুস্‌কার দিকে। আমার মনে হলো তাকে তারা মেরে ফেলবে, কিন্তু কুস্‌কা লড়াই করলো ঠিক বুনো জন্তুর মতো।

চারিদিক থেকে কুকুরগুলো তাকে আক্রমণ করলো, কিন্তু সে ছিল তাদের সমকক্ষ।

লড়াই থেকে প্রথম পালালো একটা ছোট কুকুর, আরো দুটো তার পিছু নিলো। শুধু একটা কুকুর লড়াই করে চললো, তার নাম বারসুক। সেটা ছিল সবচেয়ে হিংস্র প্রকৃতির। তার গায়ে ছিল লড়াইয়ের ক্ষতচিহ্ন। বারসুকের চেয়ে কুস্‌কা আকারে আর বয়েসে অনেক ছোট। কিন্তু তার চেয়ে অত শক্তিশালী শত্রুর কাছেও আত্মসমর্পণ করার তার কোনো ইচ্ছে ছিল না। একটুও পালাবার চেষ্টা না করে বারসুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে তার মুখটা কামড়ে দিলো। বারসুক দারুণ রেগে উঠলো। যদি না ক্ষতবিক্ষত নাক থেকে রক্ত ঝরে পড়তো তাহলে নিশ্চয়ই সে কুস্‌কাকে ফেলতো মেরে। বারবার কুস্‌কার গলাটা ধরে তাকে সে মাটিতে ফেলতে লাগলো, কিন্তু প্রতিবারই নিজের রক্তে প্রায় দম বন্ধ হয়ে গিয়ে সে দিতে লাগলো তাকে ছেড়ে। কুস্‌কারও প্রায় দম বন্ধ হয়ে এসেছিল। পরিশ্রমের

দরুন সে টলছিল। তবুও বারবার তার কাছে গিয়ে সে কামড়াচ্ছিল তার মুখটা।

বারসুক ইতিপূর্বে লড়াইতে তার সমকক্ষের দেখা পায় নি। এই অদ্ভুত কুকুরের দৃঢ় সংকল্প দেখে ভয় পেয়ে পালালো। এই ধরনের কোনো কুকুরের দেখা আগে সে কখনো পায় নি। আর কুস্কা! কুস্কা বহু কষ্টে ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে পায়ের কাছে শুয়ে পড়লো। সারাটি গা ক্ষতবিক্ষত। আমি তাকে কোলে তুলে নেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে এতো জখম হয়েছিল যে সেটা সম্ভব হলো না। তাই আমি সাবধানে তাকে দাঁড়াতে সাহায্য করে আস্তে আস্তে ধরে ধরে বাড়ীতে নিয়ে গেলাম।

বহুদিন ধরে কুস্কা অসুস্থ ছিল। কিন্তু এই ঘটনার স্মৃতি আর একবার যখন দরকার হয়েছিল তখন তলিয়াকে রক্ষা করতে তাকে বাধা দেয় নি।

কুস্কার বয়েস যখন এক বছর হলো তখন সার্ভিস-ডগ-ক্লাবে তার নাম রেজিষ্টারি করা হয়। তখন সব আলসেশিয়ানদেরই নাম রেজিষ্টারি করতে হতো। কুস্কা যদিও একটা নেকড়ের পোষ্য ছিল তবুও সে ছিল জাতে আলসেশিয়ান। অতএব সেও উক্ত আইনের মধ্যে পড়েছিল।

কুস্কাকে পরীক্ষা করে দেখা গেল শিক্ষা পাবার সে উপযুক্ত নয়। তখনও তার মধ্যে বন্য জন্তুর প্রকৃতি প্রচুর রয়েছে। এইসব কথা একটা কার্ডে লেখা হলো। আমাকে দেওয়া হলো একটা কাগজ। তাতে লিখে দেওয়া হলো যে তার ছানাদের দাবি করা যেতে পারে, কিন্তু তাকে সৈন্যদলে যোগ দিতে হবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সার্টিফিকেটটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাই তারা যখন তাকে নিতে এলো তখন আমি প্রমাণ করতে পারলাম না যে কুস্কা শিক্ষালাভের ব্যাপারে একেবারেই কাজের নয় আর সে এমন কি বাঁধা অবস্থায় হাঁটতেও পারে না।

তারা সুনিশ্চিতভাবে বললো, ‘আমরা এর চেয়েও বেশী বেয়াড়া কুকুরকে শিখিয়ে পড়িয়েছি।’

আমি যখন তার বকলেসে একটা শক্ত চামড়ার ফিতে এঁটে দিলাম কুস্কা তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, কিন্তু যে মুহূর্তে তার অন্যদিকটা এক অপরিচিত

লোক ধরলো সে মুহূর্তেই তার মধ্যে দেখা গেল ভয়ের ভাব। আর যখন তারা চেষ্টা করলো তাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে তখন কুস্‌কা দেখালো সে কী ধাতুতে গড়া! প্রথমে যে লোকটি চামড়ার ফিতেটা ধরেছিল সে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর। কিন্তু এরা সবাই অভিজ্ঞ লোক, অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা তার বন্য স্বভাবকে দিলো দাবিয়ে। তখন কুস্‌কা চেষ্টা করলো চামড়ার ফিতেটা ছিঁড়ে পালাতে। একবার সে এদিক ওদিক লাফায়, আর একবার সে মাটিতে পড়ে আছড়ে। তাদের সঙ্গে যেতে সে একেবারে অস্বীকার করলো। তারা তাকে কোনো মতে টেনে রাস্তায় নিয়ে গেল, কিন্তু সেখানে পেঁছে কুস্‌কা শুরু করলো চিৎকার, চেষ্টা করলো চামড়ার ফিতেটা ছিঁড়ে পালাতে। একটা ভিড় জমে উঠলো। প্রত্যেকেই কুকুরটার প্রতি সমবেদনা দেখাতে লাগলো। সেই লোকেরা যখন আবার তাকে টেনে নিয়ে চললো কুস্‌কা অকস্মাৎ বকলেস থেকে এঁকেবেঁকে বেরিয়ে দৌড়ে চলে এলো বাড়ী।

যে লোকেরা তাকে নিতে এসেছিল স্বভাবতই তারা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলো। ঐ বিরাট এলাকার মধ্যে তাকে ধরা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু সেদিন সন্ধেতেই তাকে নিয়ে যাবার জন্যে তারা আবার এলো। এবার তাদের সঙ্গে ছিল একটা কুকুর। তাকে বিশেষ করে আনা হয়েছিল কুস্‌কাকে ধরতে সাহায্য করার জন্যে। কুস্‌কা তার ঘরের মধ্যে শুয়ে ছিল। তাদের মধ্যে একজন তাড়াতাড়ি ঘরটার দরজাটা দিলো বন্ধ করে এবং আর একজন একজোড়া পুরু দস্তানা পরে ঘরটার ঢাকাটা খুলে ফাঁকটার মধ্যে সাহসের সঙ্গে হাতটা দিলো ঢুকিয়ে। তার ধারণা কুকুরটা দস্তানাটা কামড়াতে পারবে না। ফাঁকটা ছিল খুব সামান্যই। কিন্তু কুস্‌কার কাছে সেটাই ছিল যথেষ্ট — হাজার হোক সে পালিত হয়েছে একটা নেকড়ের কাছে। খোলা ছাতটার উপর লোকটি ঝুঁকে পড়তে না পড়তেই ফাঁকটা দিয়ে কুস্‌কা লাফিয়ে বাইরে এসে সেই ছাতটাকে সজোরে থাবা মারলো। সেটা এমন জোরে লোকটির মুখের উপর পড়লো যে রক্ত গেল বেরিয়ে। সে সম্বিত ফিরে পাবার আগেই কুস্‌কা একটা বাঁকের ওপারে হলো অদৃশ্য।

তাদের কুকুরটা ছুটলো তার পিছন পিছন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সে এলো ফিরে। পলাতক কুকুরটা তার সর্বাঙ্গ কামড়ে দিয়েছে।

নিজেদের অকৃতকার্যতায় দারুণ চটে উঠে সেই লোকগুলি প্রতিজ্ঞা করলো যে কুস্‌কাকে না নিয়ে তারা ফিরবে না। এধরনের কুকুরের দেখা আগে তারা কখনো পায় নি। তারা প্রতিজ্ঞা করলো যেমন করেই হোক তারা তাকে টেক্কা দেবে। তারা নিজেদের কুকুরটাকে বেঁধে কুস্‌কার ঘরের সামনে একটা ফাঁস ঝুলিয়ে বাড়ীর পিছনে লুকিয়ে রইলো। তাদের বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। মাঝ রাত হয়ে গেল, তবুও তারা সেখানে বসে রয়েছে কুকুরটার অপেক্ষায়। আমি নিজে কুস্‌কাকে খোঁজার জন্যে কয়েক বার বাইরে এলাম, কিন্তু কোথাও তাকে দেখা গেল না। আমার ভয় হলো সে পালিয়েছে বলে। পরের দিন ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট আর অকৃতকার্যতায় বিরক্ত হয়ে সেই লোকগুলি চলে যাবার পর কুস্‌কা বাড়ীর তলা থেকে বেরিয়ে আরাম করে আড়মোড়া ভাঙলো। কুস্‌কা ছিল ঠিক সেই জায়গাটার পিছনে যেখানে লোকগুলি তার জন্যে ওৎ পেতে বসেছিল।

কিন্তু কয়েক দিন পরে সত্যি সত্যি তারা তাকে নিয়ে গেল। তাকে শেকল দিয়ে হলো বাঁধা। এবার সে আর পালাতে পারলো না। তারা তাকে বেঁধে একটা মোটরগাড়ী করে নিয়ে গেল। কুস্‌কার জন্যে আমাদের সবাইকারই মন কেমন করতে লাগলো, বিশেষ করে তলিয়া আর লিউদার। আমি যখন খোঁজ নিতে গেলাম কোথায় সে আছে আমাকে তারা বললো যে তারা তাকে কুকুরশালায় নিয়ে যেতে পারে নি। ট্রেনেতে সে তার চামড়ার ফিতেটা দাঁতে কেটে কামরা থেকে লাফিয়ে পালিয়ে গেছে। সে হারিয়ে যাওয়ায় তারা দুঃখিত হয়েছিল। আমাকে তারা বলেছিল যে সে যদি ফিরে আসে তাহলে তাকে তারা আর নিয়ে যাবে না।

আমি তখন তাকে খুঁজতে শুরু করলাম। যে স্টেশনের কাছে কুস্‌কা পালিয়েছিল সেখানে গিয়ে অধিবাসীদের কাছে আমি খোঁজ করলাম, কিন্তু একটা ছোট্ট কালো আলসেশিয়ানকে কেউ দেখে নি। কেউই তার কোনো খবর আমাকে দিতে পারলো না।

আমরা ভেবে নিলাম যে কুস্‌কা হারিয়ে গেছে, এমন সময় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সে ফিরে এলো রোগা, নোংরা চেহারা নিয়ে। তার বকলেসে

আটকে ছিল ছেঁড়াখোঁড়া চামড়ার ফিতের একটা অংশ। আমরা কখনো জানতে পারি নি কোথা থেকে সে এসেছিল, কত মাইল অতিক্রম করেছিল সে, আর কী করে খুঁজে পেয়েছিল বাড়ীটা। কেউই আর তাকে নিতে এলো না। কুস্‌কা আমাদের কাছে থেকে গেল। রাতের বেলায় সে দিতো পাহারা, আর দিনের বেলায় সে তার ঘরে শান্তভাবে ঘুমতো। এইভাবে নেকড়ের পোষ্য কুস্‌কা বেঁচে রইলো।

মালিশকা

চালাক

চিড়িয়াখানায় বহুকাল ধরে আমার কাজ ছিল সিংহ আর বাঘদের নিয়ে। কিন্তু একদিন আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো বাঁদরের খাঁচায় কাজ করতে।

আমি সেখানে একেবারেই থাকতে চাই নি। বাঁদরদের সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, আর তাদের আমার ভালোও লাগতো না। আমি একটা বাঁদরের খাঁচার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম; সেখানে তারা ছিল বেশ বড়সড় একটা দল — প্রায় চল্লিশটা, তারা ছুটোছুটি করছিল। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ভাবলাম: 'এদের আমি আলাদা আলাদা করে কী করে চিনতে পারবো? এদের চেহারা তো একই ধরনের। চোখ, ছোট ছোট মুখ আর হাতগুলো একই রকম — এমন কি মনে হয় আকারেও এরা সমান।' কিন্তু সে কথা ভেবেছিলাম শুধু গোড়ার দিকে। যখন তাদের দেখতে দেখতে আমার সয়ে গেল তখন আমি দেখতে পেলাম যদিও তারা সবাই একই জাতের, আসলে কিন্তু তারা এক রকমের নয়। ভোভ্‌কার মাথাটা এমন মসৃণ যে মনে হয় তার রোঁয়াগুলো বুঝি চিরুনি দিয়ে পিছনে আঁচড়ে দেওয়া হয়েছে, এদিকে বোব্‌রিকের সর্বাঙ্গের লোমগুলো খাড়া খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন একটা জুজুর মতো।

তাদের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত হলো মালিশকা। সে ছিল সবচেয়ে ছোট। তার মুখটা ছিল ছোট্ট আর ছুঁচালো। আর সে ছিল ভারি দুরন্ত ও ছটফটে। আমি যখন খাঁচার মধ্যে যেতাম সব বাঁদরগুলোই তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তো, কিন্তু মালিশকা শুধু সামান্য একটুখানি সরে যে চালুনী করে আমি তাদের জন্যে ফল নিয়ে আসতাম সেটার দিকে তাকিয়ে থাকতো।

আমি স্থির করলাম মালিশকাকে পোষ মানাবো। কিন্তু কাজটা খুব সহজ ছিল না।

বহুদিন ধরে ঐ বাচ্চা ভীতু জন্তুটা আমার কাছে আসতে সাহস করে নি।

আমি হাত বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই সে দৌড়ে পালাতো। কিন্তু ধৈর্য ধরে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাঁচার মধ্যে বসে থাকতাম আর প্রায়ই তার দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতাম নানা মুখরোচক টুকিটাকি খাবার।

ধীরে ধীরে আমাকে মালিশকার সয়ে এলো। আমি তার কাছে গেলে এখন আর সে ছুটে পালায় না। একবার আমি যখন অন্য একটা বাঁদরকে বিস্কুট দিচ্ছিলাম, সে তখন বাস্তবিক যথেষ্ট সাহস দেখিয়ে আমার হাত থেকে সেই বিস্কুটটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়েছিল। একবার সে এমন কি চেষ্টা করেছিল আমার পকেটের মধ্যে হাত ঢোকাতে, কিন্তু হাত বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন নিজের ধৃষ্টতায় চমকে উঠে সে ছুটে পালিয়েছিল। তখন থেকে আমি সর্বদাই আমার পকেটে মিষ্টি কোনো জিনিস রাখতাম। এমনভাবে রাখতাম যেন মালিশকা দেখতে পায়। আমি আবিষ্কার করলাম যে সে বাস্তবিকই মিষ্টি খুব ভালোবাসে।

যখন আমি পকেটে নাশপাতি কিম্বা এক ডেলা চিনি রাখতাম মালিশকা তার ছোট্ট মুখটা কুঁচকে করুণ সুরে চেচাঁতে চেচাঁতে আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকতো। অবশেষে সে মনস্থির করলো আমার পকেটে হাত দেবে বলে। ক্ষুদে চোরটা যাতে ভয় না পায় সেইজন্যে আমি মুখ ফিরিয়ে এমন ভাব করলাম যেন কিছুই লক্ষ্য করি নি। মালিশকা তাড়াতাড়ি আমার পকেট থেকে চিনির ডেলাটা তুলে নিয়ে দৌড়ে ছুটে পালিয়ে দূরে গিয়ে বসলো, যাতে তার কোনো বিপদ না হয়, আর তারপর তাকাতে লাগলো আড়চোখে।

এরপর থেকে তার ভীরুতা একেবারে অদৃশ্য হলো। আমি খাঁচায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে আমার কাঁধের উপর লাফিয়ে উঠে খুব ভালো করে খানাতল্লাস

করতো। তার ছোট ছোট রোগা হাতগুলো নিপুণভাবে আমার পকেটের মধ্যে যেতো চলে। চাবি, টাকাকড়ি, রুমাল — সবকিছুই মালিশকা আত্মসাৎ করতো। একবার সে এমন কি একটা আয়না চুরি করে সেটা নিয়ে খাঁচার ছাতে উঠেছিল সেটাকে পরীক্ষা করার জন্যে। সেটাকে সে ঘুরিয়ে দেখছিল, বুঝতে পারে নি কোথায় সেই অন্য বাঁদরটা গিয়েছে। নানাভাবে সে তার নিজের ছায়াকে ধরতে চেষ্টা করেছিল, এমন কি কাঁচটাকে সে কামড়াচ্ছিল। এতে আমি ভয় পেয়ে গেলাম: ছানাটা হয়তো কাঁচটাকে ভেঙে নিজেকে জখম করে ফেলবে। আমি তার কাছ থেকে আয়নাটা নিতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সেটা অত সহজ নয়! সেটা নিয়ে খাঁচাময় সে দৌড়োদৌড়ি করতে লাগলো, কিছুতেই দিতে চাইলো না। সাহায্যের জন্যে আমাকে পলিয়া মাসিকে ডাকতে হয়েছিল।

পলিয়া মাসি বহুকাল ধরে বাঁদরদের দেখাশোনা করেছেন। তারা তাঁর কথা শোনে। তিনি খাঁচার মধ্যে এসে ঝাঁটা নাড়িয়ে ছানাটাকে ভয় দেখালেন। সে ঝাঁটাটাকে চিনতো আর ভয় করতো। সঙ্গে সঙ্গে সে আয়নাটাকে ফেলে দিলো।

লোভের শাস্তি

সব বাঁদরদের মতো মালিশকাও খুব লোভী ছিল। আমাকে আর সে মোটেই ভয় করতো না। আমি খাঁচায় গিয়ে অন্য বাঁদরকে যদি খাবার দিতাম তাহলে সে আমার হাতে চিমটি কাটতো। প্রায়ই আমার হাতে কালশিটে পড়ে যেতো। মালিশকা চিমটি কাটতে পারতো এমনভাবে যাতে খুব যন্ত্রণা হয়। এমন কি গ্রিশকাকেও সে ভয় করতো না।

গ্রিশকাও ছিল একটা বাঁদর। কিন্তু সে ছিল দলের সর্দার। বনে অনেক বাঁদররা দল বেঁধে থাকে। তাদের মধ্যে যার চেহারাটা সবচেয়ে বড় আর যার গায়ে সবচেয়ে বেশী জোর থাকে, সে-ই নিজেকে তাদের সর্দার করে তুলে, আর দলকে বাঁচায় বিপদ থেকে। বাঁদররা তাদের সর্দারকে মানে আর তাকে ভয় করে। খাঁচার মধ্যেও গ্রিশকার কথা সবাই শুনতো আর তাকে ভয় পেতো। বাঁদরদের

যখন খাওয়ানো হতো তখন তার আগে কেউ খাবার নিতে সাহস করতো না। তার খাওয়া শেষ হওয়ার জন্যে সবাই অপেক্ষা করে থাকতো। গ্রিশকা ধীরেসুস্থে সবচেয়ে ভালো ভালো খাবারগুলো বেছে নিতো। তার পেট ভরার পর ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে সে তার প্রিয় গাছের ডালটায় গিয়ে বসতো। তখনই শুধু তার দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে অন্য বাঁদররা আসতো খাবারের কাছে। তাড়াতাড়ি যতটা খাবার পারতো তাদের গলার থলিতে ভরে দৌড়ে চলে যেতো নিজের নিজের জায়গায়। গ্রিশকা তাদের রেখেছিল আতঙ্কের মধ্যে। যত খুসি সে অন্য বাঁদরদের মারতো কিম্বা কামড়াতো, কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে দিতো না। তার দলের কোনো বাঁদরকে কেউ আঘাত করতে চেষ্টা করলে তার কপালে জুটতো দারুণ দুর্গতি! শত্রু যেই হোক না কেন, গ্রিশকা ছুটে যেতো রক্ষা করার জন্যে। গ্রিশকার যদি শীত করতো তাহলে সে অন্যান্য বাঁদরদের জড়ো করে তাদের দিয়ে নিজের গাটা সেঁকাতো কিম্বা বাছাতো উকুন।

একমাত্র মালিশকাই গ্রিশকাকে অমান্য করতে সাহস করতো। অন্য বাঁদরদের মতো কখনো সে তার উকুন বাছতো না কিম্বা তার শরীর সেঁকে দিতো না। খুব চটপটে আর তৎপর বলে সর্বদাই সে বিপদ এড়িয়ে যেতে পারতো কিম্বা আমাকে তার রক্ষক মনে করায় গ্রিশকার নাকের তলা থেকে সে খাবার নিয়ে নিতো। বাদাম আর আপেল গালের মধ্যে ঠেসে সে নড়বড় করতে করতে চলে যেতো শান্তিতে খাবার জন্যে।

বহুকাল গ্রিশকা এটা সহ্য করেছিল। কিন্তু একবার মালিশকা যখন যথারীতি প্রচুর খাবার মুখে ভরে ধীরে ধীরে ওপরে উঠছিল গ্রিশকা ছুটে গেল তার কাছে। মালিশকা অবাক হয়ে কতকটা খাবার ফেলে দিলো। চিৎকার করতে করতে সে চেষ্টা করলো পালাতে, কিন্তু তার আর সময় ছিল না। গ্রিশকা জোর করে তার ল্যাজটা চেপে ধরে তাকে মারতে, কামড়াতে, আঁচড়াতে লাগলো। পলিয়া মাসি আর আমি তাকে উদ্দেশ্য করে চেঁচাতে লাগলাম, ভয় দেখালাম ঝাঁটাটা দিয়ে। মালিশকা তার হাত-পা দিয়ে শিকগুলো চেপে ধরে চেষ্টা করলো পালাতে। কিন্তু কোনোকিছুতেই ফল হলো না। গ্রিশকা তাকে সোজা খাঁচার ছাতে টানতে

টানতে নিয়ে গিয়ে তার কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিলো — এমন কি তার গালের মধ্যে লুকিয়ে রাখা চিনির ডেলাটি পর্যন্ত।

এইভাবে লোভের জন্যে মালিশকা শাস্তি পেয়েছিল।

রবার বন্ধু

কে একজন বাঁদরের খাঁচার মধ্যে একটা লজেন্স ছুঁড়ে দিয়েছিল। লজেন্সটা ছিল রঙিন আর কাগজে জড়ানো। মালিশকা সেটা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। দিনের পর দিন ছানাটা তার তাকটায় বসে থাকতো। তাকে দেখাতো খুব বিষণ্ণ। সে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকতো যেন তার শীত করছে। তার পেটটা পড়ে গেল। তার সদা উজ্জ্বল লোমগুলো হয়ে পড়লো ম্যাড়মেড়ে আর খসখসে।

কেউ আর এখন আমার কাঁধে লাফিয়ে ওঠে না, কিম্বা আমার হাতে চিমটি কাটে না আর পকেট হাতড়ায় না।

ডাক্তার ডাকা হলো। তিনি রুগীকে যত্ন করে পরীক্ষা করে বললেন ক্যাষ্টর অয়েল খাওয়াতে আর গরম জলের একটা বোতল দিয়ে তার পেটে সেঁক দিতে।

মালিশকাকে ক্যাষ্টর অয়েল খাওয়াতে হয়েছিল জোর করে। আরো বেশী হ্যাঙ্গামা সে জুড়েছিল গরম জলের বোতলটা নিয়ে। চারবার আমরা সেটাকে তার পেটের সঙ্গে বেঁধে দিতে চেষ্টা করেছিলাম আর চারবারই সে সেটাকে ফেলে দিয়েছিল।

তারপর আমরা একটা মতলব করলাম। মালিশকাকে এমন একটা ছোট্ট খাঁচায় পোরা হলো যার মধ্যে কোনো রকমে তাকে ধরে। তার মেঝেতে রাখা হলো একটা গরম জলের রবারের বোতল। কী ভয়টাই না মালিশকা পেয়েছিল! সেই অদ্ভুত জিনিসটা জেলিমাছের মতো ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল।

আতঙ্কিত হয়ে সে খাঁচার এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসলো, আতঙ্কিত চোখে সে চেয়ে রইলো বোতলটার দিকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে সে বসে রইলো স্থির হয়ে। তার মধ্যে কয়েক বার আমরা বোতলের জলটা বদলে দিলাম।

কিন্তু মালিশকা এতো ভয় পেয়েছিল যে এমন কি নড়বার সাহস তার ছিল না। তারপর সাবধানে বোতল থেকে চোখ না সরিয়ে কাছে এসে সেটাকে সে আস্তে আস্তে ছুঁলো। বোতলটা চমৎকার গরম, তাকে কামড়ালো না। তারপর আরো সাহসী হয়ে তার সমস্ত ছোট্ট রোগা শরীরটা তার উপর চেপে জোর করে সেটাকে জড়িয়ে ধরে অবশেষে সে পড়লো ঘুমিয়ে।

সেদিন থেকে মালিশকাকে গরম জলের বোতলটা থেকে আলাদা করা গেল না। সেটাকে তার পেটের ওপর চেপে ধরে সে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতো, এমন কি সেটার উকুনও বাছতো। অবশ্য সেটার মধ্যে কোনো উকুন ছিল না। কিন্তু বাঁদরের মধ্যে উকুন বাছাটাই হলো ভালোবাসার নির্ভুল চিহ্ন। মালিশকা সেরে ওঠবার পর তার কাছ থেকে বোতলটা নিয়ে নেওয়াটা কী কঠিনই না হয়েছিল! তার রবারের বন্ধুকে তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া সে সহ্য করতে পারে নি। সেটাকে তার বুকে চেপে ধরে সে কেঁদেছিল, যেন তার নিজের ছেলেকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

তার বন্ধুদের মধ্যে ফিরে আসার পুরো একমাস পরেও কেউ যদি খাঁচার পাশ দিয়ে একটা গরম জলের বোতল নিয়ে যেতো তাহলে সে শিকের উপর লাফিয়ে উঠে ঠোঁট বার করে করুণ সুরে কাঁদতো।

বৃথা চালাকি

একটা বাঁদরকে পাঠাবার কথা ছিল অন্য এক চিড়িয়াখানায়। ট্রেনটা সন্ধেয় ছাড়বার কথা। ঠিক হলো মালিশকাকে পাঠানো হবে। বাঁদরদের মধ্যে সেই ছিল সবচেয়ে পোষা, অন্যদের চেয়ে তাকে ধরা সহজ। অন্তত সে কথা আমরা মনে করেছিলাম — কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্যাপারটা হয়ে উঠলো একেবারে অন্য রকম। চিড়িয়াখানার পশুবিজ্ঞানী খাঁচার মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের নিমেষে সমস্ত বাঁদররা একেবারে ওপরে উঠে পড়লো। তারা চিড়িয়াখানার এই পশুবিজ্ঞানীকে ভালো করে জানতো, কারণ প্রায়ই তাকে ধরতে হতো বাঁদর। তাঁকে দূর থেকে

দেখা গেলেই এমন হট্টগোল শুরু হতো যে প্রত্যেকেই সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারতো কে আসছে।

মালিশকাকে ধরা খুব সহজ হবে না দেখে পশুবিজ্ঞানী চালাকির আশ্রয় নিলেন। তিনি পলিয়া মাসির ব্লাউজ আর স্কার্টটা পরে মাথায় একটা শাল ঢেকে এমন কি হাঁটবার ভঙ্গীটাও বদলালেন যাতে খাঁচার মধ্যে যে কে আসছে সে কথা বাঁদররা না বুঝতে পারে। বাঁদররা তাঁর দিকে হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রইলা — তাঁকে পলিয়া মাসির মতো দেখতে, অথচ পলিয়া মাসি তিনি নন। কাছে আসতে সাহস না করে তারা তাঁর চারদিকে ঘুরতে লাগলো। তিনি একে দেন একটা নাশপাতি, ওকে একটা আপেল, এইভাবে ধীরে ধীরে মালিশকার কাছে এগিয়ে আসতে লাগলেন। তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন একটা আপেল।

দুরুদুরু বুকে আমি দেখতে লাগলাম: 'উনি আমার মালিশকাকে ধরে ফেলবেন, নিশ্চয়ই ফেলবেন ধরে!' কিন্তু দেখলাম মালিশকা অত বোকা নয়। সে আপেলটার জন্যে হাত বাড়ালো, কিন্তু চিড়িয়াখানার পশুবিজ্ঞানীর পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলো সন্দেহভরা দৃষ্টিতে। আমিও নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম পলিয়া মাসির স্কার্টের তলায় তাঁর বড় বড় বুটগুলো দেখা যাচ্ছে। ছানাটাও সেগুলো দেখেছিল।

বুট জোড়া ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগলো। মালিশকা বুট জোড়া থেকে চোখ না সরিয়ে সেগুলো থেকে ক্রমশ সরে যেতে যেতে হঠাৎ উঠলো চেঁচিয়ে! মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত বাঁদররা খাঁচার ছাদে উঠে গেল।

তারপর সর্দার গ্রিশকা খেঁকিয়ে উঠলো 'ক্রা' বলে, আর তারা সবাই সেই লোকটির উপর পড়লো ঝাঁপিয়ে। যেন তাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে শালটা গেল ছিঁড়ে, পলিয়া মাসির স্কার্ট আর নতুন ব্লাউজটা হয়ে গেল ফালি ফালি। চিড়িয়াখানার পশুবিজ্ঞানী আত্মরক্ষা করতে এবং তাদের সরিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু চল্লিশ জোড়া চটপটে হাত তাঁকে ধরে ছিঁড়তে লাগলো তাঁর জামাকাপড়, তাঁর মুখটা লাগলো খামচাতে।

হট্টগোলের কারণটা কী দেখবার জন্যে পলিয়া মাসি ছুটে এসে সেই পশুবিজ্ঞানীকে করতে গেলেন সাহায্য। কিন্তু ক্রুদ্ধ বাঁদরদের কাছ থেকে তাঁকে

উদ্ধার করা সহজ হলো না: তারা তাদের শিকারকে ছাড়তে চাইলো না। বহু কষ্টে হাত দিয়ে মুখ আর মাথাটা ঢেকে ছেঁড়া খোঁড়া পোষাক আর আঁচড়ানো শরীর নিয়ে অবশেষে তিনি খাঁচা থেকে বেরুলেন।

বাঁদরগুলো এতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে বহুক্ষণ তারা শান্ত হতে পারলো না। চিৎকার করতে করতে তাঁর দিকে তারা ভয় দেখিয়ে অঙ্গভঙ্গী করতে লাগলো।

এইভাবে চিড়িয়াখানার পশুবিজ্ঞানীর চাতুরিটা পরাহত হয়েছিল আর মালিশকা থেকে গিয়েছিল চিড়িয়াখানায়।

পলায়ন

যখন গরম রোদেভরা দিনগুলো এলো বাঁদরদের তখন শীতের বাড়ী থেকে স্থানান্তরিত করা হলো একটা বড়সড় খোলা জায়গার খাঁচায়।

সমস্ত দিন সেখানে তারা দৌড়োদৌড়ি করতো, পরস্পরকে করতো তাড়া। দড়া-বাজিকরদের মতো লাফাতো দোলনা থেকে দোলনায়, হাঁটতো টান করে বাঁধা দড়ির উপর দিয়ে, চড়তো মসৃণ বাঁশে।

একমাত্র মালিশকাই হুটোপাটি করতো না। আমরা খুব অবাক হয়ে

গিয়েছিলাম: সাধারণত খেলতে সে খুব ভালোবাসে। কিন্তু এখন সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিকের কাছে বসে থাকতো আর বাইরের দিকে তাকাতো কাছের কতকগুলো গাছের দিকে। মাঝে মাঝে বাতাসে গাছের একটা ডাল বেঁকে গিয়ে কাছে আসতো, আর তখন সে শিকের ভেতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে চেষ্টা করতো সেটাকে ধরতে। তারপর আবার বসে পড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে তাকিয়ে থাকতো বন্ধ দরজাটার দিকে। পলিয়া মাসি খাঁচায় ঢোকার জন্যে সচরাচর দরজাটা যতটা ফাঁক করতেন, একদিন তার চেয়ে একটু বেশী ফাঁক করেছিলেন। মালিশকা এক লাফে পরিচারিকার পাশ দিয়ে ছুটে গেল। কী ঘটছে পলিয়া মাসি জানবার আগেই মালিশকা একটা গাছের একবারে মগডালে উঠে পড়লো। পলিয়া মাসি তাকে ডেকে, তার দিকে মুখরোচক নানা খাবার বাড়িয়ে ফিরিয়ে আনার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর কান্না আর অনুনয় বিনয়ে কোনো ফল হলো না। এই ছোট্ট পলাতকটি এমন কি তাঁর দিকে ফিরেও তাকালো না। আর একজন পরিচারক এবং ম্যানেজার পলিয়া মাসিকে সাহায্য করতে যখন এলেন মালিশকা তখন তৎপরতার সঙ্গে আর একটা গাছে গেল লাফিয়ে, তারপর একটা বেড়া লাফিয়ে পার হয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে চলে গেল দৃষ্টির বাইরে।

কয়েক মিনিট পর চিড়িয়াখানার সব টেলিফোনে খবর আসতে শুরু করলো:

'হ্যালো! চিড়িয়াখানা থেকে কি বাঁদর পালিয়েছে? সেটা এখন প্রেস্ন্যা স্ট্রীটে।'

'পুলিশ থেকে কথা বলছি। যে বাঁদরটাকে তিশিন্‌স্কায়া স্ট্রীটের দিকে যেতে দেখা গিয়েছিল সেটা কি আপনাদের বাঁদর?'

যতবারই ম্যানেজার রিসিভারটা নামিয়ে রাখেন ততবারই নতুন নতুন খবর আসতে থাকে: গেওর্গিয়েভ্‌স্কা স্কোয়ার থেকে, বলশায়া গ্রুজিনস্কায়া থেকে, কুর্বাতোভ্‌স্কি গলি থেকে... যেসব পথে মালিশকাকে দেখা গিয়েছিল সেইসব পথ থেকে খবর আসতে লাগলো।

পলিয়া মাসি আর আমি ছুটলাম তাকে খুঁজতে। কুর্বাতোভস্কি গলিতে পেঁৗছে আমরা দেখলাম একটা বাড়ীর সামনে ভিড় জমে উঠেছে, আর মালিশকা দোতলার জানালার একটা কার্নিশে মরিয়া হয়ে লাফাচ্ছে।

হঠাৎ সে একটা খোলা জানালার ভিতর দিয়ে কতকগুলো ফুলের টব উল্টে লাফিয়ে পড়লো।

পলিয়া মাসি আর আমি বাড়ীটার মধ্যে দৌড়োলাম। সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠছি, এমন সময় হঠাৎ একটি মহিলা তাঁর ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন। আমাদের মালিশকা কোথায় আছে সঙ্গে সঙ্গে অনুমান করে আমরা সেই ঘরে গিয়ে দেখলাম আতঙ্কিত বাঁদরটা এ কোণ থেকে ও কোণে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। অবশেষে বহু কষ্টে আমরা তাকে ধরলাম।

বাড়ী যাবার পথে যাতে পালাতে না পারে তার জন্যে মালিশকাকে একটা ড্রেসিং গাউনের ভিতরে ভরে তাকে নিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি ফিরলাম চিড়িয়াখানায়।

মালিশকাকে আগের খাঁচায় ভরা হলো। পলাতককে ফিরতে দেখে অন্য বাঁদররা কী খুসিই না হলো! তারা তাকে ঘিরে আদর করতে লাগলো, বাঁদরদের ভাষায় করতে লাগলো বলাবলি, আর মালিশকা বসে রইলো একটা ডালে আর পলিয়া মাসির দেওয়া একটা বিরাট আপেল লাগলো কামড়াতে।

জন্তুর স্মৃতি

চিড়িয়াখানায় একবার এলো এক চিতাবাঘ। এর আগে কখনো আমি চিতা দেখি নি, শুধু বইয়েই পড়েছি। পড়েছি যে চিতা চালাক, সুন্দর হিংস্র জন্তু, এবং সে মানুষের মধ্যে নিজেকে ভালো খাপ খাওয়াতে পারে। এমন কি তাকে নাকি শিকার করতেও শেখানো হয়।

বাক্স খুলতেই খাঁচায় গিয়ে ঢুকলো সে। গায়ে ফুট ফুট দাগ, শিকারী কুকুরের মতো সরু ও সুন্দর পা, ধড়ও খুব সুঠাম।

খাঁচায় ঢুকেই চিতা প্রথমে জলের গামলাটির কাছে গেল। অনেকক্ষণ ধরে জল খেলো সে, তারপর মাংস না ছুঁয়ে, নতুন বাসা না শুঁকেই শুয়ে পড়লো খাঁচার একটি কোণে। এটা আমার কাছে খুব অদ্ভুত ঠেকলো। হামেশাই জন্তুজানোয়াররা পয়লা নতুন জায়গাটি ভালো করে দেখে, আর এটি কিনা সঙ্গে সঙ্গেই শুয়ে পড়লো। অসুখ-টসুক করে নি তো আবার? দুঃখের বিষয়, আমার দুর্ভাবনা মিছে নয়। সকালে পরিচারক এসে দেখে চিতা একই জায়গায় শুয়ে আছে, আর মাংস ছুঁয়েই নি।

ডাক্তার ডাকতে হলো। চিড়িয়াখানার ডাক্তারবাবু বুড়ো ও যথেষ্ট অভিজ্ঞ লোক। অনেক জন্তুই তাঁর হাতে ওষুধ খেয়েছে, অনেক জন্তুকেই তিনি সারিয়েছেন। বুনো জন্তুর চিকিৎসা করাও একেবারে মামুলি কথা নয় কিন্তু। এই তো চিতাকে দেখা দরকার, স্টেথেসকোপ দিয়ে পেট পরখ করা চাই, আর সে শুয়েই আছে, এমন কি একটু নড়ছেও না। তবে জন্তুর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে দেখে ডাক্তারবাবু ধরে নেন যে তার সর্দি হয়েছে, নিউমোনিয়ার লক্ষণও আছে।

রোগীকে শিগ্‌গির ওষুধ দেওয়া চাই, কিন্তু তা কি আর এতো সোজা। খাবার সে ছুঁলোই না, আর জলে যখন ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হলো, তাও সে খেলো না।

চিতা দিন দিন শুকোতে থাকে। চোখ তার বসে যাচ্ছে, লোম এলোমেলো, আর যখন সে উঠে দাঁড়ায়, দেখা যায় সে ভীষণ কমজোর, থাবাগুলো কাঁপছে।

রোগীর কাছে দিনরাত কাউকে না কাউকে থাকতে হয়। রাত্রে চিতাকে গরম রাখা হয় হিটারের তাপে, বারবার খেতেও দেওয়া হয়। সে শুধু জলই খায়, মাংস পড়ে থাকে। চিতার এমন একটানা অনশনে আমরা সবাই দারুণ চিন্তিত হয়ে উঠি।

— কিছু একটা করা দরকার, — বলেন একদিন ডাক্তারবাবু। — না খাওয়ালে জন্তু মারা যাবে।

খাওয়ানো! অসুস্থ জানুয়ারকে খাওয়ানো — কথাটি বলা খুবই সহজ! আর যে যাই বলুক, আমার তো জানা আছে তা কী মুশকিলের ব্যাপার। একবার কিছু দিয়ে দেখো না, খাওয়া তো দূরের কথা, আরে উঠবেই না জায়গা থেকে। এমন কি মাংস মুখের কাছে এনে ধরলেও খায় না, মুখ ফিরিয়ে নেয়।

চিতার জন্যে ভীষণ দুঃখ হলো আমার। সত্যি, কিছু একটা না করলে সে মারাই যাবে। তখনই আমার মাথায় এক বুদ্ধি এলো: খাঁচায় ঢুকে যদি হাতে খাওয়ানোর চেষ্টা করা যায় তো কেমন হয়। ডাক্তারবাবুকে একথা বলতেই তিনি ঘাবড়ে গেলেন:

— কী যে বলেন, এরকম ঝুঁকি নিতে আছে কি!

তাঁকে অনেক বোঝালাম, কোনো ঝুঁকিই নেই এতে। তবে সবকিছু মিছে। আর কী-ই বা এমন ঝুঁকি, যখন চিতা একদম কমজোর, কোনো রকমে পায়ের উপর খাড়া। তাছাড়া তার হাবভাব দেখে তো মনে হয় সে মোটেই বুনো বা হিংস্র নয়। আমিও তো আর তেমন বোকা নই যে সোজা গিয়ে মাথাটি ঢুকিয়ে দেবো তার মুখে।

তবে আমার কোনো যুক্তিতেই কাজ হলো না, চিতার খাঁচায় কিছুতেই ঢুকতে দেওয়া হবে না আমাকে। তখন আমি ঠিক করি, যা খুশি তাই-ই করবো — বিভাগের পরিচালিকা তো আমিই, আমার যা ভালো মনে হয় তা করার অধিকার আমার আছে।

এর মানে কিন্তু এ নয় যে আমি আগ-পাছ ভাবি নি। মোটেই তা নয়। সব পয়লা ফোন করি পশুশালায়, যেখান থেকে এসেছে চিতা। সেখানে আমি জানতে পারি, তাকে পাঠানো হয়েছে সার্কাসের জন্যে এবং আমাদের কাছে বেশীদিন থাকবে না। দেখলে তো, জন্তু যে পোষ-মানা তাতে আমার ভুল হয় নি। একথা অবশ্য সত্যি যে, মালিক বদলে গেলে পোষা জানোয়ারকেও আগে জানতে হয়, 'আলাপ' করতে হয় তার সঙ্গে। কিন্তু এই 'আলাপ-সালাপেরই' সময় ছিল না। আমার মন বললো, চিতা ছোঁবেই না আমাকে।

মনের কথাকে আমি চিরদিনই খুব বিশ্বাস করি। জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে এতো বছরের কর্মজীবনে মন কখনো ধোকা দেয় নি আমাকে। সবাই চলে গেলে খাঁচায় ঢোকার আগে তবুও কিছুটা তোড়জোড় করতে লাগলাম। খাঁচায় ঢোকালাম জলের নল, রাখলাম তা এমনভাবে যাতে সময়মতো পাওয়া যায় হাতের কাছে। তারপর কিছুটা জল ছেড়ে যখন নিশ্চিত হলাম যে নল ঠিক কাজ করছে, ঢুকলাম ভেতরে।

চিতা আমার দিকে মুখ ফেরালো, কিন্তু উঠলো না। যখন আমি তার একেবারে কাছে, সে এমন কি নড়লোও না পর্যন্ত। সামনে বসে আমি বাটি থেকে তাকে একটুকরো মাংস দিলাম। চিতা দাঁত দেখিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলো। তার এ জিনিসটি করার ধরন দেখে আমি বুঝলাম যে সে রাগছে না, শুধু চাইছে তাকে যেন ঘাঁটানো না হয়। কিন্তু না ঘাঁটিয়ে পারলাম না। আবার আমি তাকে মাংস দিলাম, — প্রথমে ডিমের সঙ্গে মিশিয়ে, তারপর দুধের সঙ্গে। চিতা কিছুই খেলো না, একবার শুধু আমার দুধে ভেজা হাতখানিই চাটলো।

আমি তক্ষুণি আবার দুধে হাত ভিজিয়ে তা নিয়ে গেলাম চিতার মুখের সামনে, কিন্তু শুঁকেই সে মুখ ঘুরিয়ে ফেললো। আচ্ছা, এবার বুঝেছি! মানে, দুধ নয়, সে চাইছে জল। ঠিক আছে, সুযোগটি কাজে লাগানো যাক। একটুকরো মাংস জলে ডুবিয়ে চিতাকে দিলাম খেতে। এবার সে আর মুখ ফিরালো না। ভীষণ তেষ্টার সঙ্গে জল চাটতে চাটতে হঠাৎ কখন যে সে তার নিজের অজান্তেই ছোট্ট মাংস টুকরোটি গিলে ফেলে আমি টেরই পেলাম না। পরের টুকরোটিও জলে ভিজিয়ে দিলাম, তাও সে খেলো। এইভাবে চিতা বেশ কিছুটা মাংস

গিললো, তারপর ক্লান্তিতে থাবার উপর মাথাটি রেখে চোখ বুজে পড়লো শুয়ে। সাবধানে হাতটি রাখলাম তার মাথায়। চিতা চমকে উঠে চোখদুটো একটু খুলেই আবার বুজে ফেললো। বুঝলাম, আমার উপর তার বিশ্বাস আছে। পয়লা বারের জন্যে এটুকুই যথেষ্ট।

এই সামান্য বিজয়েই আমার মন খুশিতে ভরে উঠলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি খাঁচা থেকে বেরুলাম খুব চুপচাপ, ঠিক যেমন ঢুকেছিলাম। এমন কি পোষ-মানা জানোয়ারও কারোর ছোটাছুটি পছন্দ করে না, আর অজানা লোক হলে তো কথাই নেই। কিন্তু যেই আমি খাঁচার বাইরে চলে এলাম অমনি ছুটলাম ডাক্তারের কামরায়, — আনন্দে নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। বেশ রাত হয়েছে তখন, তবুও ভাবলাম কারো-না-কারো সঙ্গে দেখা তো হবেই।

ভুল করি নি। তাঁকেই পেলাম সেখানে। আমাদের প্রিয় বুড়ো ডাক্তারবাবু আর কি। তাঁর আর কাজের শেষ হয় না কখনো! অতিরিক্ত কত ঘণ্টা যে কাজ করছেন তার কোনো হিসেবই নেই! কত নিদ্রাহীন রাত তাঁর কেটে যায় চিড়িয়াখানায়! এই তো দেখো না, ঘড়িতে রাত বারোটা বাজতে চললো, আর ভ্লাদিমির পেত্রোভিচ এখনো সেখানে, এবং দরকার হলে সকাল অবধিও থেকে যাবেন।

— খাচ্ছে! খাচ্ছে! খাচ্ছে! — কামরায় ঢুকে একশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেললাম আমি।

— কে খাচ্ছে? কী খাচ্ছে? — জিজ্ঞেস করেন ডাক্তারবাবু।

এরকম লাফালাফি আর আনন্দোচ্ছ্বাস ভ্লাদিমির পেত্রোভিচ ঢের দেখেছেন, তাই ওতে তিনি গা করেন না। তবে চিতা যে খাচ্ছে একথা শুনে তিনি আর উদাসীন থাকতে পারলেন না, লাফিয়ে উঠে চশমা পরেই চললেন আমার পেছন পেছন।

যে-মানুষ তোমাকে বোঝে তাকে আনন্দের কথা খুলে বলতে কী ভালোই না লাগে! আমরা দু'জনে চিতার খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে আছি, খুঁটিনাটি সবকিছুই আমি তাঁকে বলছি, চেষ্টা করছি কিছুই যেন বাদ না পড়ে। ভ্লাদিমির পেত্রোভিচ মন দিয়ে শুনেন। সমস্ত খুঁটিনাটিই তাঁর পক্ষে খুব জরুরী। চিতার

রোগ সারাতে তা সাহায্য করবে ডাক্তারকে। সবকিছু শোনার পর ছোটো সুটকেস থেকে তিনি কি একটা ওষুধ বের করে দেন আমাকে।

— দিনে কম-সে-কম তিনবার খাওয়াবেন এই ওষুধ, — বলেন তিনি। — ওষুধ দেবার আগে জল খাওয়াবেন না। হ্যাঁ, আর কী করে দিতে হয় জানেন?

জানি কি? অবশ্যই জানি। প্রথমে মাংসের ঝিল্লিতে ওষুধটি মোড়া চাই, তারপর তা একটুকরো মাংসের মধ্যে পুরে দিতে হবে জানুয়ারকে। ওষুধ খাওয়ানোর আগে জল দিতে নেই কেন — তাও জানি। চিতা তো আগেই জলে ভেজানো মাংস খেয়েছে, এবং আবারো খাবে, তবে এবার ওষুধ দেওয়া মাংস এই যা।

সকালে আমি আবার ঢুকলাম চিতার খাঁচায়। এখন আমাকে সে চিনে। মাথায় হাত রাখলে আর চমকে উঠে না, সাবধানে তুলে নেয় মাংস, বেশ কয়েক টুকরোই খায়। ওতেই রয়েছে ওষুধ দেওয়া মাংসের টুকরো। এবার আশা করা যায় চিতা সেরে উঠবে। এবং সত্যিই, ওষুধ খাওয়ার একটু পরেই তার চোখ ঝলঝল করে উঠলো। আর একদিন আমি যখন মাংস নিয়ে খাঁচায় গেলাম, সে হঠাৎ জায়গা থেকে উঠে এলো আমার কাছে।

সহসা চিতার এরূপ হাবভাব দেখে আমি তো চমকে উঠলাম। হাতের বাটিটা প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। যাক সময়মতো সামলে নিলাম নিজেকে। জানোয়ারের সামনে ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়ানো বিপজ্জনক। কোনোকিছুই যেন ঘটে নি এমন ভাবখানা নিয়ে উটকো হয়ে বসে চিতাকে মাংস বাড়িয়ে দিলাম। আগের মতো এবারও চিতা মাংস খেলো এবং সঙ্গে সঙ্গেই চাইলো আরেক টুকরো।

প্রায় সবটুকু মাংসই সে খেয়ে নিলো। তারপর মুখ চেটে বিড়ালের মতো গরগর করে গা ঘষলো আমার পায়ে। সেদিন দেরিতে বেরুলাম খাঁচা থেকে, সোহাগী জন্তুটিকে ছেড়ে যেতে মোটেই মন চাইছিল না। সে ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে, আর আমি তখনো বসে বসে তার গায়ে হাত বুলোচ্ছি। রোগে সে কী ভীষণ শুকিয়ে গেছে।

এরপর থেকে চিতার খাঁচায় ঢুকতে আমার মোটেই ভয় হতো না। আমি খুবই ভালোবেসে ফেললাম সুন্দর সোহাগী জন্তুটিকে। সেও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। কখনো দূর থেকে আমাকে দেখলে কিংবা আমার গলা শুনলে সঙ্গে সঙ্গেই ছুটতো খাঁচার শিকগুলোর কাছে। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতো — আমি তার দিকে আসছি না যাচ্ছি অন্য কোথাও।

চিতার নাম রাখলাম লুক্স। আসলে তাকে নামটি দিয়েছে পরিচারক, সে এই নামেই ডাকতো। আর চিতাও তাতে দিতো সাড়া।

লুক্স যখন সম্পূর্ণ সেরে উঠলো, ঠিক হলো খাঁচা থেকে তাকে নিয়ে আসা হবে ঘরে। বিশেষ করে ডাক্তারবাবুর তাই মত। তখন শীতকাল, চিতা যেখানে থাকে সব সময়ই সেখানে লোকের ভিড়। বার বার দরজা খুলতে হয়, এতে দুর্বল জানোয়ারটির আবার অসুখ করতে পারে।

বেশ, এক খালি ঘরে রাখা হলো চিতাকে। ঘরটি অবশ্য তেমন বড়ো নয়, তবে গরম ও আলো আছে তাতে। লুক্সের দেখাশোনার ভার আমারই। আমাদের দু'জনের ভাবও খুব, তাই তার কাছে যেতে কোনো আশঙ্কাই আর থাকতে পারে না।

এই ঘরটিতে লুক্স শীত ও বসন্ত কাটায়। এলো গরম, আমার আশা ছিল চিতা চিড়িয়াখানায়ই থেকে যাবে। কিন্তু হঠাৎ একদিন সার্কাসের লোক আসে তাকে নিয়ে যেতে। চিড়িয়াখানার ম্যানেজার, ডাক্তারবাবু আর আমি কত করে বললাম চিতাকে আমাদের কাছে রেখে দিতে, তবে সব প্রয়াসই ব্যর্থ হলো।

আমার আদরের লুক্সকে বিদায় দিতে আমার দারুণ কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু করার তো কিছুই নেই। চোখে আমার জল ছলছল করছে, তবু নিজেই চিতাকে বসালাম বাক্সে। লুক্স খুব সম্ভব বুঝেছিল যে সে আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিছুতেই সে আমাকে ছাড়তে চাইছিল না। অনেকক্ষণ চাটলো আমার হাত, তারপর নিরুপায় হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলো ছোটো খাঁচায়।

এবার কয়েকজন লোক খাঁচাটি তুললো একটি ট্রাকে। তারপর ট্রাকখানা দিলো ছেড়ে। চিড়িয়াখানার গেটের আড়ালে চলে গেছে গাড়ীখানা, কিন্তু তারপরও আমি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলাম সেদিকে। আমার বিশ্বাসই হলো

না যে লুক্‌সের সঙ্গে এ বিচ্ছেদ চিরদিনের মতো। মনে হলো, নিশ্চয়ই আবার আমাদের দেখা হবে — এমনটিও তো হয়ে থাকে!

পরে কতবারই আমি সার্কাসের প্রোগ্রামে খুঁজেছি চিতাকে, বহুবারই তাকে দেখার আশায় সেখানে গেছি, কিন্তু সবই বৃথা।

কাটে চার বছর। হঠাৎ একদিন শুনি, সার্কাস থেকে চিড়িয়াখানায় কয়েকটি জানোয়ার এসেছে, — সিনেমার জন্যে তাদের ছবি তোলা হবে। গেলাম তাদের দেখতে।

সেখানে গিয়ে দেখি, কিছু জন্তু খাঁচায়, কিছুটা রয়েছে খালি এক ঘরে, যেখানে শীতের সময় রাখা হয় চিড়িয়াখানার জন্তুজানোয়ারদের। খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন একটি মহিলা।

— কী, আমাদের জন্তুদের দেখতে এসছেন? — জিজ্ঞেস করেন মহিলাটি, এবং আমি চিড়িয়াখানায় কাজ করি শুনে বললেন:— চিতাটিও আমাদের কাছে আছে, তবে অসুখের পর সে অন্ধ হয়ে গেছে। আলাদা রাখা হয় তাকে। ঘরেই আছে। দেখতে চান?

চিতা! সত্যিই কি লুক্‌স? তাড়াতাড়ি গেলাম ঘরটিতে। সেখানে এক খাঁচায় শুয়ে শুয়ে চিতা মাংস খাচ্ছে। আগে আমার মনে হয়েছে যে লুক্‌সকে দেখলেই আমি চিনতে পারবো। কিন্তু কই, এখন তো আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভারাক্রান্ত মনে ভাবছি — এটা সে-ই না অন্য কোনো চিতা। চার বছরে স্মৃতি থেকে মুছে গেছে জন্তুর 'চেহারা', এবং শত চেষ্টা করেও তা স্মরণ করতে পারলাম না।

— আচ্ছা দিদি, — শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করি পরিচারিকাকে, — এর নাম কি লুক্‌স?

— না, কাই, — সানন্দে উত্তর দেন ভদ্রমহিলা।

কাই! মানে, সে নয়। ভাবছি চলে যাবো, কিন্তু হঠাৎ দেখি চিতা খাবার ফেলে রেখে কান পেতে কী যেন শুনছে। তারপর আমার পাশ দিয়ে কোথাও তাকিয়ে একটু অধীর কর্কশ ডাক ছাড়লো। আমি ফিরে দাঁড়ালাম। পেছনে কেউ নেই।

— ও কেন অমনভাবে দেখছে? — আমি জিজ্ঞেস করলাম।

— কে জানে। অন্ধ, কিন্তু মনে হয় তার নিশানা আপনার উপরই।

ঠিকই তাই, অন্ধ জন্তুটি আমাকেই 'দেখছিল'। কিন্তু কেন? তাহলে সত্যি সত্যিই...

— লুক্‌স! লুক্‌স! — ডাকলাম আমি।

চিতা একলাফ দিয়ে উঠলো। ছুটলো শিকগুলোর দিকে।

— লুক্‌স নয়, কাই, — শুধরে দেন পরিচারিকা।

কিন্তু ততক্ষণে আমি চিনে ফেলেছি যে সে লুক্‌স। খাঁচার দরজা খুলে দিলাম।

— সাবধান! কী করছেন... কামড়ে দেবে!.. — চেঁচিয়ে উঠেন মহিলাটি।

তবে আমি তাঁর কথায় কান দিলাম না। কয়েক পা'ও এগুতে পারি নি, অন্ধ চিতা কাছে এসে আমার হাতদুটো খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে। তা যখন খুঁজে পেলো, মাথা দিয়ে চেপে ধরে এক জায়গায় চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলো। বিস্মিত পরিচারিকার মুখে কোনো কথা নেই। আমিও চুপ। আর বলারই বা কি আছে!

লুক্‌সের এখন অন্য নাম এবং আজ সে অন্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিচ্ছেদের চার বছর পর সে আমাকে চিনতে পেরেছে।

শ্বেত ভালুকের ছানা — ফোম্‌কা

চতুষ্পদ যাত্রী

ফোম্‌কা মস্কোতে পৌঁছুলো ট্রেন কিম্বা স্টিমারে নয়, এরোপ্লেনে। সে মস্কোতে সোজা এসেছিল কতেল্‌নি দ্বীপ থেকে। খ্যাতনামা বৈমানিক ইলিয়া পাভ্‌লোভিচ্‌ মাজুরুক উক্ত প্লেন চালিয়েছিলেন। কতেল্‌নি দ্বীপের অধিবাসীরা তাঁকে এই উপহারটি দিয়েছিল। এরোপ্লেনের ক্রু'রা স্থির করেছিলেন তাকে মস্কোতে নিয়ে আসবেন।

ফোম্‌কাকে — এটাই হলো ভালুকছানাটার নাম — এরোপ্লেনে তোলা হয়েছিল একটা কাঠের বাক্সে ভরে। এই বাক্সটা ছিল বড় আর শক্ত, তার একটা দিক ছিল খোলা, আর সেখানটা ঢেকে দেওয়া হয়েছিল তারের জাল দিয়ে। প্রথমে ফোম্‌কা বসেছিল খুব স্থির হয়ে। কিন্তু প্লেনটা মাটি ছাড়তেই সে জালটাকে থাবা দিয়ে ধরে দাঁত আর নখ দিয়ে চেষ্টা করলো ছিঁড়ে ফেলতে। আর এতো জোরে গর্জন করতে লাগলো যে এমন কি ইঞ্জিনগুলোর শব্দও তার ডাককে চাপা দিতে পারে নি।

এই ছোট্ট গর্জনকারীকে কেউ শান্ত করতে পারে নি। সিলমাছের মাংস, মাছের তেল আর ভালুকদের অন্যান্য প্রিয় খাবার বাক্সটার মধ্যে দেওয়া হলো, কিন্তু ভালুকছানাটা ক্রমাগত চিৎকার করে ভেঙে ফেললো নিজের গলাটা। তখন স্থির করা হলো যে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। বাক্সটা খুলে দেওয়া হলো।

ফোম্‌কা সাবধানে বাক্স থেকে বেরিয়ে এলো, যেন চারদিকে বিপদ ওৎ পেতে রয়েছে। সন্দেহজনকভাবে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে কেবিনময় ঘুরে, সবকিছু শুঁকে, সবকিছু তদারক করে অবশেষে একটা বড় চামড়ার হাতলওলা ইজি-চেয়ারে উঠে জানালার বাইরে দিয়ে কৌতূহলী চোখে চেয়ে রইলো। চামড়ার এই হাতলওলা চেয়ারটা হয়ে উঠলো তার প্রিয় জায়গা। সেখানে ফোম্‌কা ঘুমতো, খেতো আর প্রায় সমস্ত সময়টা কাটাতো। যতবার প্লেনটা মাটিতে নামলো

ততবার তাকে হলো বাইরে আনা। অল্প সময়ের মধ্যে সে বুঝতে শিখলো প্লেনটা কখন নামতে শুরু করছে, এবং লাফিয়ে ইজি-চেয়ার থেকে নেমে দরজার কাছে গিয়ে সেখানে সে বসে থাকতো। আর দরজাটা খোলা হলে কী আগ্রহের সঙ্গেই না সে বাইরে লাফিয়ে নামতো! খাড়া সিঁড়িটা দিয়ে গড়াতে গড়াতে সে মাটিতে নামতো, আর তারপর আসতো তার খেলার সময়। ঘাসের উপর সে ক্রমাগত গড়িয়ে চলতো। কখনো শুতো চিৎ হয়ে, কখনো উপুড় হয়ে, সামনের একটা থাবা দিয়ে সে তার পিছনের একটা পা চেপে ধরে চলতো নিজের সঙ্গে কুস্তি করে।

উত্তেজনায় এমন কি সে লক্ষ্যও করতো না যে কত লোক তার চারিধারে জমায়েত হয়েছে। কিন্তু যতই সে তার খেলায় মশগুল থাকুক না কেন, যে মুহূর্তে কেউ চিৎকার করে উঠতো: 'প্লেনে চলো!' কিম্বা প্রপেলারটা উঠতো গর্জন করে, ফোম্‌কা খেলা থামিয়ে দৌড়ে ফিরে যেতো ভালুকরা যেমন ক্ষিপ্রভাবে ছুটে সেইভাবে।

সিঁড়ি দিয়ে এমন হাস্যকরভাবে আনাড়ির মতো সে উঠতো, কেবিনে প্রথম ঢোকার জন্যে সে এমন ব্যস্ততা দেখাতো যে মনে হতে পারতো সে ভয় পেয়েছে তাকে ফেলে যাওয়া হবে। এইভাবে মেরু প্রদেশের শাদা ভালুকছানা ফোম্‌কা মস্কোতে এলো।

ইলিয়া পাভ্‌লোভিচ্‌ মাজ্‌রুক স্থির করেছিলেন ফোম্‌কাকে তাঁর ফ্ল্যাটে কিছু দিন রাখবেন। কিন্তু দেখা গেল সেটা অসম্ভব। মেরু প্রদেশের গরম লোমওলা একটা ভালুকের কথা কল্পনা করো: তার লোমগুলো এতো গরম যে সবচেয়ে ঠাণ্ডার দিনেও স্নান করাটা তার কাছে আনন্দের ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়। এই ভালুকটা বাস করছে সুদূর উত্তরে নয়, চিরস্থায়ী বরফ ঢাকা খোলা জায়গায় নয়, বাস করছে বাষ্প দিয়ে গরম করা সহরের ফ্ল্যাটে, মস্কোর ঠিক মাঝখানে।

ফোম্‌কার এতো গরম লাগতো যে সে বুঝতে পারলো না কী করবে। তার একমাত্র পরিত্রাণ হলো স্নানের ঘরটা। তার জন্যে স্নানের টবটাকে পুরো করে ভরা হতো, সেটার মধ্যে সে ঢোকে, গড়ায়, ঝাঁপ মারে, থাবা দিয়ে জল ছিটোয়।

ভালুকের স্নানের পর ঐ ঘরের দেয়ালেতে লেগে থাকতো জলের ছিটে আর মেঝেতে জমে থাকতো জল।

স্নানের পর ফোম্‌কা পালিশ করা মেঝের উপর দিয়ে ঘষটে ঘষটে চলতো, যেন সেটা বরফ, এবং চুরচুরে ভিজে অবস্থায় উঠে পড়তো সোফায় কিম্বা
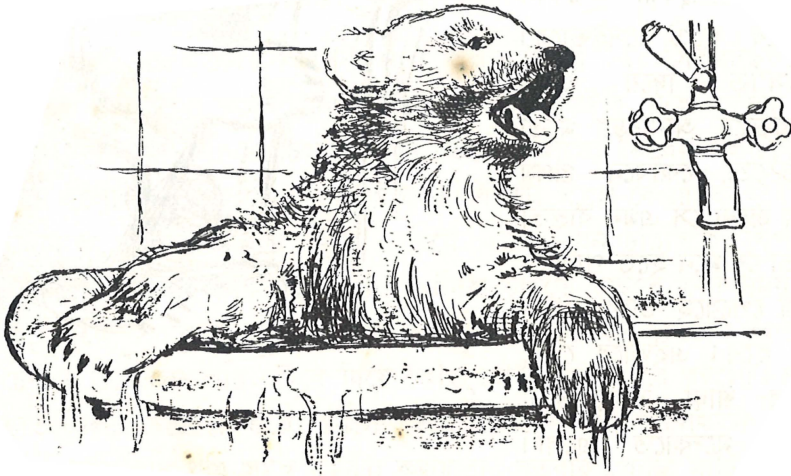
বিছানায়। তাকে সামলানো ছিল এক দায়। যতদিন পারলেন ইলিয়া পাভ্‌লোভিচ্‌ তাকে সহ্য করলেন, কিন্তু শেষকালে আর তিনি সহ্য করতে পারলেন না। চিড়িয়াখানায় টেলিফোন করে তিনি তাদের অনুরোধ করলেন ভালুকছানাটাকে নিয়ে যেতে। 'দোহাই আপনাদের, আসুন! আমাকে উদ্ধার করুন! ঘরের মধ্যে কী রকম ব্যবহার করতে হয় মেরু প্রদেশের ভালুকরা সে কথা জানে না।'

কর্তৃপক্ষ আমাকে পাঠালেন ফোম্‌কাকে আনতে।

আমি যখন পেঁছিলাম তখন বড় পড়ার ঘরের মাঝখানে মেঝের উপর সে ঘুমচ্ছিল। তার চারটে থাবা চারদিকে ছড়ানো, আর তাকে দেখাচ্ছিল ছোট্ট একটা গালচের মতো।

ফোম্‌কা গভীরভাবে ঘুমচ্ছিল। এমন কি আমি যখন তাকে তুলে নিলাম সে তখনও জাগলো না।

সে শুধু জেগে উঠলো পথে, যখন এক বৃদ্ধা চেঁচিয়ে উঠলেন:

'কী কাণ্ড রে বাবা! ও একটা ভালুককে কোলে করে নিয়ে চলেছে!'

ফোম্‌কা গর্জন করে উঠে আমার হাত ছাড়িয়ে... রাস্তার পাশে থামা একটা মোটরগাড়ীর কাছে ছুটে গেল। সম্ভবত সেটাকে সে মনে করেছিল একটা এরোপ্লেন। সে হাতলটা ধরে টানাটানি করতে লাগলো, এতেই ভয় পেয়ে গেল যাত্রীরা। একটা শাদা ভালুককে তাদের গাড়ীতে ঢুকতে চেষ্টা করতে দেখে অন্য দরজা দিয়ে লাফিয়ে নেমে তারা দারুণ চেঁচামেচি করতে লাগলো। এতে ফোম্‌কা পেয়ে গেল ভীষণ ভয়। কী গর্জনই না সে করতে লাগলো! কী টানাটানিটাই না সে করতে লাগলো হাতলটা ধরে! তার চাপে দরজাটা খুলে গেল, আর অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঢুকে বসে পড়লো সিটের উপর। সঙ্গে সঙ্গে সে শান্ত হয়ে পড়লো, কিন্তু গাড়ীর মালিকরা চেঁচাতে লাগলো আরো জোরে, বকাবকি করতে লাগলো আর বলতে লাগলো ভালুকটাকে বার করে দিতে। এসব বলা খুবই সহজ — কিন্তু ফোম্‌কা কিছুতেই বেরুতে চাইলো না। আমি তাকে টানতে লাগলাম, কিন্তু সে জায়গা থেকে না নড়ে গর্জন করতে করতে আঁচড়াতে লাগলো।

পুলিশের একটি লোক এলো কী নিয়ে গোলমাল বেঁধেছে দেখবার জন্যে। আমাদের কথা শুনে সে অপ্রত্যাশিতভাবে বললো:

'কমরেডরা, এখানে এই হৈ-চৈ না করে জন্তুটাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে সাহায্য করলেই পারতেন!'

পুলিশের লোকটির কথায় কাজ হলো। গাড়ীর মালিকরা ঠাণ্ডা হয়ে বিনীতভাবে আমাকে তাঁদের গাড়ীটা ব্যবহার করতে দিলেন, আর তাঁরা নিজেরা রাজি হলেন চিড়িয়াখানার গাড়ীতে উঠতে। আমাদের শুধু গাড়ীই বদল করতে হলো না, ড্রাইভারও বদল করতে হলো। যে গাড়ীতে একটা ভালুক আছে সে গাড়ীটা চালাতে তাঁদের ড্রাইভার কিছুতেই রাজি হলো না।

সমস্ত পথ ফোম্‌কা শান্ত হয়ে বসে রইলো। জানালা দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে সে দেখতে লাগলো। পথিকরা দাঁড়িয়ে পড়ে তাকিয়ে থেকে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো মেরু প্রদেশের একটা ভালুক কী করে একটা মোটরগাড়ীর মধ্যে সেঁধিয়েছে।

আমরা চিড়িয়াখানায় পেঁছিলাম। পথে কোনো রকম দুর্ঘটনা ঘটলো না। সত্যি বটে ফোম্‌কার গাড়ী থেকে নামার কোনো বাসনা ছিল না, এবার কিন্তু চিড়িয়াখানার পশুবিজ্ঞানী আমাদের সাহায্য করলেন। তিনি ফোম্‌কার ঘাড়ের কাছটা চেপে ধরলেন, আর এই ভ্যাবাচ্যাকা ভাব কাটিয়ে ওঠবার আগেই ভালুকটিকে খাঁচার মধ্যে নিরাপদে ভরে ফেললেন।

অসুখের রহস্য

এক নতুন জায়গায় নিজেকে দেখে ফোম্‌কা একটুও বিচলিত হলো না। খাঁচার ঘেরা জায়গাটার মধ্যে সে ঘুরে, সেটাকে শুঁকে, পিছনকার ছোট্ট বাড়িটার ভিতরে গিয়ে পড়লো ঘুমিয়ে। ইতিমধ্যে জন্তুছানাদের পরিচারিকা কাতিয়া তার জন্যে সযত্নে তৈরি করলো খাবার। ইতিপূর্বে কখনো আমাদের এখানে মেরু প্রদেশের ভালুকছানা ছিল না। আমরা সবাই চাইলাম তাকে ভালো কিছু খেতে দিতে।

অবশেষে সবাই একমত হলাম, তাকে দেওয়া হবে দুধে সেদ্ধ ভাত আর সিলমাছের চর্বি। ব্যক্তিগত দান হিসাবে কাতিয়া স্থির করলো একটা গাজর আর একটা আপেল তার সঙ্গে যোগ করতে।

সবকিছু যখন তৈরী ফোম্‌কার তখন ঘুম ভাঙলো। আমরা যে রকম গর্বভরে তাকে প্রথম রাত্রের খাবার খেতে দিলাম সেটা যদি তোমরা দেখতে! প্রথমে দুধে সেদ্ধ ভাতটা নিয়ে এলো লিপা, সে ছাত্রী, চিড়িয়াখানায় শিক্ষানবিশী করছে। তারপর গাজর আর আপেল নিয়ে এলো কাতিয়া। তাকে দেখাচ্ছিল খুব বিজ্ঞ আর ভারিক্কি ধরনের। সিলমাছের চর্বি নিয়ে আমি এলাম সবচেয়ে শেষে। সেটা থেকে এমন দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল যে খালি হাতটা দিয়ে আমাকে নাকটা চেপে ধরতে হলো।

খাঁচায় প্রথমে ঢুকলো লিপা। পাত্রটা সে নামিয়ে রাখতে না রাখতেই ফোম্‌কা সেটাকে উল্টে ফেলে শুঁকে গেল কাতিয়ার কাছে। গাজর, আপেল আর বিস্কুট পকেট থেকে বার করলো কাতিয়া। ফোম্‌কা কিন্তু এইসব মুখরোচক জিনিসের ওপর আগ্রহ প্রকাশ করলো না। এখন সে শিকগুলোর কাছে দাঁড়িয়েছিল আমার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে। আমি দরজাটা খুললাম। ভালুকছানাটার পায়ের কাছে বিরাট একটা জেলিমাছের মতো সিলের চর্বিটা গড়িয়ে পড়লো। আমরা ভাবলাম ফোম্‌কা এবার নিশ্চয়ই খাবে। কিন্তু আমরা নিরাশ হলাম। ভালুকছানাটা সাগ্রহে সেই সিলের চর্বিটা ধরে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলো। অন্যান্য জন্তুদের জন্যে যা সব রাঁধা হয়েছিল তার সবগুলো অল্প অল্প করে তারপর আমরা এনে ফোম্‌কার সামনে ধরলাম।

কিন্তু এটাও তার পছন্দ হলো না। ফোম্‌কা সবকিছু শুঁকলো, সবকিছু নাড়াচাড়া করলো, তবে কিছুই খেলো না। প্রথমে আমাদের মনে হলো যে তার খিধে পায় নি। কিন্তু সেই সন্ধেয় খিধের জ্বালায় চিৎকার করা সত্ত্বেও কোনো খাবারই খেলো না, তখন আমরা ডাক্তারকে ডেকে পাঠালাম। ডাক্তার ভালুকছানাটিকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। ফোম্‌কা এমন গর্জন করতে লাগলো আর ক্ষেপে উঠলো যে খাঁচার মধ্যে যেতে ডাক্তারের সাহস হলো না। তার ব্যবহারে প্রত্যেকেই আমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। স্থির করা হলো অপেক্ষা করে দেখা

যাক পরের দিন কী ঘটে।

সমস্ত রাত ধরে ফোম্‌কা গর্জন করলো। যখন সকাল হলো তখনো সে খেতে চাইলো না। আমাকে মাজুরুকের কাছে যেতে হলো। সম্ভবত তার প্রভুকে দেখছে না বলে ফোম্‌কা খেতে চাইছে না?

অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণভাবে ইলিয়া পাভ্‌লোভিচ্‌ আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। তিনি তাঁর পোষা জন্তুটি সম্বন্ধে এতো প্রশ্ন আমাকে করলেন যে তৎক্ষণাৎ তাঁকে হতাশ করতে আমার মন সরলো না। কিন্তু অবশেষে তাঁকে বলতে হলো যে ফোম্‌কা খাচ্ছে না। তিনি আমার কথা শোনার পর হঠাৎ হেসে উঠলেন। ঠিক সেই সময় টেলিফোনের ঘণ্টাটা বাজলো, ইলিয়া পাভ্‌লোভিচ্‌ রিসিভারটা তুললেন — তাঁর জরুরী ডাক পড়েছে। পরে চিড়িয়াখানায় আমার সঙ্গে দেখা করবেন কথা দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

ইলিয়া পাভ্‌লোভিচ্‌ তাঁর কথা রেখেছিলেন। সেই সন্ধেতেই তিনি এলেন হাতে একটা ছোট স্যুটকেশ নিয়ে। আর সোজা গেলেন ফোম্‌কার খাঁচার কাছে। ঐ স্যুটকেশটার মধ্যে কী যে আছে সেই সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না। ইলিয়া পাভ্‌লোভিচ্‌ স্যুটকেশটি তাঁর পাশে রেখে বললেন যে অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি ফোম্‌কাকে সারিয়ে দেবেন। তারপর তিনি একটা বড় ছুরি পকেট থেকে বার করলেন। আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস না করে পারলাম না ছুরিটা কী জন্যে, এবং একজন ডাক্তারকে ডেকে পাঠালে ভালো হয় কি না।

কিন্তু ইলিয়া পাভ্‌লোভিচ্‌ রহস্যজনকভাবে হেসে স্যুটকেশটা খুলে তার ভেতর থেকে একটা টিন বার করলেন। সেই টিনটার উপর লেখা ছিল: ‘ঘন দুধ’। সেটা তিনি ঐ ছুরিটা দিয়ে খুলে ফোম্‌কাকে দিলেন। ফোম্‌কা সেটা তার সামনের থাবা দিয়ে আগ্রহের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে লম্বা লাল জিভটা দিয়ে দুধটা চেটে চেটে খেলো। তারপর সে ঐ টিনটাকে আবার জিভ দিয়ে চাটতে লাগলো, যতক্ষণ না সেটা রুপোর মতো চকচকে হয়ে উঠলো ততক্ষণ ছাড়লো না।

ফোম্‌কা যখন দুধটা খাচ্ছিল ইলিয়া পাভ্‌লোভিচ্‌ তখন আমাদের ফোম্‌কার ‘অসুখের’ কথাটা বিশদভাবে বুঝিয়ে বললেন। এরোপ্লেনে ঐ ভালুকছানাটাকে

ঘন দুধ ছাড়া আর কিছু খাওয়ানো হয় নি, ফলে ওতে সে এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে সে আর অন্য কোনো খাবার খায় না।

ফোম্‌কার এই মুখরোচক খাদ্যের অভ্যেস ছাড়াতে আমাদের খুব বেগ পেতে হয়েছিল। সে ছিল ভারি দুষ্টু, একগুঁয়ের মতো অন্য কোনো খাবারই খেতে চাইতো না। সবকিছুর সঙ্গে আমরা ঘন দুধ মেশাবার পর সে খেতো। সেটার সঙ্গে পরিজ, সুপ এবং এমন কি মাছের তেল মিশিয়ে আমরা ধীরে ধীরে তার ঐ 'অসুখটা' সারালাম, আর মেরু প্রদেশের ভালুকের যে খাবার খাওয়া উচিত সে খাবারে অভ্যেস করালাম।

ফোম্‌কা বন্ধুত্ব পাতালো...

অল্পদিনের মধ্যেই আমরা ফোম্‌কাকে বাচ্চা জন্তুদের এলাকায় যেতে দিলাম। প্রথম তাকে আমরা একলা রাখতাম, কিন্তু একলা ফোম্‌কা খেলতো না। সে পায়চারি করতো আর একলা থাকার জন্যে কাঁদতো করুণ সুরে। তখন আমরা স্থির করলাম তাকে অন্যান্য জন্তুছানাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। সেই ঘেরা জায়গাটায় আমরা শেয়ালছানা, ভালুকছানা, নেকড়েছানা আর র‍্যাকুনছানা ছেড়ে দিলাম। তারা সবাই যখন একসঙ্গে খেলতে লাগলো তখন আমরা ফোম্‌কাকে দিলাম তাদের কাছে যেতে।

ফোম্‌কা তার খাঁচা থেকে এমনভাবে বেরুলো যেন সে কাউকেই দেখে নি। কিন্তু যেভাবে সে সাঁ-সাঁ করে নিশ্বাস ফেলছিল তাই দেখে আর তার ছোট ছোট চোখের চকচকে ভাব থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে সে সবকিছু আর সবাইকেই দেখছে।

অন্যান্য ছানারাও সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেখলো, কিন্তু তাদের প্রত্যেকের উপরই প্রতিক্রিয়া হলো বিভিন্ন ধরনের — নেকড়েছানাগুলো ল্যাজ গুটিয়ে সাবধানে তাকাতে তাকাতে গেল একধারে সরে, র‍্যাকুনগুলোর রোঁয়া এমন খাড়া খাড়া হয়ে উঠলো যে তাদের দেখাতে লাগলো বড় বড় বলের মতো, ব্যাজারগুলো

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে হলো অদৃশ্য। কিন্তু সবচেয়ে ভয় পেলো ধূসর-বাদামী ভালুকগুলো। একসঙ্গে তারা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে চোখ মিটমিট করে একেবারে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো ঐ অপরিচিত শাদা ভালুকটার দিকে। সে যখন তাদের দিকে এগুলো তখন তারা দারুণ আতঙ্কে গর্জন করতে করতে একটা গাছের মগডালে পড়লো চড়ে, তাড়াহুড়োর চোটে একে অন্যকে লাগলো ঠেলতে।

তাদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ছিল শেয়াল আর ডিঙ্গো ছানাগুলো। তারা ভালুকছানাটার মুখের খুব কাছে এলো, কিন্তু যতবারই সে চেষ্টা করে তাদের কাউকে ধরতে তারা তৎপরতার সঙ্গে লাফিয়ে পাশে চলে যায়।

এইভাবে ঐ ঘেরা জায়গাটায় বহু জন্তু থাকা সত্ত্বেও ফোম্‌কা আবার পড়লো একলা হয়ে।

তখন আমরা একটা বাঘের ছানাকে ছেড়ে দিলাম। তার নাম ছিল সিরোৎকা*, কারণ মা ছাড়াই সে বড় হয়ে উঠেছিল।

---

* ছোট অনাথ। — অনুঃ

অন্যান্য ছানারা সিরোৎকার শক্তিশালী থাবা আর তীক্ষ্ন নখকে ভয় করতো, তাই তার কাছ থেকে দূরে থাকতো। কিন্তু ফোম্‌কা সে কথা কী করে জানবে? সিরোৎকাকে আমরা ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ফোম্‌কা ছুটে তার কাছে গেল। নবাগতের দিকে সিরোৎকা থু-থু ফেলে ভয় দেখিয়ে ওঠালো তার থাবাটা। কিন্তু ভালুকছানাটা বাঘের ভাষা বুঝতে পারলো না। সে আরো কাছে গেল, আর পরের মুহূর্তেই খেলো এমন এক কানমলা যে আর একটু হলেই যেতো পড়ে।

এই বিশ্বাসঘাতক আঘাতে ফোম্‌কা খুব চটে উঠলো। মাথাটা নীচু করে সে দারুণ গর্জন ছেড়ে ছুটে গেল অপরাধীর দিকে।

হৈ-চৈ শুনে আমরা যখন দৌড়ে গেলাম তখন বোঝা কঠিন কোথায় বাঘ আর কোথায়ই বা ভালুক। তারা পরস্পরকে দারুণ জোরে আঁকড়ে ধরে মাটির উপর চলেছে গড়িয়ে গড়িয়ে, চারিধারে গোছা গোছা উড়ছে শাদা আর কমলা রঙের রোঁয়া। অবশেষে অতি কষ্টে আমরা বিবাদীদের আলাদা করলাম। ভরলাম তাদের খাঁচায়, কয়েক দিন কাটবার পর আবার তাদের দিলাম বেরুতে।

এইবার তাদের উপর আমরা নজর রাখলাম, কিন্তু মিছে আমরা এতো আশঙ্কা করছিলাম। তারা পরস্পরের শক্তির কথা জানতে পেরে পরস্পরের প্রতি এখন দেখাতো আগের চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা। ফোম্‌কা সিরোৎকার সঙ্গে একেবারেই মিশতো না, আর সে যখন পাশ দিয়ে যেতো তখন সিরোৎকা এমন কি তার থাবাটাও তুলতো না।

অন্যান্য জন্তুছানারাও এখন ফোম্‌কার সঙ্গে একেবারে অন্যরকম ব্যবহার করতে লাগলো। ধূসর-বাদামী রঙের ভালুকগুলো চেষ্টা করতো তার সঙ্গে কুস্তি করতে, নেকড়েছানা ও র‍্যাকুনগুলো আর পালালো না দৌড়ে। কিন্তু তাদের উপর ফোম্‌কার কোনো আগ্রহ ছিল না। শেয়াল আর ডিঙ্গো ছানাদের তাড়া করতে, আর ভালুকছানাদের সঙ্গে কুস্তি করতে তার ভালো লাগতো, কিন্তু স্পষ্টতই সে ছিল তাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী, ফলে তাদের হারাতে তাকে সামান্যই বেগ পেতে হতো। শক্তি পরীক্ষার জন্যে তারই মতো শক্তিশালী কোনো প্রতিপক্ষের তার দরকার ছিল। একমাত্র সেই রকম প্রতিপক্ষ ছিল সিরোৎকা। সেও ফোম্‌কার উপর দেখাতো দারুণ আগ্রহ।

খেলার ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে তারা বন্ধুত্ব পাতালো, আর সপ্তাহ দুই পরে তারা হয়ে উঠলো অবিচ্ছেদ্য।

সমস্ত দিন তারা কাটাতো একসঙ্গে। তাদের খেলাটা লক্ষ্য করা ছিল বেশ চিত্তাকর্ষক। সিরোৎকা ভালোবাসতো লুকিয়ে থেকে হঠাৎ তার সঙ্গীর উপর লাফিয়ে পড়তে। ভালুকছানার ঘাড়ের কাছটা ধরে তাকে খানিক ঝাঁকিয়ে পালাতো দৌড়ে। কিন্তু ফোম্‌কা ভালোবাসতো কুস্তি করতে। বাঘের ছানাটাকে থাবা দিয়ে ধরে সজোরে জড়িয়ে সে চেষ্টা করতো তাকে পেড়ে ফেলতে। ভালুকের আলিঙ্গন থেকে ছাড়া পাওয়া কঠিন, কিন্তু এই ছোট্ট ডোরা-কাটা হিংস্র জন্তুটা কিছুতেই হার মানতো না: তার সামনের থাবা দুটো দিয়ে ফোম্‌কার পেটটা চেপে সে চেষ্টা করতো তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে। ছোট্ট জন্তুদের ঘেরা জায়গাটার চারদিকে সব সময়ই ভিড় জমে থাকতো। দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ বিশেষ করে আসতো এই কুস্তি প্রতিযোগিতা দেখতে।

প্রতিযোগিতাগুলো প্রায়ই শেষ হতো অমীমাংসিতভাবে। কিন্তু একদিন ফোম্‌কা সিরোৎকার উপর এমন বিরক্ত হয়ে উঠলো যে সে তার কাছ থেকে পালিয়ে সেঁধুলো গিয়ে জলে, আর সেখানে বসে বসে নিজেকে করতে লাগলো ঠাণ্ডা, এদিকে সিরোৎকা তাকে নাগালের মধ্যে না পেয়ে চারিদিকে হাঁটছে। বহুক্ষণ ধরে পায়চারি করার পর হঠাৎ সে ধৈর্য হারিয়ে লাফ দিলো! তার পা ফসকে সে পড়লো ঝপাং করে জলে। এবার সে ফোম্‌কার হাতে বেশ ভালো রকম শাস্তি পেলো। বাঘটার চেয়ে ফোম্‌কা জলের মধ্যে অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল। এক মিনিট কাটতে না কাটতে সিরোৎকাকে জড়িয়ে ধরে তাকে জলের তলা দিয়ে টেনে নিয়ে চললো। আর একটু হলেই সিরোৎকা ডুবে মরতো। চুরচুরে হয়ে ভিজে আর দারুণ ভয় পেয়ে ভালুকের আলিঙ্গন থেকে সিরোৎকা নিজেকে ছাড়িয়ে লজ্জিত মুখে পালালো তার খাঁচায়। এ ঘটনার পর থেকে ফোম্‌কা যখন জলের মধ্যে থাকতো তখন সিরোৎকা ডোবাটার খুব কাছে যেতে ভয় পেতো, আর সে কাছে থাকলে এমন কি জল পানও করতো না।

তবে উক্ত ঘটনাটা তাদের বন্ধুত্বকে একেবারেই ব্যাহত করে নি। আগের মতোই তারা দিনের প্রায় সবটাই কাটাতো একসঙ্গে খেলা করে।

ফোম্‌কা বিপজ্জনক হয়ে উঠলো

শরৎকালের মধ্যে ফোম্‌কা অবিশ্বাস্য রকম বড় হয়ে উঠলো। তাকে দেখলে বহু কষ্টে সেই ভালুকছানাটা বলে চিনতে পারা যায়। তখনো সে এই ঘেরা জায়গাটার অন্যান্য জন্তুদের সঙ্গে খুব ভালো মানিয়ে চলে, দুর্বল জন্তুদের কখনো লাগিয়ে দেয় না। আর সিরোৎকার সঙ্গেও তার বন্ধুত্ব বজায় আছে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে আগে সে যে রকম ভালো ব্যবহার করতো অতটা আর করে না। আগে সব সময়ই সে কথা শুনতো, কিন্তু এখন সে এমন কি কাতিয়াকেও তার উপর আদেশ জারি করতে দেয় না।

বেচারা কাতিয়া! যখন ফোম্‌কা চাইতো না তখন তাকে খাঁচার মধ্যে ঢোকাবার জন্যে কাতিয়াকে নানা রকম ফন্দির আশ্রয় নিতে হতো।

সাধারণত জন্তুছানাদের খাঁচার মধ্যে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় খাবার দিয়ে। খাঁচার মধ্যে এক টুকরো খাবার রাখার সঙ্গে সঙ্গেই তারা সেগুলোর মধ্যে যায় ছুটে। কিন্তু ফোম্‌কাকে লোভ দেখানো যায় না। তার পেটটা সব সময়ই খাবারে ঠাসা, একটা ঢাকের মতো শক্ত। যেকোনো ছোটোখাটো ব্যাপারে তাকে সামান্য সামান্য খাবার দেওয়া হয়: বেড়াটার কাছ থেকে দূরে থাকার জন্যে, খাঁচা পরিষ্কার করার সময় কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি না করার জন্যে, এমন কি না কামড়াবার জন্যে। ফোম্‌কার মুখের ভাবটা শুধু একটু অদ্ভুত করা দরকার, তাহলেই যেকোনো পরিচারক তার জন্যে নিশ্চয়ই ভালো কিছু খাবার ছুঁড়ে দেবে। যেহেতু সব রকম ছোটোখাটো কাজের দাম তাকে দেওয়া হতো খাবার দিয়ে, সেহেতু দিনের শেষে তার পেটটা এতো ভরা থাকতো যে তাকে সবচেয়ে ভালো টুকিটাকি জিনিস দিয়েও খাঁচার মধ্যে লোভ দেখিয়ে আনা যেতো না।

ফোম্‌কাকে প্রলুব্ধ করার জন্যে কাতিয়া কী যে না করতো! তাকে ভুলিয়ে খাঁচার মধ্যে আনার জন্যে তার অনেক সময় যেতো। ফোম্‌কা ছিল দারুণ কৌতূহলী ভালুক। যেই সে কোনোকিছু অপরিচিত জিনিস দেখতো সে মুহূর্তে কাছ থেকে ভালো করে দেখার জন্যে সে ছুটে যেতো।

কাতিয়া স্থির করলো, ফোম্‌কার এই দুর্বলতার সুযোগ নিতে হবে। সে খাঁচার মধ্যে গিয়ে রুমাল, জ্যাকেট কিম্বা ও ধরনের কিছু মেঝের উপর ছুঁড়ে দিতো। তারপর সে ভাণ করতো যে জিনিসটা খুবই চিত্তাকর্ষক, সেটাকে সে ছুঁতো, কুড়িয়ে নিতো। মাঝে মাঝে এ কাজ তাকে করতে হতো অনেকক্ষণ ধরে, ব্যাপারটা নির্ভর করতো ফোম্‌কার মেজাজের উপর। কিন্তু কখনো সঙ্গে সঙ্গে সে যেতো খাঁচাটার মধ্যে। কাতিয়া তখন নিপুণভাবে ছোঁ মেরে টোপটাকে তার নাকের তলা থেকে তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতো। কিন্তু সব সময় এ ব্যাপারটা সফল হতো না। মাঝে মাঝে কাতিয়া খুব তাড়াতাড়ি জিনিসটাকে সরাতে পারতো না, ফোম্‌কা তখন সেটার ব্যবস্থা করতো তার নিজস্ব ধরনে।

কিন্তু চালাক ফোম্‌কা এই ছলনাটা অল্পদিনের মধ্যেই ধরে ফেললো। এই মাঝারি বড় ভালুকটার সঙ্গে এঁটে ওঠা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠতে লাগলো। একবার সে এক পরিচারককে বিশ্রীভাবে কামড়ে দেবার পর স্থির হলো যে তাকে ‘জন্তুদের দ্বীপে’ স্থানান্তরিত করা হবে। ফোম্‌কাকে বিদায় দিতে আমাদের খারাপ লেগেছিল, কিন্তু উপায় ছিল না। ঘেরা জায়গাটায় তাকে রাখা খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল।

‘জন্তুদের দ্বীপে’ ছিল একটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে একটা বড় আর গভীর ডোবা। ছুটোছুটি করার, খেলার এবং স্নান করার প্রচুর জায়গা ছিল। তাই ফোম্‌কাকে রাখা হলো সেইখানে।

নতুন জায়গায় নিজেকে আবিষ্কার করে ফোম্‌কা দারুণ ভয় পেয়ে গেল। সেই খোলা জায়গাটায় আছড়ে পড়ে করুণভাবে গর্জন করতে করতে সে পালাবার পথ খুঁজতে লাগলো। কিন্তু পালাবার পথ ছিল না। ফোম্‌কা তখন এক কোণে পাকিয়ে শুয়ে রইলো, এমন কি খাবার জন্যেও বেরিয়ে এলো না। জন্তুছানাদের ঘেরা জায়গাটায় থাকার পর, যেখানে ছিল তার অতগুলো সঙ্গী, একেবারে একা পড়ে তার মন কেমন করতে লাগলো। সে পায়চারি করতো, খেলা একেবারে থামিয়ে দিলো। কিন্তু বেশীদিন তাকে একলা থাকতে হয় নি। অল্পদিনের মধ্যেই মাশ্‌কা নামে আর একটা ভালুককে চিড়িয়াখানায় এনে ফোম্‌কার সঙ্গে রাখা হলো। সে

ছিল ফোম্‌কার চেয়ে অনেক ছোট, কিন্তু ফোম্‌কা তাকে আঘাত করতো না। সস্নেহে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে করতে সে তাকে শুঁকতো, আর একসঙ্গে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তো জলে। সমস্ত দিন তারা সাঁতার কাটতো আর খেলতো। রাত হলে এই ভালুকছানারা পরস্পরকে থাবা দিয়ে জড়িয়ে অকাতরে ঘুমতো।

ফোম্‌কা এখন খুব খুসি হয়ে উঠলো। তার নতুন বান্ধবী — শাদা ভালুকছানা মাশ্‌কার সঙ্গে সে দিন কাটাতে লাগলো পরম সুখে।

ভোঁদড়ছানা নায়া

পালিত শিশু

নায়া ছিল এক ভোঁদড়ছানা। তার শরীরটা ছিল এতো লম্বা আর নমনীয় যে মনে হতো বুঝি তার দেহে কোনো হাড়গোড় নেই; তার মাথাটা ছিল সাপের মতো থ্যাবড়া আর তার ছোট ছোট চোখগুলো ছিল পুঁতির মতো। এসব কথা শুনে মনে হতে পারে যে নায়া বুঝি ছিল একটা কুৎসিত ছোট জন্তু। কিন্তু তা নয়। তার নরম লোমগুলোর জন্যে তাকে এতো মিষ্টি দেখাতো যে তার গায়ে হাত বোলাতে ইচ্ছে হতো।

নায়া যখন খুব ছোট্ট, তখন আমি তাকে নিয়েছিলাম। এই ধরনের বাচ্চা ভারি কষ্ট দেয়: তাকে খাওয়াতে হয় দিনে আর রাতে, আর শীত করলে তাকে দিতে হয় গরম জলের বোতল। তখন আমি ছুটিতে ছিলাম। থাকতাম সহরতলীতে, মস্কোর কাছে। নায়াকে আমার খুব ভালো লেগেছিল। তাই আমি স্থির করেছিলাম তাকে পুষ্যি নিয়ে আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো সহরতলীতে।

রেলের কামরাতে খুব ভিড় ছিল। বহু কষ্টে একটা ফাঁকা জায়গা দেখে আমি বসলাম। চুপ্‌ড়ির মধ্যে পাকিয়ে গোল একটা বল হয়ে ভোঁদড়ছানাটা গভীরভাবে ঘুমচ্ছিল। চুপ্‌ড়িটাকে আমার পাশে রেখে আমি ঢুলতে লাগলাম। একটা তীক্ষ্ন শীসের শব্দে আমি উঠলাম জেগে। আমার পাশের একটি মেয়ে জোরে চেঁচিয়ে উঠে দ্রুত সরে গেল। কামরার প্রত্যেকেই আমার দিকে তাকালো। যখন দ্বিতীয় শীস শোনা গেল তখন আমিই শুধু বুঝলাম কী ঘটেছে। দেখা গেল উত্তেজনার কারণ হচ্ছে ছোট্ট নায়া। চুপ্‌ড়ির মধ্যে বসে থাকতে আর ভালো লাগছিল না তার। সে লাফিয়ে বাইরে এসে তার মা'কে ডাকছে শীস দিয়ে।

তাকে চুপ্‌ড়ির মধ্যে ভরে আমি গেলাম পরের কামরায়। বাকি পথটায় আর কোনো অঘটন ঘটলো না।

নায়াকে দেখে আমাদের পরিবারে সবচেয়ে খুসি হলো আমার ছোট্ট ছেলে তলিয়া। সে একটা বইতে পড়েছিল যে ভোঁদড়রা চমৎকার সাঁতার কাটে আর মাছ ধরে। এখন সে কী খুশি! তার নিজেরই একটা সত্যিকারের বাচ্চা ভোঁদড় হলো। সে আমাদের আশ্বাস দিয়ে বললো যে নায়া যখন বড় হবে তখন সে তার জন্যে ধরবে মাছ।

নায়ার দেখাশোনার ভার তলিয়া নিলো। তার বিছানার পাশের কোণে নায়ার জন্যে সে বানালো একটা গরম আর আরামের বাসা, দিলো তাকে খানিকটা দুধ, আর শোয়ালো তাকে বিছানায়। ঠিক মানুষের মতো একটা থাবা মাথার তলায় দিয়ে, পাশ ফিরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নায়া পড়লো ঘুমিয়ে। প্রায় সর্বদাই সে এইভাবে নয়তো চিৎ হয়ে শুয়ে তার থাবাগুলোকে পেটের উপর ভাঁজ করে ঘুমতো। তলিয়া তাকে ঢেকে দিতো ছোট একটা কম্বল দিয়ে, তাকে দেখাতো ভারি অদ্ভুত।

অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে নায়ার ভাব হয়ে গেল: আমাদের প্রত্যেককেই সে চিনতে পারতো আমাদের স্বর আর পায়ের শব্দ শুনে। যে মুহূর্তে কেউ দরজার কাছে যেতো সে ছুটে আসতো পাখীর মতো কিচ মিচ্ করে আনন্দ জানিয়ে। নায়া ছিল স্নেহশীল আর হাসিখুসি ছোট্ট একটি জন্তু। সে প্রায় সব সময় কাটাতো খেলা করে — ডিগবাজি খেতো আর চেষ্টা করতো নিজের ল্যাজটাকে ধরতে। তার প্রিয় খেলার জিনিস ছিল তলিয়ার লোমের কুকুরটা। সেটার উপর সে ঝাঁপিয়ে পড়তো যেন সেটা শিকার, তার বড় বড় নরম কানগুলো টানতে টানতে নিয়ে যেতো, নিজের লম্বা ল্যাজটা খাড়া করে যেতো ছুটে চলে, আবার ছুটে আসতো ওটার দিকে। কিম্বা চিৎ হয়ে শুয়ে সে কুকুরটাকে জড়িয়ে

ধরতো তার সামনের থাবাগুলো দিয়ে আর ভাণ করতো যেন তার সঙ্গে সে কুস্তি করছে। মনে হতো তার থাবাগুলোর মধ্যে কুকুরটা যেন বেঁচে উঠেছে: লাফাচ্ছে, আক্রমণ করছে আর পালাচ্ছে। ক্লান্ত হয়ে পড়লে নায়া ঘুমিয়ে পড়তো তার খেলনাটার পাশে। সেটাকে তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হলে সেটার জন্যে তার মন কেমন করতো। মৃদু স্বরে ঘ্যান ঘ্যান করতে করতে সমস্ত ঘরময় সেটাকে সে খুঁজে বেড়াতো।

জন্মগত স্বভাব

নায়া যখন একটু বড় হয়ে উঠলো তাকে আমরা দুধ ছাড়া মাছও দিতে শুরু করলাম। প্রথমে মাছটার কাঁটা ছাড়িয়ে ছোট ছোট করে কেটে তাকে দিতাম, তার অল্পদিন পরে দিতাম গোটা মাছ, আর অবশেষে দিতাম জ্যান্ত মাছ। যেসব ছেলেমেয়েদের বাচ্চা ভোঁদড়টার উপর খুব আগ্রহ ছিল তারা তার জন্যে নিয়ে আসতো মাছের পোনা। তারা ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকতো আমাদের বাড়ীর সামনে যতক্ষণ না কেউ নায়াকে নিয়ে বেড়াতে বেরোয়।

নায়া ছেলেমেয়েদের ভালোবাসতো, তাদের সঙ্গে খেলতো, কখনো তাদের কামড়াতো না। অল্পদিনের মধ্যেই তার অনেক বন্ধু হয়ে গেল। আমি বাড়ী ফিরে দেখতাম দরজার উপর সব জায়গায় মাছের পোনার গোছা আর ছোট ছোট চিঠি ঝুলছে: 'নায়াকে। কলিয়া', 'নায়া যেন এগুলো খেয়ে বড় হয়ে ওঠে। স্তিওপা ইভানোভ', 'ভ. ফেদোসিয়েভ এই পোনাগুলো এনেছিল'... এক কথায়, প্রত্যেকটা গোছার সঙ্গেই থাকতো একটা করে চিঠি। জ্যান্ত পোনাও আসতো। সেগুলো আসতো জলে ভরা কাঁচের জারে। তাদের রেখে দেওয়া হতো দোর গোড়ায়। বাড়ী থেকে বেরিয়ে ক্রমাগত আমার পা পড়তো জারের উপর, পোনাগুলো ছুটে যেতো একদিকে, আর জারটা অন্যদিকে। জলটা পড়তো সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে।

জ্যান্ত মাছ খেতে নায়া ভারি ভালোবাসতো। আমরা একটা গামলার মধ্যে জল ভরে তাতে কিছু পোনা ছেড়ে দিতাম। গামলার মধ্যে মাছ দেখলে নায়াকে ধরে রাখা যেতো না। বাইনমাছের মতো আমাদের হাত থেকে কিলবিল করে বেরিয়ে চারদিকে জল ছিটিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়তো গামলার মধ্যে। আমরা বুঝতে

পারতাম না কোনটা মাছ আর কোনটা ভোঁদড়, ভয়ঙ্কর টল্‌মল্‌ করা গামলাটা ছাড়া আর কিছুই পেতাম না দেখতে। মাছটা যত ছোটই হোক না কেন নায়া তাকে ঠিক ধরতোই।

সাঁতার কাটার পর সর্বদাই নায়া তার গা মুছতো, সাধারণত তলিয়ার বিছানার চাদরে। বিছানার ঢাকার তলায় সেঁধিয়ে সে গড়াগড়ি খেতো যতক্ষণ না তার গা'টা শুকোয়। বিছানার চাদর-টাদর হয়ে যেতো ভিজে চুরচুরে! দিনের মধ্যে একাধিকবার সেগুলোকে শুকতে হতো। পরে তার মাথায় ঢুকেছিল যে সে তলিয়ার সঙ্গে ঘুমবে। নোংরা আর ভিজে গায়ে সে গুটিসুটি ঢুকতো চাদরগুলোর ভিতরে আর শুতো তার গা ঘেঁষে। কী বিপদেই না পড়া গেল! তার এই অভ্যেসটা ভাঙবার জন্যে তলিয়া সব রকম চেষ্টা করেছিল: শোয়ার আগে নিজেকে সে আড়াল করতো চেয়ার আর তক্তা দিয়ে। তার ঘরটা হয়ে উঠতো রীতিমতো একটা দুর্গের মতো, ভিতরে ঢোকা ছিল কঠিন ব্যাপার। কিন্তু অত সহজে নায়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। যদি সে কোনো ফাঁক দিয়ে ঢোকা অসম্ভব দেখতো তাহলে এমন হৈ-চৈ বাধাতো যে আমরা সবাই উঠতাম জেগে। আর তলিয়াকে বিছানা থেকে বেরিয়ে তাকে আনতেই হতো ভিতরে।

সব ভোঁদড়দের মতোই নায়া ভালো করে দেখতে পেতো না। একথা জানতে পেরে তলিয়া তাকে অন্যমনস্ক করে এক লাফে বিছানার মধ্যে ঢুকে একেবারে স্থির হয়ে শুয়ে থাকতো। নায়া তার লম্বা গলাটা তুলে সামান্যতম খস্‌খস্‌ শব্দ শুনে চেষ্টা করতো সে কোথায় আছে সেটা আবিষ্কার করতে।

নায়ার শ্রবণশক্তি ছিল তীক্ষ্ন। তলিয়া যদি না নড়তো তাহলে সে একবার কি দুবার শীস দিয়ে অপেক্ষা করতো, কোনো উত্তর না পেলে সে ঘুমতে যেতো তার নিজের জায়গায়। কিন্তু তলিয়া যদি একটুখানিও নড়তো তাহলে নায়া তার কাছে ছুটে গিয়ে কাকুতি মিনতি করতো তাকে তার বিছানার মধ্যে নেবার জন্যে।

একলা থাকতে নায়ার খুব খারাপ লাগতো। আমরা যখন বেড়াতে যেতাম তখন সে এমন চিৎকার করতো যে তাকে আমাদের সঙ্গে নিতে হতো।

নায়া বেড়াতে ভালোবাসতো। কুকুরের বাচ্চার মতো ছুটতো সে

আমাদের পিছন পিছন, সব সময়ে থাকতো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। তাকে নিয়ে আমরা সব জায়গায় যেতাম। কিন্তু নদীর কাছে যেতে ভয় পেতাম: পাছে জল দেখে নায়া ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আর ফিরে না আসে।

একদিন আমরা তাকে নিয়ে গেলাম বনে। অলপক্ষণের মধ্যেই ছোট ছোট পায়ে আমাদের পিছন পিছন ছুটে ক্লান্ত হয়ে পড়ে নায়া অনুনয় বিনয় করতে লাগলো তাকে তার চুপ্ড়ির মধ্যে রাখার জন্যে। চুপ্ড়িটার ভিতর সে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে। পথে আমরা প্রচুর ব্যাঙের ছাতা দেখলাম, ভেবে পেলাম না কোথায় সেগুলোকে রাখবো। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সেগুলোকে আমরা রাখলাম চুপ্ড়িতেই, যতক্ষণ না নায়া সম্পূর্ণ ঢেকে গেল ততক্ষণ চুপ্ড়ি ভরেই চললাম।

দিনটা ছিল রোদে ভরা, খুব গরম। আমরা স্থির করলাম স্নান করতে যাবো, একেবারেই ভুলে গেলাম যে চুপ্ড়ির মধ্যে ব্যাঙের ছাতার তলায় একটা ভোঁদড় রয়েছে ঘুমিয়ে। আমরা নদীর কাছে গিয়ে জামাকাপড় খুলতে শুরু করলাম। অকস্মাৎ চুপ্ড়িটা নড়তে লাগলো, ব্যাঙের ছাতাগুলো মাটির উপর ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে, আর কী ঘটেছে আমি বুঝতে পারার আগেই নায়া পেণছে গেল নদীর তীরে।

'নায়া! নায়া! নায়া!' — তলিয়া আর আমি চিৎকার করে উঠলাম!

কিন্তু নায়া একবার ঘাড়ও ফেরালো না। চক্ষুর নিমেষে সে জলের পাশে গিয়ে একেবারে ঝাঁপ দিলো নদীর মধ্যে। খানিকক্ষণ আমরা তাকে দেখতে পেলাম, তারপর সে ডুব দিয়ে অদৃশ্য হলো। আমরা তাকে ডাকতে ডাকতে নদীর তীর দিয়ে ছুটতে লাগলাম। নায়াকে কোথাও দেখা গেল না।

আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মুষড়ে পড়লো তলিয়া। নায়াকে না নিয়ে বাড়ী ফেরার কথা সে সহ্য করতে পারলো না। ক্রমাগত সে নদীর তীর ধরে ছুটে চললো তার খোঁজে।

দিন শেষ হয়ে আসছিল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। আমরা ফিরতে যাচ্ছি এমন সময় নায়ার তীক্ষ্ন শীস গেল শোনা নদীর উজানের খানিকটা দূরে।

'নায়া, নায়া, নায়া!' — আমরা সবাই একসঙ্গে সানন্দে চিৎকার করে উঠলাম।

শীসটা ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসতে লাগলো। আর অকস্মাৎ নায়াকে দেখা গেল, নদীর একটা বাঁক থেকে থাবা দিয়ে জোরে জোরে জল কেটে আসছে। সে এতো তাড়াতাড়ি সাঁতরে আসছিল যে মনে হচ্ছিল সে যেন জলের উপর দিয়ে উড়তে উড়তে আসছে। মাঝে মাঝে তার মাথাটা এপাশ ওপাশ ঘোরাচ্ছে। আর থেকে থেকে তীক্ষ্ন শীস দিচ্ছে আর লাফাচ্ছে।

কাপড়চোপড় খুলে ফেলে দৌড়োতে দৌড়োতে তার কাছে যাবার জন্যে তলিয়া সোজা জলে ঝাঁপ দিলো। তাকে দেখতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে নায়া সাঁতরে এলো তার কাছে। সে তার আনন্দটা চাপতে পারলো না! তলিয়ার কাঁধের উপর সে চড়ে বসলো। ডুব দিলো তার তলায়, আর তার মুখে নিজের গা'টা ঘষতে লাগলো আদরের ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করতে করতে। তারপর তারা দুজনে হামাগুড়ি দিয়ে তীরের উপর উঠলো। নায়া গেল ঘাসের উপর পড়ে থাকা জামাকাপড়ে নিজের গা'টা মুছতে। তলিয়ার নতুন স্যুট জড়িয়ে সে গড়ালো, তাতে লেগে গেল ভিজে ময়লা দাগ, কিন্তু কেউ তাকে বকলো না। সেদিন থেকে আমরা স্নান করার সময় নায়াকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম, কেউই আর ভয় পেতো না যে সে সাঁতরে পালিয়ে যাবে।

চিড়িয়াখানায়

গ্রীষ্মের গরম দিনগুলো শেষ হয়ে আসছিল। এলো শরৎ। মস্কোতে আমরা ফিরলাম আমাদের সঙ্গে নায়াকে নিয়ে। সহরতলীর স্বাধীনতার পর সহরের ছোট ফ্ল্যাটে ভোঁদড়টার মন খারাপ হয়ে গেল। সে ঘ্যান ঘ্যান করতো, ক্রমাগত অনুনয় করতো তাকে করিডরে ছেড়ে দেবার জন্যে, তারপর ঘরে ফিরে এলে যে স্বাধীনতায় সে অভ্যস্ত হয়েছিল তার জন্যে আবার তার মন কেমন করতো। এখন তাকে টবে স্নান করতে হয়। স্নানের পর নায়া বিছানা কিম্বা হাতলওলা চেয়ারে ওঠে গা মোছার জন্যে। তাকে বাড়ীতে আর রাখা অসম্ভব হয়ে উঠলো। তাছাড়া তলিয়া ইস্কুলে যেতে শুরু করেছিল, তাকে দেখাশোনা করার কেউ ছিল না।

নায়াকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে হলো। তলিয়াকে ছাড়াই আমি নিজে তাকে নিয়ে গেলাম। চিড়িয়াখানায় একটা বড়সড় খাঁচার মধ্যে নায়াকে রাখা হলো, তার ভিতরে ছিল বড় একটা গভীর ডোবা। মনে হলো তার নতুন বাড়িতে এসে সে খুব খুসি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে জলে ঝাঁপ দিলো, ডুব দিলো, ডিগ্‌বাজি খেলো, আর সাঁতরাতে লাগলো। তারপরে আমি নিঃশব্দে খাঁচা থেকে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু আমি যখন নিঃশব্দে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম নায়া শুনতে পেয়ে জল থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো। প্রথমে সে চেষ্টা করলো শিকগুলোর ভিতর দিয়ে গলে বেরুতে, শিকগুলো কামড়াতে লাগলো। তারপর সে তার সমস্ত শরীরটা ঠাণ্ডা লোহার শিকে চেপে ধরে শুরু করলো তীক্ষ্ন গলায় কাঁদতে।

কিছুদিন তলিয়া কিম্বা আমি চিড়িয়াখানায় গেলাম না। এই বিচ্ছেদের জন্যে তলিয়ার খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বাড়ীর চেয়ে চিড়িয়াখানায় নায়া আনন্দে থাকবে শুধু এই ধারণাই তলিয়াকে শান্তি দিতো। তার জন্যে সে এতো দুঃখ পেয়েছিল যে আমি যখন দু'মাস পরে চিড়িয়াখানায় গেলাম তখন সে এমন কি আমার সঙ্গে যেতে চাইলো না:

'আমি নিশ্চয়ই কেঁদে ফেলবো। আমার না যাওয়াই ভালো।'

তাই আমাকে একলাই যেতে হলো।

চিড়িয়াখানায় ঢুকে আমি তাড়াতাড়ি নায়ার খাঁচার কাছে গিয়ে এমনভাবে দাঁড়ালাম যাতে সে আমাকে দেখতে না পায়। ঠিক তখনই পরিচারক গেল খাঁচার মধ্যে। নায়া তার কাছে দৌড়ে গিয়ে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে খাবার চাইতে লাগলো। পরিচারক তার বালতি থেকে একটা বড় মাছ বার করে ছুঁড়ে দিলো জলের মধ্যে। নায়া সঙ্গে সঙ্গে সেটা ধরে জল থেকে তুলে খেতে শুরু করলো। তারপর এমন চুপি চুপি তাকে ডাকলাম যে আমি নিজেই নিজের স্বর প্রায় শুনতে পেলাম না।

নায়া চমকে উঠে মাথাটা সামান্য তুলে একাগ্র হয়ে শুনতে লাগলো। আমি চুপ করে রইলাম। নায়া কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে উঠে থামলো, যেন উত্তরের জন্যে করতে লাগলো অপেক্ষা। ভিড়ের মধ্যে আমাকে তার ছোট ছোট চোখগুলো অস্থিরভাবে খুঁজতে লাগলো। আমি নিজেকে আর সামলাতে না পেরে ছুটে গেলাম খাঁচাটার কাছে, আর নায়া ছুটে এলো আমার কাছে। সে শিকগুলোর ভিতর দিয়ে তার থাবাটা বার করে আমার হাতটা ধরতে চেষ্টা করলো। তারপর থেকে প্রতিদিন তাকে আমি দেখতে যেতাম।

পরিচারক যখন আমার জন্যে দরজা খুলে দিলো তখন নায়া অসহিষ্ণু হয়ে কিচকিচ করতে করতে তার সামনে করতো ছুটো-ছুটি। তারপর সে আমার কোলে চড়ে নানাভাবে তার ভালোবাসা প্রকাশ করে খেলতে শুরু করতো। তখন শীতকাল। তার গ্রীষ্মকালের খেলার চেয়ে এখনকার খেলাগুলো একেবারে অন্য রকম। তার ডোবাটা মোটা এক পর্দা বরফে ঢেকে গেছে, কিন্তু তাতে তার স্নানের বাধা ঘটতো না।

ঠিক আগের মতোই জলের মধ্যে সে ঝাঁপাতো, আমাকে আমন্ত্রণ জানাতো তাকে অনুসরণ করার জন্যে। ডুব দিতো একটা গর্তে আর বেরিয়ে আসতো অন্য একটা থেকে। কিম্বা সে হয়তো উঠতো একটা ছোট ঢিবির উপর, তারপর পেটের উপর ভর দিয়ে আসতো পিছলে নেমে। ডোবাটার ঠিক পাশে নায়া নিজে বানাতো বরফের ঢিবি। জল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে চুরচুরে ভেজা গা'টা না ঝেড়ে সে হামাগুড়ি দিয়ে উঠতো বরফের ঢিবির উপর। তার গা থেকে জলের ধারা ঝরে

নীচের দিকে গড়িয়ে আসতে আসতে যেতো জমে। জল থেকে বরফের ঢিবিতে সে ক্রমাগত করতো যাতায়াত যতক্ষণ না সেটা পিছল হয়ে ওঠে। এই পিছল জায়গাটার উপর নায়া স্লেজ গাড়ীর মতো নামতো পিছলে পিছলে। উপুড় হয়ে কিম্বা চিৎ হয়ে শুয়ে ঢিপি থেকে সে পিছলে নামতো জলে। এমন কি তার দিকে তাকালেই শীত করতো। আমি দাঁড়িয়ে আছি আমার নাকটা কোটের কলারের মধ্যে গুঁজে, আর নায়া ঠাণ্ডাকে একটুও গ্রাহ্য না করে স্নান করছে, যেন সেটা গ্রীষ্মকাল। তার চকচকে লোমগুলো এতো মসৃণ আর ঘন যে তাতে জল আটকে থাকতো না। লাফিয়ে বেরিয়ে গা ঝাড়া দিলেই আবার সে শুকনো হয়ে যেতো।

যাতে তার গর্তগুলো জমে না যায় সে বিষয়ে নায়া খুব সতর্ক ছিল। সেগুলো যদি জমতে শুরু করতো তাহলে বরফের আবরণটাকে সে ভাঙতো তার মাথা দিয়ে কিম্বা কামড়াতো তার ধারগুলো। তাছাড়া বরফের মধ্যে বাতাস চলাচলের জন্যে তার ছিল নানা ফুটো, সেগুলো ছিল খুব ছোট ছোট, সেগুলোর ভিতর দিয়ে বরফের তলায় সে নিঃশ্বাস নিতো। প্রথমে আমি সেগুলোর কথা কিছুই জানতাম না। কিন্তু একদিন নায়া জলের তলায় অনেকক্ষণ ধরে রইলো। আমার দুর্ভাবনা হতে লাগলো: ভয় হলো হয়তো কিছু ঘটেছে। তাকে আমি খুঁজতে শুরু করলাম। অকস্মাৎ আমি দেখতে পেলাম এক জায়গায় বরফ সামান্য গলেছে আর তার ভিতর থেকে উঠছে বাষ্প। আমি কাছে গিয়ে শুনতে পেলাম বরফের নীচে নিঃশ্বাস নেবার ভারি শব্দ। নায়া লুকিয়ে ছিল আমার কাছ থেকে, ছোট ফুটোটার কাছে সে তার নাকটাকে রেখেছিল চেপে। পরে আমি একাধিক এ ধরনের ছোট ছোট ফুটো আবিষ্কার করেছিলাম। সেগুলো ছিল খুব ছোট, কিন্তু খুব ঠাণ্ডার সময়ও তা জমে যেতো না, কারণ যাতে তার বরফের এলাকাটা জমে না যায় তার জন্যে সব সময় নায়া খুব মেহনৎ করতো।

বরফের মধ্যে নায়া ঘুমবার জন্যে একটা গর্ত বানিয়েছিল। আর একটা সুড়ঙ্গ করেছিল সোজা জল পর্যন্ত। বরফ খুঁড়তে সে খুব ভালোবাসতো।

আমার ছুটির দিনে নায়াকে আমি নিয়ে যেতাম বেড়াতে। চিড়িয়াখানার বড় পুকুরের পাশের রাস্তা ধরে আমরা হাঁটতাম। পুকুরটা ছিল রেলিঙ দিয়ে ঘেরা, কিন্তু কোনো কারণে নায়া সেটার ভিতর ঢুকতে চেষ্টা করতো না। সে সবচেয়ে
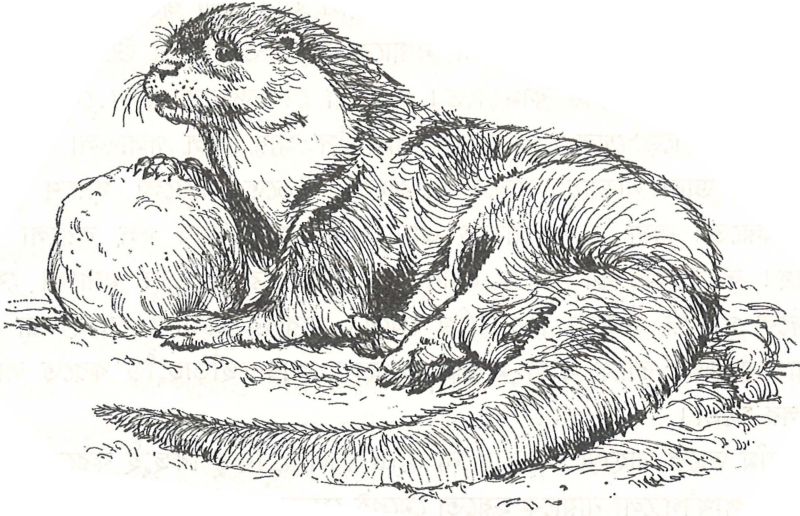
ভালোবাসতো বায়ুতাড়িত তুষার রাশির মধ্যে গর্ত করতে। মাঝে মাঝে আমি পথ ধরে যেতাম আর সে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসতো তুষারের ভিতর দিয়ে। কিন্তু আমি অন্য পথ ধরলেই তুষার ঠেলে নায়া বেরিয়ে দৌড়োতো আমার পাশে পাশে।

কী করে যে গভীর তুষারের ভিতর থেকে সে শুনতে পেতো আমি অন্য পথ ধরেছি — একথা ভেবে আমি অবাক হতাম।

নায়া ভালোবাসতো তুষারের বল বানাতে, বিশেষ করে যখন নরম টাট্‌কা তুষার থাকতো। ছোট একটা তুষারের তাল দেখলে সে তার নাকের ডগা দিয়ে সেটাকে গড়াতে শুরু করতো, এবং গড়াতো যতক্ষণ না সেটা একটা বড় বল হয়ে ওঠতো। মাঝে মাঝে সেটা এতো বড় হয়ে উঠতো যে নায়া সেটাকে সরাতে পারতো না। তখন সেটার উপর সে ঝাঁপিয়ে পড়তো, কামড়াতো সেটাকে আর ভেঙে ফেলতো তার থাবা দিয়ে। তারপর সে শান্ত হয়ে আবার দৌড়োতো আমার পেছন পেছন।

নায়া বেড়াতে ভালোবাসতো। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সেটা বন্ধ করতে হলো। একদিন যথারীতি আমরা যখন পুকুরের পাশ দিয়ে হাঁটছি নায়া তখন রেলিঙগুলোর তলা দিয়ে গুড়ি মেরে একটা গর্তের দিকে গেল ছুটে। আমি

দারুণ ভয় পেয়ে গেলাম। পাতিহাঁস, রাজহাঁস আর নানা জলের পাখী গর্তটার চারিদিকে সাঁতার কাটছিল। তারা নায়াকে দেখে ভয় পেয়ে উড়ে যেতে পারে, কিম্বা নায়া পারে তাদের কামড়াতে। পাখীরা ভোঁদড়টাকে যখন দেখলো তখন দারুণ হৈ-চৈ পড়ে গেল। পাতিহাঁস, রাজহাঁস আর লাল গলাওলা বার্নাক্‌ল্‌ পাখীগুলো ডানা নাড়তে নাড়তে চারিদিকে উড়তে লাগলো দারুণ চিৎকার করতে করতে। নায়া ফিরে আসছে এমন সময় রাজহাঁসের দল করলো তাকে আক্রমণ। তাদের একটা তাকে এমন জোরে ডানার ঝাপ্‌টা মারলো যে সে অন্যদিকে গড়িয়ে পড়লো ডিগ্‌বাজি খেয়ে। তারপর অন্যান্য রাজহাঁসরা তাকে করলো আক্রমণ। তাকে তারা মারতে লাগলো, আর ছোঁড়াছুঁড়ি করতে লাগলো ফুটবলের মতো।

আমি তাকে সাহায্য করার জন্যে ছুটে গেলাম, কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। রাগী পাখীগুলো নায়াকে হয়তো মেরেই ফেলতো যদি না একটা আঘাতে সে গড়িয়ে পড়তো জলের মধ্যে।

কয়েক বার সে চেষ্টা করলো আমার কাছে আসতে, কিন্তু যখনই তার মাথাটা জল থেকে ওঠে তখনই রাজহাঁসের দল তাড়া দেয় তাকে।

বহু কষ্টে রাজহাঁসগুলোকে তাড়িয়ে তাকে আমি উদ্ধার করলাম, কিন্তু এরপর থেকে বেড়ানোটা বন্ধ করতে হলো। বেড়াবার জন্যে নায়ার খুব মন কেমন করতো। যখন আমি খাঁচার পাশ দিয়ে যেতাম রেলিঙের ভিতর থেকে সে আমার পাশে পাশে দৌড়োতো করুণ সুরে কাঁদতে কাঁদতে। তাকে বিচলিত না করার জন্যে আমাকে অন্য পথ ধরে ঘুরে যেতে হতো।

পলায়ন

শীত চলে গেল, বসন্ত এলো গরম রোদে ভরা দিন নিয়ে। নায়া হয়ে উঠেছে সুন্দর, পূর্ণবয়স্ক জন্তু। ফিল্মের জন্যে ভোঁদড়ের দরকার হলে তাকেই বাছা হয়। জন্তুদের জীবন নিয়ে একটা ছবি তোলার কথা ছিল। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে

তাতে দেখানোর কথা ছিল ভোঁদড়রা কী করে সাঁতার কাটে আর জলের তলায় মাছ ধরে। স্বভাবতই নায়াকে বেছে নেওয়া হলো। সে মানুষকে ভয় পায় না, নিজের নাম ভালো করে জানে আর, যেটা সবচেয়ে দরকার, সে ক্যামেরার খটখট শব্দে ভয় পায় না। বুনো জন্তুরা এই অপরিচিত শব্দে প্রায়ই এমন ভয় পায় যে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে। তাদের ফিল্ম তোলা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু নায়া ক্যামেরার শব্দ বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করতো না।

সেই ছবির জন্যে তোড়জোড় শুরু হলো। একটা বিশেষ এ্যাকুইরিয়াম তৈরী হলো জলের তলায় ভোঁদড়ের ছবি তোলার জন্যে। সেটা এতো বিরাট যে বারো জন লোকের পক্ষেও লরি থেকে সেটাকে নামিয়ে বসানো কঠিন হলো। এ্যাকুইরিয়ামের তলায় রাখা হলো নদীর বালি, শামুক-গুগলি আর জলজ উদ্ভিদ। তারপর একই সঙ্গে দুদিক থেকে ছবি তোলার জন্যে তিনটে প্রজেক্টর আর দুটো ক্যামেরা হলো রাখা। যখন আমি ক্যামেরার দেখার জায়গায় উঁকি দিলাম তখন মনে হলো যেন নদীর একটা অংশকে দেখছি। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে সেটা শুধুই একটা এ্যাকুইরিয়াম।

সবকিছুই হলো প্রস্তুত। পরিচারক একটা ছোট খাঁচায় করে নায়াকে নিয়ে এসে জলে ছেড়ে দিলো। আমি প্রায়ই এই ভোঁদড়টিকে সাঁতার কাটতে দেখেছি, কিন্তু আগে কখনো তাকে জলের তলায় সাঁতার কাটতে দেখি নি। আমার কোনো ধারণাই ছিল না যে তার নড়াচড়াটা অমন লাবণ্যময় আর লীলায়িত হতে পারে। শরীরটাকে সম্পূর্ণ প্রসারিত করে, সামনের থাবাদুটোকে শরীরের সঙ্গে চেপে সে তার পিছনের পাদুটোকে ল্যাজের সঙ্গে সরল রেখায় ছড়িয়ে দিলো। তাকে দেখাতে লাগলো লম্বা সাপের মতো। জলজ উদ্ভিদের মধ্যে ছায়ার মতো সে পিছলে যেতে লাগলো। তার নাকের পাতাগুলো সচরাচর খুব অস্থির। যাতে জল না ঢোকে তার জন্যে সেগুলো এখন শক্ত করে বোজা। তার পুঁতির মতো ছোট ছোট চোখগুলো জ্বলজ্বল করছে। এ্যাকুইরিয়ামের মধ্যে একটা মাছকে ছুঁড়ে দেওয়া হলো। সেটাকে যে সে দেখতে পেয়েছে তার কোনো লক্ষণই নায়া দেখালো না। তার নড়াচড়াটা আগের মতোই লীলায়িত রইলো। এমন কি মনে হলো সে যেন গতি মন্থর করে আনছে, কিন্তু যখন সে মাছটার বরাবর উঠলো তখন অকস্মাৎ ছোঁ

মারার ভঙ্গী করে সেটাকে সে ফেললো ধরে। মাছটা ছিল বড় আর শক্তিশালী। ছাড়া পাবার জন্যে সেটা ল্যাজ আছড়াতে লাগলো। কিন্তু ভোঁদড়ের ধারালো ও বাঁকা দাঁতগুলো শিকারটাকে ধরে রইলো শক্ত করে।

জলের তলাকার ছবিগুলো তোলার পর কথা ছিল ভোঁদড়ের জলে নামার ফটো নেওয়ার। এর জন্যে চিড়িয়াখানার 'নতুন এলাকায়' একটা বিশেষ খাঁচা তৈরি করা হলো। তার মধ্যে ছিল একটা কৃত্রিম নদী আর সেইসব জলজ উদ্ভিদ যার মধ্যে স্বাধীন অবস্থায় ভোঁদড়রা থাকে। এই ছোট্ট নদীটার তীরগুলোয় আগাছা, ঘাস আর ঝোপ পোঁতা হলো। আর মাটির উপর রাখা হলো একটা পুরনো ফাঁপা ওক গাছ। তার শিকড়গুলো বেরিয়ে ছিল। দেখাচ্ছিল যেন গাছটা ঝড়ে পড়ে গেছে। সেটাকে দেখাচ্ছিল বুনো জায়গা। রেলিঙগুলো ছিল অদৃশ্য। ডালপালা দিয়ে সেগুলোকে হয়েছিল চাপা দেওয়া। এক কথায় সবকিছুই করা হয়েছিল যাতে চিড়িয়াখানার ঐ অংশটিকে স্বাভাবিক প্রকৃতির একটি অংশ বলে মনে হয়।

এই নতুন জায়গায় নায়ার প্রথম কাজ হলো খাঁচাটি ভালো করে চেনা। সে প্রতিটি ঘাস, প্রতিটি ঝোপ আর গাছ পরীক্ষা করলো, ঢুকলো পুরনো ওক গাছের কোটরে আর অনর্থক চেষ্টা করলো রেলিঙগুলোর তলায় গর্ত করতে। তারপর সে পরীক্ষা করলো জালটা। জালের এমন একটাও ফাঁক ছিল না যার ভিতর দিয়ে সে গলে বেরুতে চেষ্টা করে নি। পরের দিন লোকেরা যখন ভোঁদড়ের ফিল্ম তুলতে এলো তখন খাঁচাটা ফাঁকা।

নায়াকে সর্বত্র খোঁজা হলো, ডাকা হলো, কিন্তু কেউ তাকে খুঁজে পেলো না।

অন্ধকার হয়ে এলো। অনুসন্ধানের কাজ মুলতুবি রাখা হলো পরের দিনের জন্যে।

সেই রাত্রে পুকুরের জলে পাখীদের মধ্যে একটা বিরাট হৈ-চৈ শোনা গেল।

কী গোলমাল বেঁধেছে দেখার জন্যে এক চৌকিদার এলো ছুটে। সে দেখতে পেলো একটা ভোঁদড়ের দীর্ঘ সরু ছায়াকে জলের মধ্যে ঢুকতে। পরের দিন আধ-খাওয়া একটা পাতিহাঁস আর একটা ভোঁদড়ের পায়ের ছাপ দেখে বোঝা গেল যে তার রাতটা বৃথা কাটে নি।

'নতুন এলাকায়' ছিল লাল গলাওলা বার্নাক্‌ল্‌ পাখী। এগুলো অত্যন্ত দুর্লভ আর দামী পাখী। নায়া সেগুলোর ঝাঁককে ঝাঁক মেরে ফেলতে পারে, তাই স্থির করা হলো তাকে জীবন্ত অথবা মৃত যেকোন অবস্থায় হোক ধরতেই হবে।

নায়া পাঁচ দিন বাইরে ছিল। দিনের বেলায় সে পুকুরের নলখাগড়ার মধ্যে থাকতো লুকিয়ে, আর রাতে বেরুতো শিকার করতে। চৌকিদাররা বারবার তাকে চেষ্টা করেছিল ধরতে, কিন্তু সে তাদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে পালাতো অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে। আমি যখন বাড়ী যাবার জন্যে 'নতুন এলাকার' ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন এক চৌকিদার আমাকে বলেছিল যে নায়া পালিয়ে গেছে।

'নায়া, নায়া, নায়া!'— পুকুরের ধার দিয়ে যাবার সময় নিজের অজ্ঞাতে আমি ডাকতে লাগলাম, বেড়াতে যাবার সময় যেভাবে ডাকতাম ঠিক সেইভাবে।

আর নায়া, পাঁচ দিন তাকে ধরার সব প্রচেষ্টাকে যে ব্যর্থ করেছিল, সেই পরিচিত শীস দিয়ে আমার ডাকের উত্তর দিলো। শীস দিয়ে জল কাটতে কাটতে আসার সময় সমস্ত পাখীদের ভয় পাইয়ে আমার কাছে সে এলো সাঁতরে। বাধ্য হয়ে সে আমার পিছন পিছন এলো খাঁচার মধ্যে, যেন আমরা সেই অতীতে ফিরে গিয়েছি, যখন সে ছিল একটা বাচ্চা ভোঁদড় আর আমরা যেতাম একসঙ্গে বেড়াতে।

তারপর কয়েক বছর কেটে গেল। শুরু হলো লড়াই। জন্তুদের অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া দরকার।

জন্তু ভরা একটা বজরা ভলগা দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল, এমন সময় তিনটে জার্মান এরোপ্লেন একের পর এক তার উপর এলো ছোঁ মেরে নেমে।

একটা অতি বিস্ফোরক বোমা পড়লো বজরাটার বাইরে, আর একটা আঘাত করলো গলুইতে, যেখানে ছিল জন্তুদের খাঁচাগুলো। তাদের মধ্যে ছিল নায়া। সঙ্গে সঙ্গে অনেক জন্তু গেল মরে, অনেকগুলো ছিটকে পড়লো জলে কিম্বা বজরায় ভয় পেয়ে হয়ে গেল ছত্রাকার।

কে বলতে পারে নায়ার কী হয়েছিল। সে বজরার টুকরোগুলোর মধ্যে নিহত হয়েছিল কিম্বা ফিরে গিয়েছিল তার স্বদেশে সে কথা আমি জানি না। কিন্তু একসময় যে ছোট্ট ভোঁদড়টা আমাদের বাড়ীতে থাকতো, এখনো সর্বদা তার কথা আমার মনে পড়ে।

কুৎসি

কুৎসি* ছিল একটা রোগা খ্যাঁকশেয়াল। তার পাগুলো ছিল খুব লম্বা। কানগুলো খোঁচা-খোঁচা আর চোখদুটো ছিল সামান্য বাঁকা। সব সময়ই মনে হতো তার মুখে একটা হাসি লেগে রয়েছে। শেয়ালদের মতো তার ল্যাজটা লোমশ ছিল না। লম্বা ঝাঁটার মতো ল্যাজের বদলে, যেটা হলো কিনা খ্যাঁকশেয়ালদের গৌরবের জিনিস, তার ছিল ছোট্ট একটা কাটা ল্যাজ। বিশেষ করে এই কারণে তাকে নির্লজ্জের মতো দেখাতো।

এক শিকারী তাকে এনেছিল চিড়িয়াখানায়।

কুৎসিকে যেখানে রাখা হলো সেই খাঁচায় অনেক খ্যাঁকশেয়াল ছিল। কিন্তু এতে মনে হলো না সে বিরক্ত বোধ করছে, যদিও এ ঘটনায় নবাগতরা সাধারণত ঘাবড়ে গিয়ে থাকে। মনে হলো নতুন জায়গায় সে খুব স্বাভাবিক বোধ করছে। একটা খ্যাঁকশেয়ালনী যখন তাকে কট করে কামড়াতে চেষ্টা করলো তখন কুৎসি তার দিকে চক্ষের নিমেষে ঘুরে আক্রমণকারীর ঘাড়ের চামড়াটা কামড়ে এমন ঝাঁকানি দিলো যে তারপর থেকে সে কিম্বা অন্য কোনো খ্যাঁকশেয়াল কুৎসির কাছে যেতে সাহস করতো না। লিওনিয়া খ্যাঁকশেয়ালদের দেখাশোনা করতো। প্রথম থেকেই কুৎসি তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতো যেন তাকে আজীবন সে চেনে।

লিওনিয়া যখন খাঁচার মধ্যে আসতো কুৎসি তখন দৌড়ে তার কাছে গিয়ে, তার বেঁড়ে ল্যাজটা নাড়িয়ে সস্নেহ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাতো, যেন আশা করতো তাকে আদর করা হবে। এটাও নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে যে লিওনিয়া অন্যান্য খ্যাঁকশেয়ালদের চেয়ে তাকে বেশী যত্ন করতো, প্রায়ই তাকে দিতো সবচেয়ে ভালো মাংসের টুকরোগুলো। এক কথায়, কুৎসি জীবনের উঠতি-পড়তির মধ্যে নিজেকে ভালো করে খাপ খাইয়ে নিতে পারতো। কুৎসির আরো একটা বৈশিষ্ট্য

---

* বেঁড়ে। — অনুঃ

ছিল। তাতে আমরা সবাই অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম — স্বাধীনতাকে সে খুব ভালোবাসতো, আর সে পালাতে পারতো যেকোনো খাঁচা থেকে।

চিড়িয়াখানায় আনার প্রায় পনেরো দিন পরে কুৎসি প্রথমবার পালিয়েছিল। পরিচারক যখন খাঁচা পরিষ্কার করতে এলো তখন কুৎসি সেখানে নেই। বহুক্ষণ লিওনিয়া বুঝতে পারলো না কোথায় সে পালিয়েছে। খাঁচার মধ্যে কোনো গর্ত ছিল না, আর সব খ্যাঁকশেয়ালগুলোই ছিল সেখানে। তারপর পরিচারক অনুমান করলো কী ঘটেছে — খাঁচার মধ্যে, শিকগুলোর পাশে একটা গাছ ছিল। গাছের ডগাটা খাঁচার ছাতের একটা ফুটোর ভিতর দিয়ে গিয়েছিল বেরিয়ে। এই ফুটোটার ভিতর দিয়ে কুৎসি নিশ্চয়ই পালিয়েছে। আশ্চর্য চাতুর্যের সঙ্গে সে এই কাজটা করেছিল — গাছের কাণ্ডের সঙ্গে নিজের পিঠটা চেপে (এমন কি গাছের ছালের উপর খানিকটা লোম আটকে ছিল), তারের জাল বেয়ে সে উঠেছিল যেন সেটা একটা মই। অবাক হয়ে লিওনিয়া শুধু তার মাথা নাড়িয়েছিল। এ ধরনের চতুর খ্যাঁকশেয়াল ইতিপূর্বে সে কখনো দেখে নি।

'কে ভেবেছিল এরকম একটা ছোট্ট জন্তু ওরকম চালাক হবে?' — বিস্ময়ে সে চিৎকার করে উঠেছিল।

দু'একদিনের মধ্যে কুৎসিকে ফিরিয়ে আনা হলো। একটি লোক তাকে ঝুলিতে ভরে শাল দিয়ে বেঁধে এনেছিল। তার পিছন পিছন আসছিল ছেলেমেয়েদের ছোট্ট একটি ভিড়। তাদের অনেকের হাতে কামড়ানোর দাগ, তাই লিওনিয়া কুৎসিকে যখন নির্ভয়ে তুলে নিলো আর কুৎসি যখন তাকে স্পর্শ করলো না তখন তারা খুব অবাক হয়ে গেল। লিওনিয়া যখন তার কানে চিমটি কাটলো তখন সে এমন কি তাকে কামড়ালোও না।

কুৎসিকে আবার আগের খাঁচায় ভরা হলো। যে ফাঁক দিয়ে পালিয়েছিল সেটাকে করা হলো বন্ধ। কিন্তু আবার পালানোর পথে তাতে কুৎসির বিশেষ বাধা হয় নি।

এবার সে বেরিয়ে গিয়েছিল সোজা দরজা দিয়ে। একদিন লিওনিয়া দরজা খুলতে না খুলতেই বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে এসে কুৎসি তার পায়ের ফাঁক দিয়ে অদৃশ্য হয়েছিল তার বেঁড়ে ল্যাজটা কাঁপিয়ে।

পলাতকের খোঁজে রীতিমতো একটা অভিযান পাঠানো হলো। কিন্তু কুৎসিকে ধরতে তারা পারলো না। বিনা কারণে সে অমন নিখুঁতভাবে চিড়িয়াখানার আসা-যাওয়ার পথগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয় নি। মনে করা হলো কুৎসি হারিয়ে গেছে, খাবার রেজিস্টারি থেকে তার নামটা হলো কেটে দেওয়া।

আরো কয়েক দিন কেটে গেলো। চিড়িয়াখানার দুটো পুকুর থেকে পাতিহাঁসগুলো হতে লাগলো অদৃশ্য। অপরাধী-কে আবিষ্কার করা অসম্ভব হয়ে উঠলো, কারণ সর্বত্রই পায়ের নীচে বরফ আর বরফ। তার উপর কোনো পায়ের দাগ দেখা যায় না।

দৈবাৎ টের পাওয়া গেল চোর কে।

একদিন সকালে লিওনিয়া যখন খাঁচার কাছে এসেছে, সে দেখতে পেলো তার খ্যাঁকশেয়ালদের মধ্যে কিছু একটা গণ্ডগোল বেঁধেছে। সবাই তারা খাঁচার সামনে ভীড় করে রয়েছে দাঁড়িয়ে। শিকগুলোর ভিতর দিয়ে তারা তাদের থাবা বাড়িয়ে তুষারের ভিতর থেকে কিছু একটা বার করতে চেষ্টা করছে। লিওনিয়া

কাছে এসে দেখলো... তুষারের ভিতর থেকে বেরিয়ে রয়েছে একটা মরা পাতিহাঁস। 'এটাই কি সেই হাঁস যেটা গতকাল রাতে পুকুর থেকে হারিয়ে গিয়েছিল?' — মনে মনে সে বললো। সেটাকে সে তুলে নিয়ে গেল ম্যানেজারের কাছে। ম্যানেজার সেটিকে পরীক্ষা করে দেখলেন যে এটাই সেই পাতিহাঁস যেটা অদৃশ্য হয়েছিল আগের রাতে। এ কথা প্রমাণিত হলো যে সেটাকে মেরে ফেলেছে একটা খ্যাঁকশেয়াল। এখন সবকিছুই আঙুল দেখাচ্ছে কুৎসির দিকে। অল্পদিনের মধ্যেই এই সন্দেহটা হলো বদ্ধমূল। মাঝে তুষার পড়েছিল, পুকুরের পাশেকার তুষারের উপর পরিষ্কার দেখা গিয়েছিল খ্যাঁকশেয়ালের পায়ের ছাপ। আবার কুৎসির খোঁজ শুরু হলো। কিন্তু পলাতককে খুঁজে পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। কেউ জানে না কোথায় সে গেছে। সর্বত্রই তাকে খোঁজা হলো, কিন্তু সবকিছু ব্যর্থ হলো। তার পায়ের ছাপের উপর ছেড়ে দেওয়া হলো একটা শিকারী কুকুর, নানা ফাঁদ হলো পাতা আর দিনরাত হতে লাগলো পাহারা দেওয়া। কিন্তু কুৎসিকে ধরা গেল না। আর প্রতি রাত্রেই পুকুরগুলোর তীরে একটা করে মরা পাখী পাওয়া যেতে লাগলো।

অতি সহজভাবেই কুৎসি নিজে থেকে ফিরে এলো। একদিন সকালে পরিচারক যখন খাঁচা পরিষ্কার করতে এসেছে, সে দেখলো কুৎসিকে বাইরে অপেক্ষা করতে, মুখে তার সস্নেহ স্বাগত ভাব, যেন কিছুই ঘটে নি।

যাযাবরের জীবন যাপন করে ক্লান্ত হয়ে সে স্থির করেছিল বাড়ী যেতে। লিওনিয়া যখন খাঁচার দরজার তালা খুলছিল কুৎসি তখন স্পষ্টই অধৈর্য হয়ে লাফাচ্ছিল তার চারদিকে। খ্যাঁকশেয়ালের এ ধরনের অনুতাপের অভিব্যক্তি লিওনিয়াকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। কুৎসির সমস্ত পাপ আর যেসব হাঁসদের সে মেরেছিল তা সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করে দেওয়া হলো।

ফেরার পর প্রথম কয়েক দিন কুৎসি অতি ভালো ব্যবহার করলো: সে ঝগড়া করতো না আর পালাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও প্রকাশ করতো না। কিন্তু আসলে সেটা ছিল তার হাঁফ ফেলার সময়। পরের বার সে পালালো একেবারে নতুন উপায়ে। তারের জালের তলাটা খুঁড়ে অন্যান্য সব খ্যাঁকশেয়ালদের সঙ্গে নিয়ে সে পালালো খাঁচা থেকে। বাদবাকীদের তাড়াতাড়ি ধরা গেল, কিন্তু কুৎসিকে ধরা সহজ হলো

না। কয়েক দিন পরে চিড়িয়াখানার 'নতুন এলাকায়' ভালুকদের ঘেরা জায়গায় তাকে পাওয়া গেল।

নিশ্চয়ই সেখানে সে পৌঁছেছিল দৈবাৎ। সম্ভবত ভালুক ও দর্শকদের মধ্যে তারের জালের পরিবর্তে যে গভীর পরিখাটা ছিল সেটা সে লক্ষ্য করে নি। তাই তাতে পড়ে গিয়েছিল। আমরা যখন সেখানে পৌঁছুলাম তখন দেখলাম তিনটে ভালুক কুৎসিকে তাড়া করেছে। আর কুৎসি যেন তাদের ভ্যাংচাচ্ছে। ভালুকদের ঘেরা জায়গাটা বেশ প্রশস্ত, আনাড়ি ভালুকগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া কুৎসির পক্ষে একেবারেই কষ্টকর হয় নি। তাদের কাছ থেকে ধীরে ধীরে হেঁটে সে সরে যাচ্ছিল, যেন তাদের চটিয়ে দেবার জন্যেই। মাঝে মাঝে সে বসে পড়ে অপেক্ষা করছিল ভালুকগুলো যতক্ষণ না তার খুব কাছে আসে। তারা এলে তাদের পেটের ফাঁক দিয়ে গলে সে যাচ্ছিল পালিয়ে।

একবার ভালুকগুলো আর একটু হলেই ধরে ফেলতো তাকে। দুটো ভালুক তার দিকে ছুটলো দু'দিক থেকে। তাকে মারার জন্যে একটা ভালুক ইতিমধ্যেই তার থাবা তুলেছে। মনে হলো কুৎসির শেষ সময় বুঝি এসে গেছে। কিন্তু চতুর খ্যাঁকশেয়ালটা ভালুকের থাবার নীচে হেঁট হয়ে তার পিছনের পাদুটোর ফাঁকের ভিতর দিয়ে গেল পালিয়ে। ভারি অবাক হয়ে ভালুকদুটো তাদের মাথা পরস্পরের সঙ্গে ঠুকে শুরু করে দিলো মারামারি।

পরস্পরকে তারা ঘুষি মেরে, একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়ে, অপরাধীকে খুঁজলো অনেকক্ষণ ধরে।

আমরা বহুবার এলাম গেলাম, কিন্তু ভালুকগুলো কুৎসিকে তাড়া করা থামালো না। তারা এতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে তাদের হাঁপানোর শব্দটা শোনা যাচ্ছিল পরিখার অন্য পাশ থেকে। মনে হচ্ছিল খ্যাঁকশেয়ালটা সব সময় তাদের নিয়ে করছে তামাসা — তাদের লোমশ পিঠের উপর দিয়ে লাফাচ্ছে, গলছে তাদের পেটের তলা দিয়ে আর পালাচ্ছে প্রতিবারই।

অবশেষে ভালুকগুলো ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিলো।

দিনটা ছিল গরম আর রোদে ভরা। বেচারা ভালুকগুলো একেবারে ক্লান্ত হয়ে ডোবায় সেঁধুলো। ঠাণ্ডা জলে নেমে তারা খানিক জল ছিটোলো। প্রথমে তারা এক পাশে পরে অন্য পাশে গড়ালো, ভাসলো চিৎ হয়ে আর যখন পরিচারক এলো তাদের খাবার নিয়ে মনে হলো তারা খ্যাঁকশেয়ালটার কথা একেবারে গেছে ভুলে। তিনটে ভালুকই তখন একসঙ্গে উঠলো জল থেকে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের জায়গায় নিলো নিজের ভাগের মাংস আর শুরু করে দিলো খেতে। তারা শান্তিতে চিবুচ্ছিল, এমন সময় অকস্মাৎ কুৎসি দিলো দেখা। স্পষ্টই বোঝা গেল সে তার রাত্রির খাবার বাদ দিতে চায় নি। দৃঢ় পায়ে সে এগিয়ে গেল ভালুকদের দিকে।

এই নির্লজ্জ খ্যাঁকশেয়ালটাকে তারা প্রথমত একেবারেই লক্ষ্য করলো না, কিন্তু কুৎসি তাদের চারিদিকে, একেবারে তাদের নাকের ডগা দিয়ে, ক্রমাগত চললো দৌড়ে, চেষ্টা করতে লাগলো খানিকটা মাংস কেড়ে নিতে — খুব সামান্য হলেও তাই সই। কিন্তু ভালুকরা হলো লোভী জন্তু। অনিমন্ত্রিত অতিথির সঙ্গে খাবার ভাগ করতে তাদের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। রেগে গর্জন করতে করতে, থাবা দিয়ে মাংস ঢেকে, তারা কুৎসির দিকে পিছন ফিরে বসে চেষ্টা করলো তাকে ঠেলে সরাতে। ভালো উপায়ে মাংস পাবার আশা নেই দেখে 'অতিথি' কামড় দিলো 'নিমন্ত্রণকারীদের' মধ্যে একজনের গোড়ালিতে। তখন শুরু হয়ে গেল দারুণ হৈ-চৈ! ভীষণ রেগে উঠে সেই ভালুকটা কে তাকে কামড়েছে দেখতে না পেয়ে ভয়ঙ্কর জোরে লাফিয়ে পড়লো তার প্রতিবেশীর উপর, আর মুহূর্তের মধ্যে খাবারটা গেল ছড়িয়ে। ভালুকগুলো মারামারি করতে শুরু করে দিলো, আর কুৎসি একটা

পাথরের উপর আরাম করে বসে বিরাট একটুকরো মাংস লাগলো খেতে। ভালুকগুলোকে আলাদা করতে পরিচারকের বেগ পেতে হয়েছিল। তাদের দিকে বিশেষ পটকা ছুঁড়ে তবে তাদের আলাদা করতে পেরেছিল। জন্তুরা পটকাকে দারুণ ভয় পায়। তারা পটকা ফাটার শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল নিজের খাঁচায়। সেখানে তাদের রাখা হলো তালা বন্ধ করে। তারপর পরিচারকরা তাড়া করলো কুৎসিকে একটা জাল নিয়ে। কিন্তু তারা সফল হলো না। সমস্ত দিন ধরে তিনটে ভালুক যে তাকে ধরতে পারে নি সেটা এমনি নয়। প্রতিবারই যখন চেষ্টা করা হয় জালটাকে তার ওপর ফেলতে, খ্যাঁকশেয়ালটা কিলবিল করে পালায়, নয়তো ঘেরা জায়গাটার পিছনকার প্রায় খাড়াই জায়গাটার উপরে উঠে তার পশ্চাৎধাবকদের মাথার উপর দিয়ে পড়ে লাফিয়ে।

লিওনিয়াকে ডেকে পাঠাতে হলো। কুৎসি সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনতে পেরে তার কাছে গেল দৌড়ে। তাকে তুলে নেবার সময় সে কোনো গোলমাল করলো না।

‘কুৎসি, কুৎসি, আমাদের খাঁচাটা তোমার পক্ষে নেহাতই ছোট্ট! স্বাধীনতা তুমি কী ভালোই না বাসো!’ — লিওনিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

সে ম্যানেজারের কাছে গিয়ে বললো এই ছটফটে খ্যাঁকশেয়ালটাকে অন্য একটা খাঁচায় নিয়ে যেতে। এই চালাক খ্যাঁকশেয়ালটার সঙ্গে বিচ্ছেদের জন্যে তার দুঃখ হলো, কিন্তু অন্য উপায় ছিল না।

যে খাঁচায় কুৎসিকে স্থানান্তরিত করা হলো সেটা ছিল মজবুত আর প্রশস্ত। সেটা ছিল বাচ্চা জন্তুদের ঘেরা জায়গাটার মধ্যে। কিন্তু এই ছোট ঘেরা জায়গাটায় রেলিঙ দেওয়া ছিল উঁচু উঁচু শিক দিয়ে। সেই শিকগুলোর উপর ছিল একটা কার্ণিশ। এইভাবে কুৎসিকে রাখা হলো মধ্যেকার এক খাঁচায়।

ঘেরা জায়গাটা বিশেষভাবে নির্মিত হয়েছিল যাতে জন্তুরা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে। কিন্তু তার ভিতরে কুৎসিকে ঢুকতে দিতে আমাদের ভয় হতো।

প্রাণবন্ত, আমোদপ্রিয় খ্যাঁকশেয়ালটা নির্জনতায় হেদিয়ে উঠলো। অন্যান্য জন্তুদের যখন ঘেরা জায়গাটায় ছেড়ে দেওয়া হতো সে কাকুতি মিনতি করতো তাদের কাছে তাকে যেতে দেবার জন্য, করুণ সুরে করতো আর্তনাদ, এমন কি তার খিধেটাও গেল চলে। প্রত্যেকেরই কুৎসির জন্যে দুঃখ হলো।

'ওকে ছেড়ে দাও না কেন?' — তানিয়া নামে একটি নতুন পরিচারিকা বললো।

বহুক্ষণ ধরে তার সঙ্গে আমরা তর্ক করলাম, তাকে বললাম যে সে কুৎসির চালাকির কথা জানে না, কিন্তু তানিয়া তার গোঁ ছাড়লো না।

অবশেষে বহু তর্কাতর্কির পর স্থির হলো কুৎসিকে ছেড়ে দেওয়া হবে। দরজাটা হলো খোলা। কুৎসি এমন শান্তভাবে ধীরে ধীরে খাঁচার ভিতর থেকে বেরুলো যেন সেটা নিতান্তই সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনা, তারপর ধীরে ধীরে গেল শিকগুলোর কাছে। খ্যাঁকশেয়ালটার মতলবটা যে কী সেটা অনুমান করা ছিল সহজ। তা জানা যেতো তার সুনিশ্চিত চলার ভঙ্গি আর দৃষ্টির মধ্যে। কুৎসি ঘেরা জায়গাটার একটা কোণে গেল দৌড়ে, তারপর সে কী যে করছে সেটা কেউ অনুমান করতে পারার আগেই মাটি থেকে সোজা লাফিয়ে উঠলো কার্নিশটার উপর।

ঘেরা জায়গাটার বাইরে বেশ ভিড় জমে ছিল। যখন তারা কার্নিশটার উপর দেখলো একটা খ্যাঁকশেয়ালকে তারা কুৎসিকে ভয় পাইয়ে তাড়াবার জন্যে শুরু করলো চেঁচাতে আর হাত নাড়াতে। কিন্তু এতে সে বিন্দুমাত্রও ঘাবড়ালো না। কারুর প্রতিই এতোটুকু মনোযোগ না দিয়ে সে ভিড়ের একেবারে মাঝখানে লাফিয়ে দর্শকদের পায়ের ফাঁক দিয়ে তৎপরভাবে গলে ছুটে চললো পথ দিয়ে।

সবাই ছুটলো তার পিছন পিছন, সবচেয়ে আগে নতুন পরিচারিকা তানিয়া। কয়েক বার এমন হলো যে আর একটু হলেই সে কুৎসিকে ধরে ফেলে আর কি। এর কারণ অবশ্যই এটা নয় যে কুৎসি ভালো দৌড়োতে পারতো না। তানিয়া যখন পিছনে পড়ে যাচ্ছিল তখন খ্যাঁকশেয়ালটা যেন ইচ্ছে করেই মন্থর করছিল তার গতি।

চিড়িয়াখানার চারিপাশের রেলিঙগুলোর কাছে তারা গেল। আর তারপর... তারপর কুৎসি আরেকবার ঘুরে, তার বেঁড়ে ল্যাজটাকে নাড়িয়ে গলে গেল রেলিঙগুলোর ভিতর দিয়ে। সেদিন থেকে আর কখনো কেউ তাকে দেখে নি। এটাই হলো বেঁড়ে খ্যাঁকশেয়ালের শেষ পলায়ন। স্বাধীনতাকে সে খুব ভালোবাসতো।

সাধারণ পুষি

একথা সবাই ভালো করে জানে যে বেড়াল আর ইঁদুর হলো জন্মশত্রু। সেটা ছিল আমারও ধারণা। কিন্তু একদিন আমাকেও স্বীকার করতে হলো যে এটা সব সময় সত্যি নয়।

এক বৈজ্ঞানিক ফিল্মের জন্যে ছবি তোলা দরকার ছিল একটা বেড়াল আর কতকগুলো ইঁদুরছানার বন্ধুত্বের। ছেলেমেয়েরা কয়েক দিন ধরে পরপর আমাদের কাছে নানা ধরনের বেড়াল নিয়ে এলো, কিন্তু তাদের কোনোটা দিয়েই কাজ চললো না: কোনোটার রঙ খুব হালকা, কোনোটার রঙ খুব গাঢ়। অবশেষে বহু কষ্টের পর যেমন চাওয়া গিয়েছিল ঠিক তেমনি বেড়ালটিকে পাওয়া গেল — সাধারণ বাঘের মতো কালো ডোরাকাটা ধূসর রঙের একটা বেড়াল, চোখগুলো তার উজ্জ্বল সবুজ। প্রযোজকের সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে মনে ধরলো — ঠিক এই বেড়ালটারই তার দরকার ছিল। তবে তাঁর আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না। বেড়ালটাকে আমাদের কাছে এনেছিল একটি ছোট ছেলে, কিন্তু বেড়ালটার যিনি কর্ত্রী তিনি কিছুতেই তাঁর পোষা জন্তুটিকে ছেড়ে দিতে রাজি হলেন না। তাছাড়া বেড়ালটার ছিল অনেকগুলো ছানা।

প্রযোজক হতাশ হয়ে পড়লেন। বেড়ালটার মালিককে তিনি কাকুতি মিনতি করলেন সেটাকে তাঁকে দিয়ে দিতে, ভালো দাম দেবার প্রস্তাব করলেন আর প্রতিজ্ঞা করলেন যে ফিল্ম তোলা হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ালটাকে তিনি ফিরিয়ে দেবেন।

'আপনার বেড়ালটার রঙ ঠিক যেমনটি দরকার তেমনি,' — তিনি অনুনয় করে বললেন। — 'ইঁদুরের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের ছবি তুলেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ফেরৎ দেবো বেড়ালটা।'

'ইঁদুরের সঙ্গে!' — বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ভদ্রমহিলা। — 'তাকে আমি যে দিতে চাইছি না তার প্রধান কারণ সে চমৎকার ইঁদুর ধরতে পারে। সে সমস্ত

ইঁদুরগুলোকে ধরেছে, শুধু আমার বাড়ীতে নয়, আমাদের প্রতিবেশীদের বাড়ীতেও। আর আপনি কিনা তাকে চান তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করাতে! সে তো সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোকে গিলে ফেলবে!'

সত্যি কথা বলতে কি ভবিষ্যৎ 'চিত্র তারকা' সম্বন্ধে এই বর্ণনায় আমি বেশ হতাশ হয়ে পড়লাম। আমাকে প্রায়ই বেড়াল, কুকুর আর নানা জন্তুছানাদের পরিচর্যা করতে হয়েছে, কিন্তু কখনো আমাকে ইঁদুরছানা দিতে হয় নি এমন বেড়ালকে, ইঁদুর মারার জন্যে যে বিখ্যাত। আমি প্রযোজককে বলতে লাগলাম যাতে তিনি ঐ বেড়ালটাকে না নেন, কিন্তু তিনি নিজের মতে কাজ করার জন্যে জেদ ধরলেন।

এইভাবে ইঁদুর ধরতে ওস্তাদ সেই বেড়ালটি চিড়িয়াখানায় এলো সপরিবারে।

কে একজন তার নাম দিয়েছিল 'সুৎসিকারিখা'। কেন এই নামটা যে পছন্দ করা হয়েছিল কেউ জানে না, কিন্তু বেড়ালটার এই নামটাই চালু হয়ে গেল।

চিড়িয়াখানায় এই বেড়াল পরিবারকে রাখা হলো একটা বিশেষ খাঁচায়।

প্রথমটায় সুৎসিকারিখা তার নতুন বাড়ীতে এসে অত্যন্ত অস্বস্তি পেলো। খাঁচাময় সে ঘুরে বেড়ায়, মিউ মিউ করে আর খোঁজে বেরুবার পথ। তারপর সে শান্ত হয়ে এলো, শুয়ে পড়লো তার বাচ্চাদের সঙ্গে। কয়েক দিন পরে আমরা সেই ইঁদুরছানাগুলোকে নিয়ে এলাম যেগুলোর মা হিসেবে সুৎসিকে অভিনয় করতে হবে।

সেগুলো ছিল ক্ষুদে ক্ষুদে জীব, তাদের গায়ের উপর ছিল প্রায় অদৃশ্য রোঁয়ার আবরণ। তাদের চোখ তখনো ফোটে নি।

ইঁদুরছানারা আমার হাতে একটা ছোট দলা পাকিয়ে কিলবিল করে উঠলো, আর আমি সুৎসির খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম কীভাবে এগুলোকে সে গ্রহণ করবে। আমি খাঁচার মধ্যে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ালটা তাদের গন্ধ পেলো। সে লাফিয়ে উঠে ক্রমাগত আমার চারিপাশে লাগলো ঘুরতে; তার পিছনের পায়ে ভর দিয়ে চেষ্টা করতে লাগলো আমার হাতের কাছে পেঁছুতে। ইঁদুরগুলো কীভাবে তাকে উত্তেজিত করেছে দেখে আমি সেগুলোকে তার কাছে রেখে যেতে ভরসা পেলাম না।

অন্য উপায় বার করতে হবে।

সুৎসিকে একটা বাক্সে ভরে অন্য একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো, আর ইঁদুরগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হলো বেড়ালবাচ্চাদের সঙ্গে। এটা আমি ইচ্ছে করে করেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, তার বাচ্চাগুলোর মধ্যে অন্য কোনো জন্তু আছে কিনা সে পরে তা বুঝতে পারবে না। আর ইঁদুরগুলোর গা দিয়েও বেড়ালছানার গন্ধ বেরুবে।

দেখা গেল আমার যুক্তিটা নির্ভুল। কয়েক ঘণ্টা পরে সুৎসি তার স্বরে মিউ মিউ করতে শুরু করলো, আর সন্ধের দিকে এমন একটা কনসার্ট বসলো যেটা না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। বেড়ালটা মিউ মিউ করতে করতে বাক্সের দেয়ালটা আঁচড়াতে লাগলো, বেড়ালছানাগুলো খিধেয় করতে লাগলো কুঁই কুঁই আর তাদের মধ্যে হাতড়ে চললো ক্ষুদে ক্ষুদে ইঁদুরগুলো, অন্ধের মতো তারা খুঁজতে লাগলো তাদের মায়ের স্তনের বোঁটা।
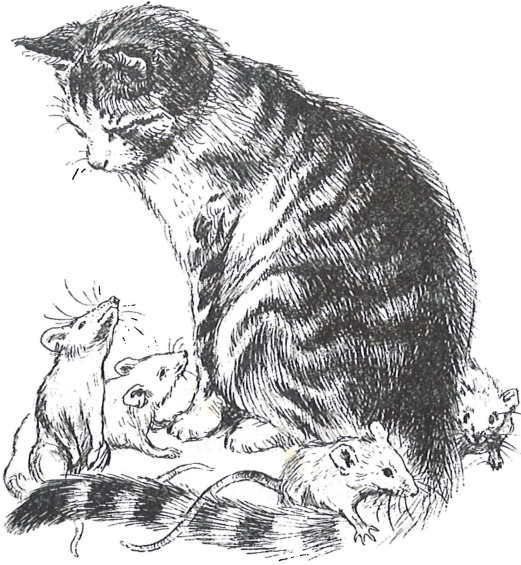
যখন আমি সুৎসিকে তার বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিলাম পাগলের মতো সে ছুটে গেল তার ছানাগুলোর কাছে আর সঙ্গে সঙ্গে পড়লো শুয়ে, ইঁদুরগুলোর দিকে একটুও মনোযোগ দিলো না। আরাম করে শুয়ে চোখ বুঁজে সে গরগর করতে লাগলো। এটাই ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত সময় ইঁদুরগুলোকে তার স্তনের বোঁটা ধরানোর। ধীরে ধীরে, যাতে সে ভয় না পায়, একটা বেড়ালছানাকে আমি পাশের ঘরে নিয়ে গেলাম আর তারপর ঠিক সেই রকমই সাবধানতার সঙ্গে একটা ইঁদুরছানাকে ধরিয়ে দিলাম তার স্তনের বোঁটা। এই পরিবর্তনটা বুঝতে না পেরে

বেড়ালটা করে চললো গরগর। এইভাবে বাকি ইঁদুরগুলোকে আমি ধরিয়ে দিলাম তার স্তনের বোঁটা — বেড়ালছানাগুলোর তদারক করতে লাগলো পরিচারিকা কাতিয়া মাসি।

এইভাবে একটা বেড়াল শান্তিতে বাস করতে লাগলো ইঁদুরছানাদের সঙ্গে। ইঁদুরগুলোকে একেবারেই বেড়ালছানাদের মতো দেখাতো না, কিন্তু সেই বিখ্যাত 'ইঁদুর মারিয়ে' তাদের দেখাশোনা করতে লাগলো মায়ের মতো। তাদের শরীরগুলোকে সে রাখতো গরম করে, চাটতো তাদের রোঁয়াগুলো আর কোনো বিপদ এলে তাদের করতো রক্ষা।

একদিন একটা হুলোবেড়াল সেই ঘরে এলো, যে ঘরে সুৎসি আর ইঁদুরছানাগুলোর ছবি তোলা হচ্ছিল।

সেটা ছিল একটা প্রকাণ্ড কালো বেড়াল, ভারি জাঁদরেল চেহারা, গোঁফগুলো তার ভীষণ লম্বা আর কপালে একটা কাটার দাগ। কিন্তু সুৎসি তাকে একটুও ভয় পেলো না। তার অদ্ভুত পরিবারকে রক্ষা করার জন্যে নির্ভয়ে সে ছুটে গেল আর হুলোটা কিছু বোঝার আগেই তার উপর পড়তে লাগলো আঘাতের পর আঘাত। প্রথমে সে চেষ্টা করেছিল আত্মরক্ষা করতে, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেলো সেটা করা কী রকম অর্থহীন। অপমানিত হয়ে সে পিছু হটলো। ঘরের ভিতর দিয়ে সে পালালো, তার ল্যাজটা খাড়া হয়ে রইলো, পিছন দিকে তাকে তাড়া করে চললো ক্রুদ্ধ মা, আর তাদের পিছন পিছন 'তারকার' ছবি তোলার জন্যে ছুটলেন প্রযোজক, যিনি ক্যামেরা চালান তিনি আর বাকি সবাই।

কিন্তু কেউই বেড়ালটাকে ধরতে পারলো না। শত্রুকে সে যখন ঘরের কোণের স্তূপাকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিগুলোর তলায় তাড়িয়ে নিয়ে গেল শুধু তখনই সুৎসি ঠাণ্ডা হয়ে এলো ফিরে। ইঁদুরছানাগুলোকে সে শুঁকে দেখে, তারা সুস্থ ও নিরাপদে আছে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে সে শুয়ে পড়লো তাদের পাশে। সে এমন সস্নেহভাবে গরগর করতে লাগলো আর এমন উৎসুক হয়ে চাটতে লাগলো তার পুষ্যি ছেলেমেয়েদের যে কয়েক মিনিট আগেকার তার রাগের চেহারাটাকে কেউ চিনতে পারলো না।

ইঁদুরছানারা যখন বড় হয়ে উঠলো তখন বেড়ালের সঙ্গে তাদের স্থানান্তরিত করা হলো অন্য একটা খাঁচায়, যেখানে দর্শকরা তাদের দেখতে পেতো।

সব সময়ই এই অসাধারণ পরিবারকে দেখার জন্যে লোকের ছিল ভীড়। প্রত্যেকেই চাইতো এই 'অলৌকিক ঘটনা' দেখতে। নানা ধরনের মন্তব্য যেতো শোনা! কেউ কেউ বলতো যে বেড়ালটার নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে, বলতো যে সম্ভবত তার দাঁত তুলে ফেলা হয়েছে... কিন্তু পুষি মস্ত বড় হাঁ করে হাই তুলতো, দেখা যেতো তার তীক্ষ্ন শিকারী দাঁতগুলো, তারপর আবার পাকিয়ে শুয়ে পড়তো ইঁদুরগুলোর সঙ্গে।

সুৎসির কর্ত্রী এলেন, কিন্তু তাকে তিনি নিয়ে গেলেন না। তিনি তাঁর ভূতপূর্ব পোষা জন্তুটিকে দেখে কাঁধ ঝাঁকালেন:

'আমার বেড়ালটার মাথা খেয়েছে! ও কী ভালো ইঁদুর ধরতো!'

আর 'চমৎকার ইঁদুর-ধরিয়েটি' রোদে শুয়ে রইলো, ইঁদুরছানাগুলো নির্ভয়ে খেলছে তার পাশে। বিচলিত মালিককে আমরা এই বলে সান্ত্বনা দিলাম যে বেড়ালটা শুধু তার 'নিজের' ইঁদুরগুলোকে মারবে না, এবং সে এখনো 'অন্যান্য' ইঁদুরদের ধরবে। কিন্তু আমরা যখন এই প্রশান্ত দৃশ্যটি দেখলাম তখন আমাদের নিজেদের কথাগুলোকেই আমরা বিশ্বাস করলাম না।

একদিন কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের কোনো সন্দেহ থাকার কারণ নেই। সুৎসিকারিখাকে আমরা বেড়াতে যাবার জন্যে খাঁচার বাইরে ছেড়ে দিলাম। প্রথমে সে রইলো খাঁচাটার কাছে। তারপর অকস্মাৎ হয়ে গেল অদৃশ্য। আমরা ভয় পেয়ে গেলাম, ভাবলাম সে একেবারে পালিয়েছে। কিন্তু অলপক্ষণ পরে সুৎসিকারিখা ফিরলো, একটা বিরাট মরা ইঁদুর দাঁতে ধরে।

সে গম্ভীরভাবে, ধীরে সুস্থে খাঁচা পর্যন্ত হেঁটে এলো, আর যখন তাকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হলো বহুক্ষণ সে কাটালো ইঁদুরছানাগুলোর দিকে তার শিকারকে ঠেলে দিতে দিতে।

বেড়ালটিকে তার পালিত সন্তানদের সঙ্গে খেলা করতে দেখাটা ছিল ভারি চিত্তাকর্ষক। ল্যাজগুলো খাড়া করে চার পায়ে লাফাতে লাফাতে — যেন স্প্রিংএর উপর লাফাচ্ছে — ইঁদুরগুলো যেতো সুৎসিকারিখার কাছে। সে তাদের ধরতো,

বলের মতো ছুঁড়তো সেগুলোকে উপর দিকে, গড়াতো তাদের মাটিতে, আর মাঝে মাঝে একটাকে চেপে ধরতো দাঁত দিয়ে, যেন সেটাকে সে চায় খেয়ে ফেলতে। এতে দর্শকরা সর্বদাই চঞ্চল হয়ে উঠতো, কিন্তু বেড়ালটা আবার গরগর করতে করতে ইঁদুরছানাটার এলোমেলো লোমগুলো দিতো চেটে।

এইভাবে প্রায় পুরো গ্রীষ্মকালটা তারা একত্রে কাটাবার পর একদিন একজন পরিচারক ভুলে গেল খাঁচার দরজাটা বন্ধ করতে। ইঁদুরগুলো গেল পালিয়ে।

ওঃ, সে কী হৈ-চৈ! বেড়ালটা মিউ মিউ করতে করতে ইঁদুরগুলোর জন্যে খাঁচাময় করতে লাগলো ছুটোছুটি। সেগুলো ঢুকে গিয়েছিল মেঝের নীচে, আর ভয় পাচ্ছিল বেরুতে। আমরা ধরতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে কাজ সম্পূর্ণ অসম্ভব। তারপর স্থির করা হলো পুষিকে বাইরে ছেড়ে দেওয়া হবে এটা দেখতে যে সে নিজে তার ইঁদুরগুলোকে ধরতে পারে কিনা। দরজাটা খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে লাফিয়ে বেরিয়ে সোজা চলে গেল কোণের দিকে। সেখানে সে গুঁড়ি মেরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো, তার ল্যাজের ডগাটা ছাড়া আর কিছুই নড়লো না। আর আমিও রুদ্ধশ্বাসে করতে লাগলাম অপেক্ষা। আমি ভাবলাম, 'যদি আমি ওর কাছ থেকে ইঁদুরগুলোকে জ্যান্ত ফিরিয়ে আনতে না পারি তাহলে?' সেখানে আমরা বসে দেখলাম — বেড়ালটা লক্ষ্য করতে লাগলো ইঁদুরগুলোকে, আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম বেড়ালটাকে। অকস্মাৎ পুষিটা পড়লো ঝাঁপিয়ে! সঙ্গে সঙ্গে আমিও পড়লাম তার উপর ঝাঁপিয়ে। কিন্তু বেড়ালকে ধরা সহজ নয়। আমার হাতের ভিতর দিয়ে গলে সে সোজা চলে গেল খাঁচাটার মধ্যে — তার চোখগুলো জ্বলছে, একটা ইঁদুরছানা তার দাঁতের মধ্যে। আমি মনে মনে বললাম, 'বেচারার আর আশা নেই! ও ওটাকে খেয়ে ফেলবে।' কিন্তু যা দেখলাম তাতে হয়ে গেলাম আশ্চর্য। সুৎসিকারিখা একটা সুবিধে মতো জায়গা দেখে ইঁদুরটাকে রেখে চাটতে লাগলো! আর চাটতে চাটতে সে ক্রমাগত তাকাতে লাগলো চারিদিকে, যেন ভয় পেলো কেউ সেটাকে নিয়ে যাবে। তারপর শান্ত হয়ে সে গেল আর একটাকে ধরতে। আবার সে গুঁড়ি মেরে বসলো আর লাগলো অপেক্ষা করতে। কিন্তু আমি আর ভয় পেলাম না। আমি জানতাম সে তার ইঁদুরগুলোকে মারবে না।

সন্ধের মধ্যে বেড়ালটা একটা ছাড়া আর সবগুলোকে ধরলো। সেটা — ক্ষুদে কাপুরুষটা! — ভয় পাচ্ছিল তার গর্ত থেকে বেরুতে, যদিও রাত্রে, সবাই চলে যাবার পর সে কামড়াচ্ছিল শিকগুলোকে, বৃথা চেষ্টা করছিল তার ঘরে ফিরে যেতে।

বেড়ালটার এখন চারটের জায়গায় তিনটে ছানা।

তারা অনেক অনেক দিন ছিল একসঙ্গে। শীতের রাত্রে বেড়ালটা নিজের শরীরের তাপ দিয়ে ক্রমাগত গরম করতো ইঁদুরছানাগুলোকে, আর নিজের খাবারটা সে ভাগ করে নিতো তাদের সঙ্গে। এর চেয়ে স্নেহশীল পরিবার আমি কখনো দেখি নি। এখন, যখন আমি শুনি যে বেড়াল আর ইঁদুর হলো জন্মশত্রু, তখন আমি উত্তর দিই যে এমন কি স্বাভাবিক শত্রুরাও বন্ধু হয়ে উঠতে পারে।

নিউর্‌কা

নিউর্‌কা ছিল একটা অদ্ভুত জীব। সে ছিল মোটা আর তার নাকটা ছিল খাঁদা, আর সব সিন্ধুঘোটকদের মতোই তার ছিল মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ। এইটা আর তার গোলগোল সজল চোখগুলোর জন্যে তার মুখের ভাবটা ছিল ভারি হাস্যকর — বোকার মতো, কিন্তু অত্যন্ত ভারিক্কী। তবে সে শুধু দেখতেই ছিল বোকার মতো। আসলে কিন্তু নিউর্‌কা ছিল খুব বুদ্ধিমতী।

ভ্রাঙ্গেল দ্বীপ থেকে সে এসেছিল মস্কোর চিড়িয়াখানায়। এই কঠিন দীর্ঘ পথ সে ভ্রমণ করেছিল স্টিমারে আর ট্রেনে, একটা ছোট বাক্সের মধ্যে। সে অত্যন্ত কাহিল অবস্থায় পৌঁছল, তার দু'পাশে আর পিঠে বড় বড় দগদগে ঘা।

আমার জিম্মায় তাকে রাখা হলো। আমি তার ঘাগুলো ধুয়ে, খাঁচাটা পরিষ্কার ক'রে দিলাম তাকে খাবার। মাছ খেতে দিলাম — প্রথমে মাছটার কাঁটা ছাড়িয়ে সেটাকে করতে হতো ছোট ছোট টুকরো। কারণ নিউর্‌কা তখনো ছিল নেহাৎ শিশু, সিন্ধুঘোটক হলে হবে কি! সে এমন কি জানতো না কী করে খেতে হয়! আমার হাত থেকে এক একটুকরো খাবার নিয়ে সে সেটাকে চুষে গিলে ফেলতো বোতল থেকে ছিপি খোলার মতো শব্দ করে। প্রতিদিন সে চার থেকে পাঁচ সের মাছ খেতো, মাঝে মাঝে এমন কি কিছুটা বেশী। এটা ছাড়াও সে পেতো দৈনিক এক গেলাস করে মাছের তেল।

অল্পদিনের মধ্যেই আমি নিউর্‌কার প্রিয় হয়ে উঠলাম, সম্ভবত আমি তার দেখাশোনা করতাম আর তাকে খাওয়াতাম বলে। দূর থেকে সে আমাকে চিনতে পারতো, আমাকে অভিনন্দন জানাতো ভোঁতা ছোট ছোট ফাঁকা আওয়াজ করে, অনেকটা সেটা কুকুরের ডাকের মতো। সে আমার দিকে তাড়াতাড়ি আসতো, তার সামনের পাদুটোর ওপর ভর দিয়ে একবার এপাশে আর একবার ওপাশে টলতে টলতে।

এই ছানাটা ছিল ভারি বুদ্ধিমতী। অনেক কুকুরেরই নিউর্কার মতো 'মগজ' নেই।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নিউর্কা চাইতো না যে আমি তাকে একেবারে একা ফেলে চলে যাই।

যেই আমি দরজার কাছে যেতাম সে দরজা আটকে ক্রুদ্ধ চিৎকার করতো। মনে হতো সে যেন ভাবে যে তার সঙ্গে আমার থাকা উচিত! মাঝে মাঝে আমি অত্যন্ত চটে উঠতাম — আমার খুব তাড়া, কত কাজ করতে হবে, কিন্তু সে আমাকে দরজা খুলতে দিতো না। পালাবার জন্যে আমাকে নানা ফন্দি বার করতে হতো।

আমি খানিক খাবার নিয়ে খাঁচার একেবারে পিছনকার কোণে রাখতাম, আর যখন সে খেতো আমি দৌড়োতাম প্রাণপণে। কিন্তু এটা বেশী দিন খাটলো না, অল্পদিনের মধ্যেই নিউর্কা ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। কয়েক দিনের মধ্যেই আমি যাবার জন্যে ফিরলেই সে ঝাঁপ দিতো তার ডোবায়, আর অবশ্যই আমি সেটা ঘুরে হেঁটে আসার আগেই সাঁতরে সে হতে পারতো পার। তারপর সে তার সমস্ত

দেহটা দরজার উপর চেপে সেটা খুলতে দিতো বাধা। আর সেরকম একশ চল্লিশ কিলোগ্রাম ওজনের একটা মোটা জন্তুকে নড়াবার চেষ্টা করে একবার দেখো না! নিউর্কা প্রায়ই আমাকে বন্দী করে রাখতো যতক্ষণ না আশ মিটিয়ে আমার সঙ্গে খেলাটা হতো শেষ। তার খেলার ধরনটা আমাদের মতো নয়, সিন্ধুঘোটকের মতো। সে চেষ্টা করতো তার সঙ্গে আমাকে ডোবায় নামাতে, আর আমি যখন নামতে চাইতাম না সে তখন আমাকে ঠেলতে শুরু করতো তার নাক দিয়ে। একেবারে একলা জলে নামতে সে ভালোবাসতো না। ডোবাটা ছিল ছোট আর অসুবিধেজনক। তাছাড়া তাতে একেবারে একলা তার একঘেয়ে লাগতো।

দিনের প্রায় সবটাই নিউর্কা কাটাতো ডোবার তীরে ঘুমিয়ে। আমি ঠিক করলাম তার ব্যায়ামের জন্যে তাকে নিয়ে বেড়াতে যাবো।

কিন্তু শুনতে যত সহজ কাজটা করা তত সহজ নয়। নিউর্কা খাঁচা থেকে বেরুবার কোনো উৎসাহই দেখাতো না।

আমি দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে তাকে ডাকতাম। সে অধৈর্য হয়ে ডেকে তার নাকটা বাড়াতো, কিন্তু দোর গোড়াটা পেরবে কিনা সে বিষয়ে মনস্থির করতে পারতো না।

তাকে আমি ধীরে ধীরে বেড়াতে যাওয়ায় অভ্যস্ত করে দিলাম। মাছ দিয়ে তাকে লোভ দেখাতাম, প্রত্যেক পা যাবার জন্যে তাকে আমি দিতাম একটা করে টুকরো। এইভাবে পায়ে পায়ে আমরা ক্রমশ চলে যেতাম দূরে। আমরা বেশীক্ষণ বাইরে থাকতাম না। বালির উপর নিউর্‌কা তার সামনের পাদুটো ঘষটে ঘষটে চলতো, আর তাছাড়া সে বেশীক্ষণ বাইরে থাকতেও পারতো না। তাসত্ত্বেও বেড়াতে যেতে তার ভালো লাগতে শুরু করলো।

সন্ধেয় আমরা বেরুতাম যখন সব দর্শক চলে যেতো আর পাহারাওলাদের বাঁশি চিড়িয়াখানা বন্ধ হবার সংকেত জানাতো। এই বাঁশির শব্দ ছিল নিউর্‌কার কাছে সংকেতের মতো। কোনো একটা পথে আমার আবির্ভাবের জন্যে সে শুরু করতো দেখতে। আমি যখন তার খাঁচার কাছে যেতাম তখন সে দরজার উপর আছড়ে পড়তো যাতে দরজাটা খুলতে আমার সাহায্য হয়। আর যখন আমি তালাটা খুলে নিতাম তখন দরজাটা সে ধাক্কা দিতো তার নাক দিয়ে। এমন কি সে ছিটকিনিটা খুলতেও শিখেছিল। যখন আমি খাঁচাটা পরিষ্কার করতে চাইতাম তখন আমি নিউর্‌কাকে বাইরে বার করে দিয়ে ভিতর থেকে ছিটকিনি দিয়ে দিতাম যাতে সে অসুবিধা না করে। প্রথম প্রথম সে জোরে চিৎকার করতো আর চেষ্টা করতো আবার ভিতরে ঢুকতে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আমাকে ঠকাবার একটা উপায় সে আবিষ্কার করে ফেললো। তার নাক দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ওপর দিকে ঠেলে ছিটকিনিটা তুলে সে খুলতো দরজাটা। নাক দিয়ে সে খুব জোরে ধাক্কা দিতে পারতো।

আমার মনে আছে নিউর্‌কা একবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, ডাক্তার এসেছিলেন দেখতে। তাঁকে সে ভারি সন্দেহ করেছিল। সে সামনের দিকে তার ঘাড়টা তুলে নাড়িয়ে, একমুখ হাঁ করে ভয় দেখিয়ে করেছিল গর্জন। ডাক্তারকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম তাকে যেন তিনি স্পর্শ না করেন। কিন্তু আমার কথায় তিনি একেবারে কান দেন নি। তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তার কাছে। তিনি তাকে স্পর্শ করার আগেই নিউর্‌কা তার মাথার একটা ভয়ংকর ধাক্কা দিয়ে তাঁকে সরিয়ে দিয়েছিল এক পাশে।

এমন কি আমিও আশা করি নি যে সে অমন জোর দেখাবে। তারপর থেকে নিউর্‌কা ডাক্তারকে তার কাছে আসতে দিতো না।

শীতকালে ডোবাটা জমে গেল। নিউর্‌কাকে স্থানান্তরিত করা হলো ভিতরকার ঘরে। আমার বদলে তখন অপর একজন পরিচারক করতো তার দেখাশোনা।
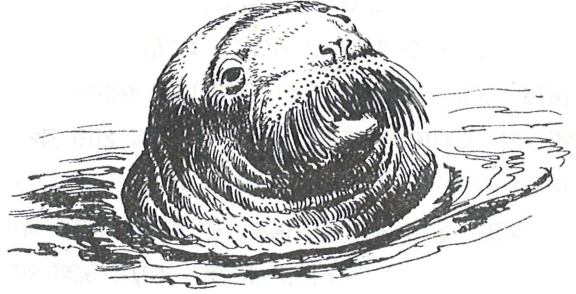
সঙ্গে সঙ্গে মোটা কদাকার নিউর্‌কাকে তার পছন্দ হয়ে গেল। সর্বদাই তাকে সে দিতো বাড়তি এক টুকরো করে মাছ আর চাপড়ে আদর করতো তাকে। তার একেবারেই ভালো লাগতো না যে তার চেয়ে আমাকে নিউর্‌কা ভালো করে চেনে।

সে আমাকে বলেছিল, ‘অত ঘন ঘন আপনি আসবেন না। ওকে আপনার কথা ভুলে যেতে দিন।’

বৃদ্ধ পরিচারককে দুঃখ না দেবার জন্যে নিউর্‌কার কাছে যাওয়া আমি থামিয়ে দিলাম। আর নিউর্‌কাকে সময় দিলাম যাতে তার সঙ্গতে সে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

এক মাস কেটে গেল। বন্ধুটির জন্যে আমার মন কেমন করতে লাগলো। আমাকে সে আবার চিনতে পারে কিনা জানার জন্যে কৌতূহলী না হয়ে আমি পারলাম না। একদিন সিলদের বাড়ীর পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি স্থির করলাম ভিতরে যেতে।

নিউর্‌কা শুয়ে ছিল জলের তলায়। তার নাকের ডগাটা ছাড়া আর সবকিছুই ছিল অদৃশ্য। থেকে থেকে নাকের ডগাটা বের করে নিঃশ্বাস নিয়ে সে আবার লুকিয়ে পড়তো জলে।

আমি খুব ধীরে ধীরে নিউর্‌কাকে ডাকলাম, কিন্তু এমন কি জলের তলা থেকেও সে চিনতে পারলো আমার স্বর। এক মিনিটের মধ্যেই নিউর্‌কা শুকনো ডাঙায় এলো উঠে। আমি পিছিয়ে যেতে পারার আগেই পিছনের পায়ে ভর দিয়ে

সে দাঁড়িয়ে উঠলো আর দুটো ভারি ভারি পায়ের চাপ পড়লো আমার কাঁধে।

আমার কোটের উপর দিয়ে জলের ধারা বইতে লাগলো, একটা ভিজে গোঁফওলা মুখ আমার মুখের উপর সস্নেহে হলো গুঁজে দেওয়া। কোনো মতে আমি শুধু আমার পায়ের উপর খাড়া হয়ে রইলাম। ওরকম পাহাড় প্রমাণ মাংসের ভর তামাসার কথা নয়! উল্লাসের চোটে সে আমার দম প্রায় বন্ধ করে দিলো! পালিয়ে আসতে আমাকে বেজায় বেগ পেতে হয়েছিল।

আমি চলে যাবার সময় নিউর্‌কা ঘষটে ঘষটে খাঁচার শিকগুলোর কাছে এসে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, আমি চলে যাবার পরে অনেকক্ষণ আর্তনাদ করলো করুণ স্বরে। আমাকে বলা হয়েছিল যে তার চোখ দিয়ে সত্যিকারের জল পড়েছিল। আর সেদিন সে খায় নি।

আর রাতে নিউর্‌কা তার ভারি শরীরের চাপে তারের জালটাকে আলগা করে করিডরে বেরিয়ে পড়লো। একটার পর একটা দরজা খুলে খাড়া সিঁড়ি দিয়ে উঠে চিলে-কোঠায় পেঁছে সেখান থেকে এক দরজা দিয়ে গিয়েছিল ছাতে। নিস্তব্ধ রাতে তার জোর ডাকটা গেল শোনা। একজন পাহারাদার পেয়েছিল তাকে দেখতে। কয়েক জন লোক সাবধানে তোয়ালেতে ঝুলিয়ে নিউর্‌কাকে নামিয়ে এনে আবার ভরে দিলো তার থাকার জায়গায়।

এরপর আর কখনো সে জাল ভাঙে নি কিম্বা বাইরে যায় নি। কেউই বুঝতে পারে নি সেই রাত্রে কেন সে ও-কাজ করেছিল।

তিউল্‌কা

দক্ষিণ তুর্কমেনিয়া থেকে ১৯৩২-এর গ্রীষ্মকালে দুটো হায়নাকে মস্কোর চিড়িয়াখানায় আনা হয়েছিল। বহুকাল ধরে হায়না সম্বন্ধে আমার কৌতূহল ছিল। আমি পড়েছিলাম যে সেগুলো বদমেজাজী বোকা জন্তু, পোষ মানানো খুব কঠিন। কথাগুলো সত্যি কিনা পরীক্ষা করতে আমার ইচ্ছে ছিল।

তিউল্‌কা আর রেভেকা ছিল দুই বোন — বয়স পাঁচ মাস, ডোরা-কাটা হায়না, অদ্ভুত আর নড়বড়ে, মাথাগুলো তাদের বড় বড় আর ফোলা ফোলা দেখতে। পূর্ণবয়স্ক জন্তুদের চেয়ে ছোট জন্তুরা নতুন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সাধারণত তাড়াতাড়ি অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা খুব ভীতু ধরনের হয় না, মানুষকে বেশী ভয় পায় না। তাদের পোষ মানানো অনেক সহজ।

অল্পদিনের মধ্যেই হায়নাগুলো আমাকে পছন্দ করে ফেললো। যেমুহূর্তে আমি খাঁচার মধ্যে আসতাম তারা ছুটে আসতো আমার কাছে। তারা আমার পায়ের কাছে ঘুরতো-ফিরতো, চিৎকার করতো ভারি অদ্ভুত স্বরে — খুব জোরে, কিচকিচ ধরনের সুরে, শেষের দিকটা দীর্ঘস্থায়ী নাক ডাকার মতো। বোঝা শক্ত ছিল সেগুলো স্নেহ কিম্বা বিরক্তি কোনটা প্রকাশ করছে, কারণ হায়নারা ওদুটোই প্রকাশ করে প্রায় একইভাবে। তিউল্‌কার উপরই আমি সবচেয়ে বেশী মনোযোগ দিতাম, অন্যটার চেয়ে তার গায়েই বেশী বার বোলাতাম হাত, আর তার জন্যে নিয়ে আসতাম লজেন্স। যখন আমার সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়ে গেল তখন আমি শুরু করলাম তাকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতে। প্রথমবার বাইরে গিয়ে সে সবকিছু দেখেই ভয় পেলো — অপরিচিত মানুষ আর জন্তু, আর সবচেয়ে বেশী শিকলকে।

সেটা তার কানের কাছে করছিল ঝনঝন, তার দম বন্ধ করে দিচ্ছিল, তাকে পালাতে দিচ্ছিল বাধা। ভয় পেয়ে তিউল্‌কা চেষ্টা করলো পালাতে আর সবকিছুকে কামড়াতে — শিকল, বেঞ্চি, তার নিজের থাবাগুলো। মনে হলো সে বুঝি পাগল

হয়ে গেছে। বেশ ধস্তাধস্তি করার পর তার ঘাড়ের কাছটা ধরে তাকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম খাঁচায়।

পরের বার শিকলের বদলে একটা চামড়ার ফিতে ব্যবহার করে তাকে আমি বাইরে নিয়ে গেলাম রেভেকার সঙ্গে। তারা দু'জনে থাকলে কোনো গণ্ডগোল হতো না। দুই বোনে থাকতো গা ঘেঁষে, আর সেরকম ভয় পেতো না।

একটা ঘেরা জায়গায় তাদের আমি খেলতে দিতাম। রেভেকার চেয়ে তিউল্‌কা খেলতে বেশী ভালোবাসতো। সে তার বোনকে টেনে আনতো ঘাড় ধরে, কিম্বা পিছন থেকে এসে কামড়াতো তাকে ধীরে ধীরে। রেভেকা সর্ব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতো, সব সময় চেষ্টা করতো লুকোতে। তিউল্‌কার সাহস ছিল অনেক বেশী। অল্পদিনের মধ্যেই তার বাইরে বেড়ানোটা অভ্যেস হয়ে গেল। দুটো খাঁচার মাঝখানে সে হাঁটতো স্বচ্ছন্দে, দর্শকদের দেখে একটুও ভয় পেতো না।

চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা অবস্থায় সে ভালোই চলতো, কিন্তু সে ছিল ভারি একগুঁয়ে। যখন সে যেতে চাইতো না তখন দাঁড়িয়ে কিম্বা শুয়ে পড়তো। তাকে তুমি ডাকো, লোভ দেখাও কিম্বা তার চামড়ার ফিতেটা ধরে টানো, তিউল্‌কার দম বন্ধ হয়ে আসতো, সে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতো, কিন্তু তবু নড়তো না। তার চারটে থাবাই মাটিতে গেঁথে দিতো, ফলে তাকে সে জায়গা থেকে নড়ানো হতো কঠিন। আমাকে তুলে নিতে হতো তাকে আর বয়ে নিয়ে যেতে হতো খানিকটা।

প্রায়ই এ ঘটনা ঘটতো। এ ধরনের যাত্রায় তিউল্‌কা অল্পদিনের মধ্যেই এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়লো যে সে এমন কি বাধাও দিতো না। তাকে নিয়ে আমাকে যা খুসি করতে সে দিতো।

একটুকরো মাংসের জন্যে সে রেভেকার সঙ্গে করতো লড়াই, কিন্তু তার ভাগটা আমাকে সে সর্বদাই দিয়ে দিতো একটুও না খেঁকিয়ে। মাঝে মাঝে একটুকরো মাংস আমার হাতের মধ্যে টিপে ধরে সেটা দিতাম তিউল্‌কাকে। সে আমার হাতের সবটা চাটতো, সেটাকে ভরতো তার মুখের মধ্যে। অথচ সেই দাঁতগুলো, যা দিয়ে হাড়গুলোকে চিনির মতো পারে গুঁড়ো করে দিতে, কখনো আমার হাতের উপর সামান্যতম দাগও ফেলতো না।

গ্রীষ্ম যখন শেষ হয়ে এলো তখন আমাদের হলো বিদায় নিতে। রেভেকাকে বিক্রী করে দেওয়া হলো অন্য আর একটি চিড়িয়াখানায় আর তিউল্‌কাকে স্থানান্তরিত করা হলো'জন্তুদের দ্বীপে'।
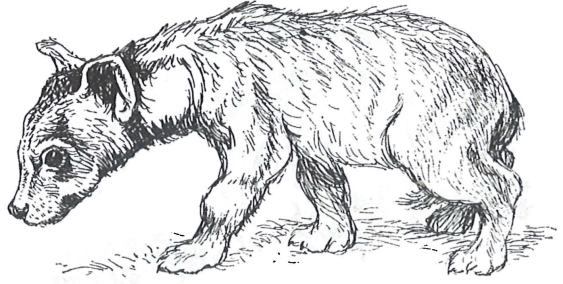
'জন্তুদের দ্বীপটা' ছিল নতুন এলাকায়। সেখানে যাবার আমার কখনো সময় হতো না।

এক বছরের উপর কেটে গেল। তার মধ্যে একবারও আমি তিউল্‌কাকে দেখতে যাই নি। প্রথমে আমার ভয় হতো সে হয়তো বিচলিত হয়ে পড়বে। পরে আমার স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল যে সে আমাকে নিশ্চয়ই ভুলে গেছে। কিন্তু আমি যেরকম ধারণা করেছিলাম তার চেয়ে এই হায়নাটির স্মরণশক্তি অনেক ভালো ছিল।

তখন আমি গাইডের কাজ করতাম। একদিন আমি গিয়েছিলাম সিংহদের এলাকায়। অকস্মাৎ শুনি একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ। দেখলাম একটা হায়না তার খাঁচার মধ্যে দারুণ ছুটোছুটি করছে। সে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। এমন কি দর্শকরাও লক্ষ্য করলো এটা। বহুক্ষণ ধরে আমি বুঝতে পারলাম না এটার কারণটা কী।

সেটা একটা পূর্ণবয়স্ক হায়না। মনে হলো না তাকে আমি চিনি। তবুও সেটা স্নেহের ভাব দেখাচ্ছিল আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছিল আমাকে উদ্দেশ করে। পরে আমি পরিচারকের কাছ থেকে শুনেছিলাম যে সে-ই হলো তিউল্‌কা, তাকে সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল সিংহদের এলাকায়।

এরপর থেকে তাকে আমি কয়েক বার দেখতে গিয়েছিলাম, আদর করেছিলাম তাকে, তারপর আমি চলে গিয়েছিলাম ছুটিতে। দু'মাস পরে আমি ফিরলাম। শুনলাম তিউল্‌কাকে 'জন্তুদের দ্বীপে' অন্যান্য হায়নাদের কাছে স্থানান্তরিত করা হবে। তাকে দেখার জন্যে আমি গেলাম।
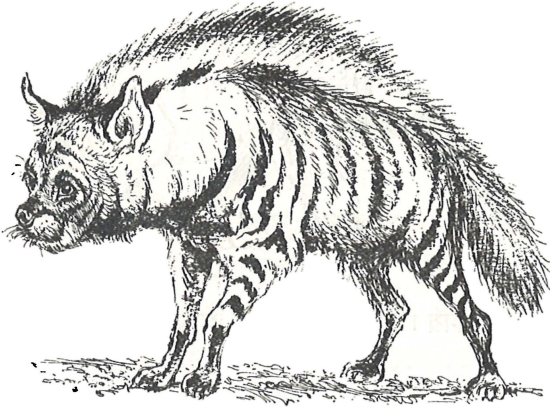
'ছেলে' আর 'মেয়ে' হায়নাগুলো ছিল তিউল্‌কার চেয়ে আকারে অনেক বড়। তারা একত্র বড় হয়ে উঠেছিল, নবাগতকে তারা বন্ধুর মতো স্বাগত জানালো না। তাদের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠলো আর হিংস্রভাবে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে তারা ক্রমাগত পাক খেতে লাগলো তিউল্‌কার চারিদিকে।

সবচেয়ে দূরের কোণে বেচারা তিউল্‌কা জড়োসড়ো হয়ে বসে করুণ স্বরে চিৎকার করতে লাগলো। প্রথমে তাকে কামড়ালো 'মেয়েটা'। তিউল্‌কা যখন ঘাড় ফেরালো তাকে কামড়ালো 'ছেলেটা'। তিউল্‌কার কাছ থেকে তাদের তাড়াতে অনেকক্ষণ লাগলো। পরিচারক চেষ্টা করলো তিউল্‌কাকে বাইরে আনতে। কিন্তু যন্ত্রণায় আর ভয়ে পাগল হয়ে উঠে কাউকে সে তার কাছে আসতে দিলো না। পরিচারকদের সে করতে লাগলো আক্রমণ, তাদের হাত থেকে লাঠিগুলো ছিনিয়ে নিয়ে দাঁত দিয়ে সেগুলোকে ছোট ছোট টুকরো করে ফেলতে লাগলো। তার উপর একটা জাল ফেলার চেষ্টা করা হলো, কিন্তু সেটাও হলো ব্যর্থ।

তখন আমি স্থির করলাম তাকে আমি নিজে বার করবো। প্রত্যেকে চেষ্টা করলো আমাকে নিরস্ত করতে। তারা বললো এতে কোনো লাভ হবে না, বললো যে আমার সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি অনেক দিনের, সে আমাকে চিনতে পারবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ভিতরে গেলাম।

আমাকে দেখার পর তিউল্‌কা দেয়ালের আরো কাছে ঘেঁষে গিয়ে গরগর করতে লাগলো আর কটমট করে তাকাতে লাগলো রাগী দৃষ্টিতে। তার লোমগুলো উঠলো দাঁড়িয়ে, তাতে তাকে দেখাতে লাগলো আরো বড়, তার রক্তমাখা মুখ

আর গলার বড় ক্ষতটার দরুন তার চেহারাটা হয়ে উঠলো অস্বাভাবিক রকম হিংস্র।

সত্যি কথা বলতে কি আমিও মনে মনে খুব ভরসা পেলাম না। তার কাছে যাবার জন্যে কয়েক বার চেষ্টা আমি করলাম, কিন্তু প্রত্যেক বারই আমার দিকে সে তেড়ে এলো দাঁত কিড়মিড় করে। তখন প্রত্যেককে আমি বললাম সেই ঘেরা জায়গার বাইরে যেতে, তারপর একটুখানি সরে গিয়ে আমি তাকে ডাকতে শুরু করলাম।

'লক্ষ্মী মানিক তিউল্‌কা', — আদর করে আমি ডাকলাম। — 'আমার কাছে আয়, হেঁড়েমাথা!'

এই পরিচিত কথা আর স্বরের জন্যে কিম্বা সে শুধু আমাকে চিনতে পেরেছিল বলেই কিনা তা আমি জানি না, কিন্তু তিউল্‌কা, ভয়ঙ্কর রক্তমাখা তিউল্‌কা, এক পূর্ণবয়স্কা হায়না, অকস্মাৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আমার কাছে ছুটে এসে শুরু করলো আমার পোষাকের উপর গা ঘষতে। সেটার সর্বত্র লেগে গেল রক্তের দাগ। আমার পায়ের কাছে গুটিগুটি এসে সে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো।

সাবধানে আমি তার গলায় একটা বকলেস পরালাম, ঠিক তার কানটার কাছে, পাছে তার ক্ষতটাকে স্পর্শ করি এই ভয়ে, তারপর নিয়ে এলাম তাকে বাইরে। 'জন্তুদের দ্বীপটা' সবটা ঘুরে এবং এক বাড়ীর মধ্য দিয়ে খানিকটা পথ হেঁটে আমাদের আসতে হলো। বহুকাল আমরা একসঙ্গে বাইরে বেরুই নি: সে ভয় পেয়ে পালাতে পারে। আরো যেটা খারাপ, সে হয়তো চামড়ার ফিতেটায় দিতে পারে টান, তার ফলে ক্ষতস্থানে ব্যথা পেয়ে সে হয়ে উঠতে পারে হিংস্র। কিন্তু এ সব কোনোকিছুই ঘটলো না।

বকলেসটা তার গলার উপর পিছলে পড়লো, একেবারে তার ক্ষতের উপরে। কিন্তু মনে হলো না তিউল্‌কা যন্ত্রণা অনুভব করছে।

আমার পিছন পিছন শান্তভাবে সে আসতে লাগলো যেন আমরা প্রতিদিন বেড়াতে বেরুই। তারপর সে আমাকে স্বচ্ছন্দে তাকে কোলে নিয়ে, বকলেসটা খুলে খাঁচায় ভরে দিতে দিলো।

চিড়িয়াখানায় সে বহুকাল ছিল, আর যদিও তার কাছে আমি কম যেতাম তাহলেও আমার স্বর শুনলেই সে চিৎকার করতো আর তার খাঁচায় দৌড়োদৌড়ি করতে শুরু করতো। চাইতো আদর খেতে, আর আমি যখন চলে যেতাম সে বহুক্ষণ ধরে যে শিকগুলোর ভিতর দিয়ে আমি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিতাম তার গায়ে নিজের গা ঘষতো।

লোস্‌কা

প্রথম পরিচয়

সকাল থেকেই সবকিছু গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। দুধ কেটে গেছে, মাংস সময়মতো আসে নি। নানা গলায় চেঁচাচ্ছে চিড়িয়াখানার ক্ষুধার্ত বাচ্চারা। সেইরকম সময় এক হরিণছানাকে আমাদের কাছে আনা হলো। আমি নেকড়েছানা, খ্যাঁকশেয়ালছানা, বাচ্চা ভোঁদড় এবং অন্যান্য নানা রকমের জন্তুছানা পালন করেছি, কিন্তু ইতিপূর্বে কখনো কোনো বাচ্চা হরিণের ভার পাই নি। আমি জানতাম না কী করে শুরু করতে হবে। এই জীবটি ছিল ছোট্ট আর হলদে রঙের, প্রায় বাছুরের মতো, কানগুলো গাধার মতো লম্বা লম্বা, আর মুখটাও লম্বা — বাস্তবিকই ভারি অপরিচিত ধরনের। আমি তাকে এক খোঁয়াড়ে রাখলাম।

খোঁয়াড়টা ছিল বড়সড় আর আরামের, তার মধ্যে ছিল ছোট্ট একটি বাড়ী, — বৃষ্টির সময় আশ্রয়ের জন্যে। এই বাচ্চা হরিণটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় সফল হয় নি। যে মুহূর্তে আমি খোঁয়াড়ের মধ্যে গেলাম সে তার বড় বড় সংবেদনশীল কানগুলো খাড়া করে পালালো দৌড়ে। আমি তাকে ডাকলাম, চেষ্টা করলাম দুধ দিয়ে লোভ দেখাতে, কিন্তু সে ক্রমাগত দৌড়ে পালাতে লাগলো। আমার কাছে কিছুতেই তাকে আনতে পারলাম না। অন্য আর একদিনের জন্যে পরিচয়টা মুলতুবি রাখতে হলো।

পরের দিন আমার হেপাজতে রাখা জীবটি অতটা অবাধ্য রইলো না। রাতে তার খিধে পেয়েছিল। গরম দুধের গন্ধে তার খিধেটা আরো বেড়ে উঠলো। করুণ সুরে চিঁচিঁ করতে করতে সে আমার কাছে এলো, কিন্তু রবারের নিপ্‌ল্‌টা মুখে করতে সাহস পেলো না। আমি তখন আসনপিঁড়ি হয়ে বসে বোতলটা নিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম, আর রইলাম খুব স্থির হয়ে। এটা প্রায়ই কার্যকরী হয় — মানুষের চেহারাটাকে দেখায় ছোট আর জন্তুটি এগোয় আরো সাহসের সঙ্গে। হরিণছানাটিও তাই করলো। সে তার খুরগুলোর উপর ভর দিয়ে সাবধানে পা

টিপে টিপে এলো, গলাটা বাড়াতে লাগলো হাস্যকরভাবে। নিপ্‌ল্‌টা সে শুঁকলো, চাটলো সেটাকে, আর অকস্মাৎ বোতলটার প্রায় গলা পর্যন্ত মুখের মধ্যে নিয়ে চুষতে লাগলো খুসি হয়ে। বোতলের ভিতরটা বুদবুদের ফেনায় গেল ভরে, আর যদিও বহুক্ষণ আগেই আমি দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম, তবুও হরিণ বাচ্চাটি ক্রমাগত চললো পান করে।

পরের বার খাবার সময় সে এলো আরো সাহস দেখিয়ে। আমাকে সে দিলো তার মুখের উপরটাতে হাত বোলাতে, আর দিনের শেষে নিজে থেকেই সে ছুটতে লাগলো আমার পিছন পিছন।

দুই বন্ধু

হরিণটাকে আমি নাম দিয়েছিলাম লোস্‌কা। আমার সঙ্গে সে বন্ধুত্ব করলো খুব তাড়াতাড়ি। কয়েক দিনের মধ্যেই আমার পিছন পিছন সে এমন ঘুরতে লাগলো যেন আমি তার মা। আমি তাকে ছেড়ে গেলে সে হেদিয়ে উঠতো, খোঁয়াড়ের মধ্যে বিষণ্ণ হয়ে ঘুরে বেড়াতো, টানাটানা স্বরে কাঁদতো, আর যেদিক দিয়ে সাধারণত আমি আসতাম সেদিকে তাকিয়ে থাকতো সব সময়। লোস্‌কার দৃষ্টি-শক্তিটা ছিল খারাপ। যদি আমি এমন পোষাক পরতাম যেটা সে আগে দেখে নি তাহলে বহুক্ষণ ধরে তাকে তাকাতে আর শুঁকতে হতো এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে যে এটা আমি। কিন্তু তার শ্রবণ আর ঘ্রাণ শক্তি ছিল খুব তীক্ষ্ন। দূর থেকেই আমার স্বর শুনলে সে আদর করতে ছুটে আসতো আমার কাছে, তার হাবভাব ছিল ভারি স্নেহপূর্ণ। আমার ঘাড়ের উপর তার মাথাটা রেখে আমার গালটাকে আলতোভাবে চিমটি কাটতো ঠোঁট দিয়ে। এটা যখন সে করতো আমি তাকে তখন এমন ভালোবাসতাম যে-রকম অন্য কোনো জন্তুকে কখনো আমি ভালোবাসি নি।

কখনোই এমন দিন যেতো না যেদিন আমি আমার আদুরে জীবটিকে দেখতে আসতাম না কিম্বা নিয়ে আসতাম না তার জন্যে কোনো ছোটোখাটো উপহার। আমার প্রাতঃরাশ আর রাত্রির খাবার তার সঙ্গে আমি ভাগ করে নিতাম। সবকিছু সে খেতো — লজেন্স, চিনি, পিঠে এমন কি স্যাণ্ডউইচও। এক কথায়

এমন কোনো জিনিস ছিল না যেটা আমার হাত থেকে সে না খেতো।

মনে আছে, একবার সে অসুস্থ হয়ে পড়লো, ওষুধ খেতে চাইলো না, ওষুধটাকে রুটির গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে একটা বড়ি পাকানো হলো আর সেটাকে ডোবানো হলো দুধে। কিন্তু হরিণের ঘ্রাণ-শক্তি খুব তীক্ষ্ন, অত সহজে তাকে ভোলানো যায় না। আমি তখন ভার নিলাম তাকে ওষুধ খাওয়াবার। আমি সেটা লুকতে বা তার স্বাদ চাপা দিতে কোনো রকম চেষ্টা করলাম না। আমি সেটা সোজা এক টুকরো রুটির উপর ঢেলে মিষ্টি করে লোস্‌কাকে বললাম সেটা খেয়ে নিতে। বহুক্ষণ সে আপত্তি জানালো, সে শুঁকতে লাগলো, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগলো আর ফিরিয়ে নিতে লাগলো মুখটা।

কয়েক বার সেটা সে মুখে নিয়ে থু থু করে দিলো ফেলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা সে গিলে ফেললো। এদিকে কিন্তু কোনো অপরিচিত লোকের হাত থেকে সে খাবার খেতো না। তার কারণ সম্ভবত সর্বদাই আমি তার খাবার তৈরি করতাম, সর্বদাই বাছতাম তার পছন্দমতো জিনিসটি। সবাই জানতো না সে কী পছন্দ করে। যখন সে বাচ্চা ছিল তখন সে খুব পছন্দ করতো গাজর আর রাস্ক বিস্কুট, পরে — জই, ভুষির কাই আর রুটি। খড় সে ছুঁতো না, সে আসপ্‌ আর ওক গাছের ডাল খেতে ভালোবাসতো। শীতের শেষে এগুলো সাধারণত দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠতো, কিন্তু লোস্‌কার জন্যে সর্বদাই কিছুটা থাকতো।

পেটুক লোস্‌কা

লোস্‌কা ছিল খুব পেটুক। প্রায়ই সে সবচেয়ে মুখোরোচক টুকরোগুলো তুলে নিয়ে বাকিগুলো ছড়িয়ে দিতো মাটির উপর। এই নিয়ে তার সঙ্গে আমার ঝগড়ার শেষ ছিল না! বাস্তবিকই এতো খুঁতখুঁতে হলে কি আর চলে! ওক গাছের ফলগুলো তেতো হলে হবে কি, সেগুলো তো উপকারী, তাই না?

একদিন শাস্তি দেবার জন্যে তাকে আমি বেড়াতে নিয়ে গেলাম না। লোস্‌কা বেড়াতে খুব ভালোবাসতো। আমি তাকে বেড়াতে নিয়ে গেলে সবচেয়ে কুৎসিত আর তিক্ত খাবার খেতো। দর্শকরা আসার আগে খুব সকালে আমরা যেতাম বেড়াতে। চিড়িয়াখানার মধ্যে সব জায়গায় আমরা বেড়াতাম, মাঝে মাঝে খাবারের জন্যে যেতাম গৃহস্থালি বিভাগে কিম্বা এমন কি খাবার ঘরে। কতকগুলো জায়গায় লোস্‌কা যেতে ভালোবাসতো, কিন্তু এমন কতকগুলো জায়গা ছিল যেখানে যেতে সে পেতো ভয়, সম্ভব হলে সর্বদাই যেতো এড়িয়ে। প্রায়ই এর কোনো না কোনো কারণ থাকতো। যেমন, সে ভয় পেতো সিংহের বাড়ীকে, একবার সেখানে সে পেয়েছিল দারুণ ভয়। খোলা দরজা দিয়ে সে ঢুকে পড়েছিল কিছু না ভেবেই। তার আবির্ভাবে কী উত্তেজনা আর হৈ-চৈ না হয়েছিল! চিতাবাঘগুলো তাদের খাঁচার মধ্যে শিকের কাছে এসেছিল ছুটে, সিংহগুলো গর্জন করতে করতে করছিল পায়চারি, আর রাজি নামে সবচেয়ে হিংস্র বাঘ নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে বসে ছিল, অপেক্ষা করছিল লাফাবার মুহূর্তটির জন্যে।

বেচারা লোস্‌কা! সে এতো ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে চেষ্টা করেছিল ভুল দরজা দিয়ে বেরুতে। তাকে আমি নিয়ে গিয়েছিলাম ঠিক দরজাটায়। আমার গায়ে গা ঘেঁষে সে থরথর করে কাঁপছিল।

তারপর থেকে লোস্‌কা সর্বদা সিংহের বাড়ীটাকে ভালো করে চিনতে পারতো। আমরা যখন তার পাশ দিয়ে যেতাম সে আড়চোখে ভীরুভাবে তাকাতো আর কানগুলোকে ফেলতো নামিয়ে। কিন্তু খাবার ঘরে যেতে কখনো সে ভুলতো না! সে ভালো করেই জানতো তার জন্যে সেখানে কী রয়েছে। টেবিলগুলোর মাঝখান দিয়ে সে গম্ভীরভাবে হেঁটে যেতো খাবার নেবার জায়গায়। সেখানকার মেয়েটি

চিনতো তাকে। যেসব মুখোরোচক জিনিসের দাম আমি দিতাম সেইসব মুখোরোচক জিনিসগুলি সে তাকে দিতো আর নিজের খরচে যোগ করে দিতো আরো কিছু জিনিস। লোস্‌কা বেরিয়ে আসতো ধীরে ধীরে।

তার সবচেয়ে প্রিয় বেড়াবার জায়গা ছিল চিড়িয়াখানার ভিতরকার বড় পুকুরের চারিধারের পথটা। সেখানে সে দৌড়োতে আর লুটোপুটি করতে ভালোবাসতো, সবচেয়ে ভালোবাসতো উইলো গাছের সুস্বাদু ডালগুলোকে চিবুতে। সেগুলোকে সে কী ভালোই না বাসতো! গাজরের চেয়ে বেশী, রাস্ক বিস্কুটের চেয়েও বেশী, এমন কি চিনির চেয়েও বেশী।

মাঝে মাঝে এই ভোজ তার এতো ভালো লাগতো যে, বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও আমি ডাকার সঙ্গে সঙ্গে সে আসতো না। মিথ্যেই যে সবাই তাকে পেটুক বলে ডাকতো, তা নয়। প্রথমে এই ব্যাপারটা আমি লক্ষ্য করি নি। কিন্তু যখন ঘটনাটা ঘনঘন ঘটতে লাগলো আমি স্থির করলাম পরের বার যখন পুকুরের চারিদিকে আমরা বেড়াতে যাবো তখন এই অবাধ্য হরিণটাকে দেবো উচিত শিক্ষা।

লোস্‌কা যখন উইলো ডালগুলো নিয়ে ব্যস্ত ছিল আমি নিঃশব্দে সরে পড়ে লুকিয়ে পড়লাম ঝোপের মধ্যে। ভাবলাম, 'এইবার, আমাকে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করো! অবাধ্য হওয়ার ফল কি তুমি বুঝতে পারবে!' আমি অপেক্ষা করছি আর ভাবছি কী ঘটে।

কী যে ঘটেছে তা লোস্‌কা সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করে নি। কিন্তু নিজেকে একলা আবিষ্কার করে সে কী ভয়ই না পেয়েছিল! সে সবেগে সামনে ছুটলো আর যেভাবে হরিণরা তাদের মায়েদের ডাকে তেমনভাবে ডাকতে লাগলো। সে এমন দারুণ জোরে ছুটতে লাগলো যে মনে হলো কিছুই তাকে থামাতে পারবে না। আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। ধরো, সে যদি হোঁচট খেয়ে একটা পা ভেঙে বসে!

গুপ্ত জায়গা থেকে লাফিয়ে উঠে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'লোস্‌কা, লোস্‌কা!'

আমার স্বর প্রথম শোনার পর লোস্‌কা দাঁড়িয়ে পড়লো স্থির হয়ে। তারপর আমার কাছে এসে সমস্ত দিন রইলো কাছে কাছে, যেন ভয় পেলো আবার আমাকে হারিয়ে ফেলবে।

আমার রক্ষাকর্তা

শীতকালে লোস্‌কার খাবার জন্যে গ্রীষ্মকালেই আমি শুকনো ডালপালা জমাতে শুরু করলাম। ভাঁড়ারঘর থেকে সবচেয়ে ভালো ভালো ডালগুলো আমি বাছলাম আর সেগুলোকে রেখে দিলাম লোস্‌কার বাড়ীতে। লোস্‌কা এখন এতো বড় হয়ে উঠেছে যে তার মধ্যে ঢুকতে তার অসুবিধে হয়। শরৎকালে তার রঙ হয়ে উঠলো ধূসর আর লম্বা লম্বা পাগুলো হয়ে গেল শাদা।

অপরিচিত লোকদের লোস্‌কা বিশ্বাস করতো না, এমন কি নিজেকে দিতো না স্পর্শ করতে। কিন্তু তাকে নিয়ে আমি যা খুসি করতে পারতাম। একবার তার খুরের মধ্যে একটা পেরেক ঢুকে গিয়েছিল। অন্য কাউকে সে ক্ষতটা ধুতে দিতো না। তার সঙ্গে আমি খানিক থাকলে ভারি সাবধানে সে তার ছোট্ট থাকার জায়গায় আমার পাশে পড়তো শুয়ে। পা ফেলার আগে বহুক্ষণ ধরে সে তার খুর দিয়ে হাতড়াতো পাছে আমাকে সে মাড়িয়ে ফেলে, এই অস্বস্তিকর ভঙ্গি আর তার টান টান পেশিগুলোর দরুন সে উঠতো কেঁপে কেঁপে।

সে যখন খুব ছোট ছিল তখন থেকেই সে চেষ্টা করতো আমাকে রক্ষা করতে। কানগুলো সে ফেলতো ঝুলিয়ে, হাস্যকরভাবে তাকাতো ট্যারা চোখে আর তার সরু সরু পাগুলো ঠুকতো রেগে গিয়ে। এতে আমার এতো মজা লাগতো যে মাঝে মাঝে আমি পরিচারকদের কাউকে বলতাম আমাকে ধমকাতে কিম্বা আমাকে মারবার অঙ্গ-ভঙ্গি করতে। প্রথমে প্রত্যেকেই তাকে রাগাতে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু লোস্‌কা যখন ছোট ফিকে বাদামি রঙের বাচ্চা থেকে মাঝ বয়েসী ধূসর হরিণে পরিণত হলো ক্রমশ কমে এলো রাগিয়েদের সংখ্যা। শেষটায় সে যখন আমার কাছে থাকতো তখন কেউই আসতে সাহস করতো না আমার কাছে। তার কারণও ছিল...

একদিন লোস্‌কার সঙ্গে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে বেড়াতে আমার সঙ্গে দেখা হলো এক প্রহরীর। চিড়িয়াখানায় সে নতুন এসেছে, হালে হয়েছে তার চাকরি। সে জানতো না যে লোস্‌কা ডালগুলো চিবুতে পারে। তাকে আমি গাছগুলো নষ্ট করতে দিচ্ছি বলে আমাকে সে বকাবকি করতে লাগলো। আমি তাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম যে এটা করার অনুমতি লোস্‌কার আছে, কিন্তু সে এতো

জোরে চিৎকার করছিল যে আমার কথাগুলো তার কানে গেল না। হৈ-চৈ লোস্‌কা যখন শুনলো খাওয়া থামিয়ে সে পাগলের মতো অঙ্গ-ভঙ্গি করা প্রহরীকে দেখতে লাগলো মন দিয়ে। আর তারপর তার কানগুলোকে ঝুলিয়ে সামনের পাগুলো দিয়ে ডিঙি মেরে মেরে ধীরে সে এগুতে লাগলো তার দিকে। লোস্‌কাকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। সেই মুহূর্তে এমন কি আমারও তাকে দেখে ভয় হলো। তার চোখগুলো টকটকে লাল হয়ে উঠেছে আর লোমগুলো উঠেছে খাড়া হয়ে, ফলে সাধারণত তাকে যে রকম দেখায় তার চেয়ে তাকে বড় দেখাতে লাগলো। প্রহরীও ভয় পেয়ে গেল।

আমরা যেখানে ছিলাম তার কাছেই ছিল বাঁদরদের বাড়ী। প্রহরী দৌড়োলো সেখানে, দরজাটা সে সজোরে বন্ধ করতে না করতেই লোস্‌কা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে তার সামনের পায়ের ধারালো খুরগুলো দিয়ে আঘাত করলো দরজাটাকে। কাঠের উপর তার পায়ের গভীর ছাপ পড়ে গেল। এরপর থেকে লোকে তাকে আরো ভয় করতে লাগলো।

ঈর্ষা

লোস্‌কা ছিল খুব হিংসুটে। তার সামনে অন্য কোনো জন্তুর গায়ে আমি হাত বোলালে সে দারুণ চটে উঠে চেষ্টা করতো তাকে লাথি মারতে।

চিড়িয়াখানায় আমার বহু চতুষ্পদ বন্ধু ছিল। লোস্‌কাকে নিয়ে বেড়ানোর সময় আমি প্রায়ই তাদের কোনো না কোনোটির কাছে গিয়ে গায়ে হাত বোলাতাম, মাঝে মাঝে আমি যেতাম আমার পোষা নেকড়েটার কাছে। সিংহদের বাড়ীর সেই ঘটনার পর থেকে লোস্‌কা হিংস্র জন্তুদের ভয় পেতো। কিন্তু ভয়ের চেয়ে ঈর্ষা ছিল বেশী শক্তিশালী। খাঁচাটার উপর সে পড়তো ঝাঁপিয়ে, পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের পায়ের খুর দিয়ে সে ধাক্কা মারতো শিকগুলোকে। একদিকে নেকড়ে, অন্যদিকে হরিণ — মুখোমুখি দাঁড়াতো তারা, চেষ্টা করতো পরস্পরকে আক্রমণ করতে।

শরৎকালে আরো একটি হরিণছানাকে চিড়িয়াখানায় আনা হলো। সেটার নাম ভাস্‌কা।

ভাস্‌কা ছিল পোষা। সঙ্গীর জন্যে তাকে রাখা হলো লোস্‌কার সঙ্গে।

কিন্তু প্রথম অথবা পরবর্তী দিনগুলোতেও এই দুই হরিণের বন্ধুত্ব হলো না। তারা খাবার খেতো ভিন্ন ভিন্ন গামলা থেকে, থাকতো খোঁয়াড়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশে। তারা এমন কঠোর ভাব দেখিয়ে নিজের নিজের দিকে থাকতো যে লোকের মনে হতে পারতো তারা ঝগড়া করেছে। এর জন্যে দায়ি লোস্‌কা, আর তার একমাত্র কারণ হলো আমি ভাস্‌কার দিকে বেশী মনোযোগ দিয়েছিলাম। ভাস্‌কা আসার আগে আমি শুধু লোস্‌কাকেই আদর করতাম। আমি বুঝতে পারলাম যে এই খোঁয়াড়ে তার এক ভাগীদার থাকায় সে খুব চটে উঠেছে।

ভাস্‌কা লোস্‌কার দিকে কয়েক বার অগ্রসর হয়েছিল। তার কাছে গিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে বাড়িয়ে দিয়েছিল তার গলাটা। কিন্তু লোস্‌কা ছিল ভারি গোঁয়ার, প্রতিদিন তার শত্রুতাটা বাড়তে লাগলো।

একদিন আমি খোঁয়াড়ে গেলাম। ভাস্‌কা আমার কাছে এলো ছুটে, যে অদৃশ্য রেখা তাদের খোঁয়াড়কে বিভক্ত করেছিল সেটার বাইরে দৈবাৎ পড়লো তার পা।

ঝড়ের মতো লোস্‌কা ছুটে এলো, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো তাকে, তাকে মারতে লাগলো খুর দিয়ে। একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে ভাস্‌কা পড়ে রইলো মাটির উপর। আমি বৃথাই চেষ্টা করতে লাগলাম তাকে বাঁচাতে। আমার সাহায্যের জন্যে ছুটে আসা প্রহরীর চিৎকার কিম্বা ঘুষিতে কোনো ফল হলো না। লোস্‌কা এতো চটে উঠেছিল যে এসব কোনোকিছু সে লক্ষ্যই করলো না। অবশেষে ভাস্‌কা বহুকষ্টে উঠে দাঁড়ালো। লোস্‌কা করলো তাকে তাড়া, সে গেল পালিয়ে। বেচারা ভাস্‌কা এতো অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে আত্মরক্ষার কোনো চেষ্টাই সে করলো না, শুধু চেষ্টা করতে লাগলো আঘাত এড়িয়ে যেতে আর লাগলো করুণ সুরে চেঁচাতে। হয় এই চিৎকারের জন্যে কিম্বা সমস্ত ব্যাপারটায় সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বলে ভাস্‌কাকে লোস্‌কা তার বাড়ীর মধ্যে তাড়িয়ে দেবার পর ছেড়ে দিলো।

এরপর থেকে সর্বদাই তাকে সে রাখতো দারুণ আতঙ্কের মধ্যে, একাই দখল করে রেখেছিল সমস্ত খোঁয়াড় আর গামলাদুটো। ভাস্‌কাকে সে খেতে দিতো মাঝে মাঝে, সর্বদাই তাকে মারতো লাথি। আবহাওয়া যখন খারাপ থাকতো ভাস্‌কাকে লোস্‌কা তাড়িয়ে দিতো বাড়ীর ভিতর থেকে, আর যখন আবহাওয়া থাকতো ভালো তখন তাকে তাড়িয়ে আনতো বাড়ীর মধ্যে।

বেচারা ভাস্‌কা! লোস্‌কাকে সে দারুণ ভয় করতো। এমন কি সে মারামারিও করতো না। তার সব কথাই মেনে নিতো। তা সত্ত্বেও সর্বদাই সে পড়তো বিপদে, বিশেষ করে আমার কাছে আসতে সে যদি চেষ্টা করতো। অবস্থাটা এমন দাঁড়ালো যে আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সে পালাতো দৌড়ে।

যখন শরৎ এলো লোস্‌কা তখন খুব বড় হয়ে উঠেছে। এখন সে অনায়াসে খোঁয়াড়ের বেড়াটা ডিঙিয়ে পালাতে পারে। তাকে বড় একটা খোঁয়াড়ে স্থানান্তরিত করা দরকার।

তার নতুন বাড়ীটা অনেক ভালো। সেখানে ছিল প্রচুর গাছ আর ঘাস, খেলা ও ব্যায়ামের জন্যে ছিল অনেকটা জায়গা। একমাত্র অসুবিধেটা হলো যে সেটা
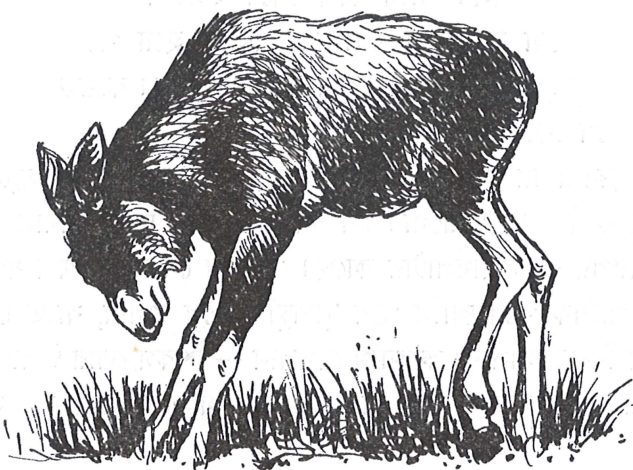
ছিল চিড়িয়াখানার অন্য প্রান্তে, আমি সেখানে ঘন ঘন যেতে পারতাম না। লোস্‌কার এটা পছন্দ হলো না। আমাকে সমস্ত দিন ধরে দেখতে সে ছিল অভ্যস্ত। এখন আমার জন্যে তার মন কেমন করতো।

তবে আমাকে দেখলে কী খুসিই না সে হতো। আমার পিছন পিছন সে ঘুরতো, আমার গায়ে ঘষতো মুখ, আর আগের মতোই তার ঠোঁটগুলো দিয়ে আলতোভাবে চিমটি কাটতো আমার গালে। মাঝে মাঝে সে একটা খেলা শুরু করতো। সে আবিষ্কার করতো কোনো 'শত্রুকে' — কোনো কাঠের টুকরো, মাটির ঢেলা কিম্বা গাছের ডাল, — সেটার উপর পড়তো সে ঝাঁপিয়ে, পদদলিত করতো সেটাকে, কিম্বা সে বহুক্ষণ ধরে খোঁয়াড়ের চারিদিকে ক্রমাগত চলতো ঘুরে। সাধারণত লোস্‌কা খুব সকালের দিকে এইভাবে খেলতো, যখন তাকে বাধা দেবার কেউ থাকতো না। বাকি দিনটা হয় সে থাকতো শুয়ে, নয় তো খোঁয়াড়ের মধ্যে বেড়াতো ঘুরে।

মৃত্যু

শরৎকাল শেষ হয়ে এলো, এলো শীত। সেই শীতকালে আমার ছোটো ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আমি কাজ থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ীতে থাকতাম। যথারীতি আমার দেখা না পেয়ে লোস্‌কা বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল। সব সময় খোঁয়াড়ের মধ্যে সে ঘুরতো জোরে চিৎকার করতে করতে। কয়েক দিন পরে আমি খবর পেলাম যে সে খেতে চাইছে না।

আমি চিড়িয়াখানায় গেলাম। আমার পায়ের নীচে বরফের মুচমুচ শব্দ শুনে লোস্‌কা আমাকে চিনতে পারলো। সে লাফিয়ে উঠে দ্রুত আমার কাছে ছুটে এলো, আর তারপর গেল গামলাটার কাছে। সেখানে সে অনেকক্ষণ ধরে পেটুকের মতো খেলো। খানিক পরে আমি খুব চুপিচুপি চলে এলাম, যাতে সে লক্ষ্য না করে। শেষ বার ফিরে লোস্‌কাকে আমি দেখলাম — শিকগুলোর উপর সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যাবার পথে বহুক্ষণ ধরে তার একটানা কান্না আমাকে অনুসরণ করতে লাগলো।

এইবার আমার দুর্ভাবনা শুরু হলো। বাড়ীতে রুগ্ন ছেলে, চিড়িয়াখানায় — লোস্‌কা। আমি সেখানে না থাকায় সে খেতো না। যখনই আমি তার কাছে যেতাম তখনই সে খেতো। প্রথমে সে ছুটে আসতো আমার কাছে আর তারপর যেতো গামলাটার কাছে। খোঁয়াড়ে শুধু সেই অংশে সে ঘুরে বেড়াতো যেখান থেকে সে শেষবার পেয়েছিল আমার দেখা। তুষারের উপর একটা গভীর গর্ত দেখে বোঝা যেতো যে সে সেখানে ঘুমিয়েও ছিল। চারিদিকে পায়ের ছাপ না পড়া তুষার এবং তার ওপরে পায়ে চলা পথ থেকে বোঝা যেতো যে সে কখনোই আর কোথাও যেতো না, এমন কি তার গামলাটার কাছেও নয়। গামলাটার চারিদিকে পড়ে থাকতো পায়ের ছাপ না পড়া তাজা, মসৃণ তুষার।

লোস্‌কা অনাহারে থাকতে শুরু করলো। তার পেটটা পড়ে গেল, মসৃণ লোমগুলো হয়ে উঠলো খসখসে, চেহারাটা হয়ে গেল একেবারে কঙ্কালসার।

প্রতিদিনই তার অবস্থা হতে লাগলো আরো খারাপ। যে গর্তটায় সে শুয়ে থাকতো ক্রমশ সেটা তার শরীরের চাপে গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠতে লাগলো, আর পথের উপর তার পায়ের ছাপগুলো ক্রমশ হয়ে এলো বিরল।

তারপর একদিন এলো যখন লোস্‌কা বহু কষ্টে উঠে দাঁড়ালো। দুর্বল পায়ে ভর দিয়ে উঠলো টলমল করে। গভীর তুষারের ভিতর ডুবে গেল তার পাগুলো। সেগুলোকে সে তুললো কষ্ট করে। আবার পাগুলোকে যখন সে নামালো ওগুলো কেঁপে উঠলো। সে তার গামলার কাছে গেল না। বহু সাধ্য সাধনার পর কয়েকটুকরো শুকনো রুটি খেলো, যে লজেন্সটা তাকে দিয়েছিলাম সেটা চিবিয়ে ফেলে দিলো থু থু করে, তার ঠোঁট দিয়ে আমার গাল করলো স্পর্শ, তারপর আবার পড়লো শুয়ে।

সে রাতটা আমি ঘুমতে পারলাম না। ক্রমাগত লোস্‌কা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো — কখনো সুস্থ আর ফুর্তিবাজ, কখনো আমি তাকে শেষবার যেমন দেখেছিলাম তেমনি।

খুব সকালে আমি উঠে পড়লাম। একটা অসহ্য অস্বস্তি লাগলাম অনুভব করতে। কোনো কাজ ঠিকমতো করতে পারলাম না। সবকিছুই মনে হলো বিষণ্ণ আর পীড়াদায়ক। তাড়াতাড়ি আমি ছুটে গেলাম চিড়িয়াখানায়।

কিন্তু লোস্‌কা সেখানে তখন আর নেই। আমার কাছে কেউ এলো না, আমি আসায় কেউ উঠলো না দাঁড়িয়ে।

তুষারে পায়ের সব ছাপ ঢেকে গেছে, শুধু লোস্‌কা যেখানে শুয়েছিল সেখানে তখনো রয়েছে একটা গর্ত।

লোস্‌কা মারা যাবার পর বহু বছর কেটে গেছে। তারপর থেকে নানা ধরনের জন্তুছানা আমার হাতে পালিত হয়েছে। কিন্তু আমি এখনো সেই ছোট্ট হলদে ছানাটাকে ভুলতে পারি নি, যাকে আমরা ডাকতাম লোস্‌কা বলে।

আর্গো

আমি যখন খাঁচার মধ্যে গেলাম নেকড়েছানাটা তখন পিছু হটে চলে গেল এক কোণে, আতঙ্কে তার চোখগুলো ট্যারা হয়ে গেল। তার লোমগুলো ফিকে বাদামি রঙের, কপালটা গোল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে আমার পছন্দ হয়ে গেল। আমি যখন কাছে গেলাম তখন সে দাঁতে দাঁত ঘষে লাফিয়ে সরে গেল। সেই কারণে তাকে আমার আরো বেশি ভালো লাগলো।

এই ধরনের নেকড়েছানা আমি পছন্দ করি। তাদের পোষ মানানো কঠিন, কিন্তু একবার কাউকে তাদের ভালো লাগলে কখনো তারা তাদের প্রভুকে ভুলে না।

নেকড়েছানাটাকে আমি ডাকতাম আর্গো বলে। তাকে আমি প্রতিদিন দেখতে যেতাম, তার জন্যে নিয়ে যেতাম হাড় আর মাংসের টুকরো। কিন্তু আর্গো সেগুলোকে স্পর্শ করতো না। যেরকম বুনো স্বভাবের ছিল সেরকমই রইলো। দশ দিন পরে সে আমার হাত থেকে এক কামড় মাংস খেলো। আর তারপর আমার দিকে আড়চোখে ভীরু ভীরু দৃষ্টিতে তাকিয়ে সবটা সে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলে আবার ফিরে গেল তার কোণে। আমি তার গায়ে হাত বোলাবো এতে তাকে রাজি করাতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে আর ধৈর্য ধরতে হয়েছিল। প্রথমে মনে হয়েছিল সে অসাড় হয়ে গেছে — থাবা দিয়ে সে তার নাকটা ঢেকে সামনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে একেবারে চুপচাপ পড়ে রইলো। আমার আদর সে ধৈর্য ধরে সহ্য করলো, কিন্তু একবারও আমন্ত্রণ জানালো না। কিন্তু সে প্রথম যখন আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করলো আমি সেই আনন্দ কখনো ভুলবো না।

ঘটনাটা ঘটেছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। প্রায় দু'সপ্তাহ আমি চিড়িয়াখানায় যাই নি। ফিরে আসার পর প্রথমে আমি গেলাম আমার সর্বশেষ পুষ্যিকে দেখতে। আমার ভয় ছিল যে এই বিচ্ছেদের দরুন সে আরো বুনো স্বভাবের হয়ে উঠবে, আমাকে যাবে ভুলে, আমাকে আর দেবে না তাকে স্পর্শ করতে। কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটলো না। যে মুহূর্তে আমি দরজা খুলে বাড়ীর মধ্যে গেলাম সেই

মুহূর্তেই নেকড়েছানাটি আমার কাছে আসার জন্যে ছুটে এলো তার খাঁচার শিকগুলোর কাছে।

তাকে ল্যাজ নেড়ে, কুঁই কুঁই করতে করতে আমার কাছে আসতে দেখে আমার নিজের চোখকে আমি প্রায় বিশ্বাস করতে পারলাম না।

এমন কি আমি ভাবলাম যে আমি ভুল করেছি, যদিও আমি আর্গোকে ভালো করে চিনতাম। পরের খাঁচায় ছিল লোবো, আর একটা নেকড়েছানা।

লোবো ছিল পোষ-মানা। আমি স্থির করলাম এ লোবোই হবে। দুটো খাঁচার দিকেই আমি তাকালাম — না, লোবো রয়েছে তার জায়গায়, আর আর্গো, বুনো শয়তান আর্গো, তাকে চেনাই যায় না, পেট ঘষটে ঘষটে সে আসছে, আমাকে দেখে এতো খুসি হয়েছে যেন আজীবন সে পোষ-মানা।

সেদিন থেকে সবকিছুই চললো ভালোমতো। অল্পদিনের মধ্যেই আর্গোকে আমি চামড়ার ফিতেয় বেঁধে বেড়াতে নিয়ে যেতে লাগলাম। অবশ্য এটা করতে কিছু সময় লেগেছিল। প্রথমে সে খুব ভয় পেতো, আমার পা ঘেঁষে দাঁড়াতো, চামড়ার ফিতেটা টানতো, কিম্বা অকস্মাৎ ভয় পেয়ে ছুটে যেতো পিছনে। কিন্তু সেটা শুধু গোড়ার দিকে। আর্গো নিজেকে উপযুক্ত ছাত্র বলে প্রমাণ করলো। অল্পদিনের মধ্যেই কুকুরের মতো সে চামড়ার ফিতে বাঁধা অবস্থায় লাগলো হাঁটতে।

গ্রীষ্মকালে তাকে ভরা হলো লোবোর খাঁচায়। দুটো ছানার প্রকৃতিতে যথেষ্ট তফাৎ থাকা সত্ত্বেও তারা হয়ে উঠলো বন্ধু। একটিকে বাইরে নিয়ে গেলে অন্যটির মন কেমন করতো। তার সঙ্গীর সঙ্গে যাবার জন্যে করতো ছটফট। সাধারণত তাদের নিয়ে যাওয়া হতো একসঙ্গে।

আমার এক বন্ধু নিয়ে যেতো লোবোকে, আর আমি নিয়ে যেতাম আর্গোকে। চিড়িয়াখানার পথে পথে আমরা বেড়াতাম। মাঝে মাঝে চিড়িয়াখানায় যখন কেউ থাকতো না তখন আমরা ছানাগুলোর ফিতে দিতাম খুলে। ঠিক কুকুরছানার মতো তারা হুটোপাটি করতো। আর পরস্পরকে করতো তাড়া। আমাদের কাছ থেকে তারা দূরে যেতো না। আর্গো ছিল স্বাধীন প্রকৃতির। মাঝে মাঝে সে চলে যেতো একটু বেশী দূরে। কিন্তু আমি ফিরে যাবার ভাণ করলেই সে চলে আসতো সঙ্গে সঙ্গে।

আর্গো বড় হয়ে উঠলো

প্রায়ই বেড়াতে যাওয়ার ফলে আর ভালো যত্ন পেয়ে আর্গো চমৎকার বড়সড় হয়ে উঠলো।

গ্রীষ্মকালে সে খুব বড় হয়ে উঠলো, আকারে হয়ে উঠলো একটা বড় কুকুরের মতো, আর শীতের শেষে হয়ে উঠলো পূর্ণবয়স্ক। এখন সে শক্তিশালী আর বিপজ্জনক নেকড়ে। কিন্তু বিপজ্জনক সে শুধু অন্যদের কাছেই, আমার কাছে সর্বদাই সে সেই ছোট্ট নেকড়েছানা আর্গো। তার সঙ্গে আমি যা খুসি করতে পারতাম। তার নরম লোমগুলোকে পারতাম ঘেঁটে দিতে, তার থাবা অথবা ল্যাজ ধরে টানতে। একবারও আমাকে সে কামড়ায় নি।

আর্গোর একবার এক্‌জিমা হয়েছিল। অসুখটা বিপজ্জনক নয়, কিন্তু ভারি অস্বস্তিকর। মাসখানেকের মধ্যে আর্গোর ঘন লোমগুলো শরীর থেকে খসে পড়লো, অসুখে ফুলে উঠলো তার শরীরটা, সর্বাঙ্গে দেখা দিলো ঘা। তাতে মলম লাগাতে হতো। আমি তার তদারক করতাম। মলমটায় খুব জ্বালা করতো। আমি সেটা তার চামড়ায় ঘষার সময় যন্ত্রণায় আর্গো চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতো, সে আর্তনাদ করতো আর আমার হাতদুটোকে ধরতো তার ঠোঁট দিয়ে।

তার এক ইঞ্চি লম্বা লম্বা শিকারী দাঁতগুলো আলতোভাবে চাপ দিতো, কখনো আমার সামান্যও

যন্ত্রণা হতো না। এর মানে এই নয় যে আর্গো কামড়াতে পারতো না। তার দাঁতগুলো সহজেই গুড়িয়ে ফেলতে পারতো হাড়, আর মাংস ছাড়াও এমন অন্যান্য জিনিস ছিল যেগুলোকে ছিঁড়তে পারতো তার শিকারী দাঁত।

সেই শীতকালে একটা কুকুর তাকে আক্রমণ করেছিল। আকারে সেটা আর্গোর চেয়ে ছিল অনেক বড়। আর্গোকে সম্ভবত সে মনে করেছিল একটা অ্যালসেশিয়ান। কুকুরটা কাছে এসে অকস্মাৎ বুঝতে পারলো যে আর্গো একটা নেকড়ে। সে ঘুরে দৌড়তে শুরু করলো, কিন্তু ততক্ষণে খুব দেরী হয়ে গেছে। চক্ষের নিমেষে আর্গো ছুটলো তার পিছনে। কুকুরটা অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পালাতে লাগলো বড় বড় লাফ মেরে। পালাতে গিয়ে তুষারে পড়ে ধড়ফড় করে উঠে টলমল করতে করতে দাঁড়িয়ে উঠতে লাগলো। আর্গো তাকে গোঁয়ারের মতো তাড়া করেই চললো তার সুদীর্ঘ মাপা পদক্ষেপে। বৃথাই আমি তাকে চেঁচিয়ে ডাকলাম। সে এমন মেতে উঠেছিল যে মনে হলো কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। ক্রমশ আর্গো কুকুরটার কাছে এগোতে লাগলো... শেষে পেঁছিলো একেবারে কুকুরটার ঠিক পিছনে... ধরে ফেললো সেটাকে। কুকুরটা একপাশে গড়িয়ে পড়লো, তার গলার কাছ থেকে কাঁধ পর্যন্ত গেল চিরে, আর মাঝারি গোছের নেকড়েটা ফিরে এলো, তার গায়ে আঁচড়টি লাগে নি।

নেকড়ের ঘৃণা

আর্গো অপরিচিত লোকদের কাছে যেতো না। তারা যদি তাকে স্পর্শ না করতো, সে কাউকে কামড়াতো না। মোট কথা, এমন ভাব দেখাতো যেন তাদের সে লক্ষ্যই করে নি।

একদিন আমি আর্গোকে দৌড়োদৌড়ি করার জন্যে খোঁয়াড়ে ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিলাম। আধঘণ্টা পরে ফিরে এসে দেখি খোঁয়াড়ের দরজাটা হাট করে খোলা আর তার ভিতরে কোনো নেকড়ে নেই। আমি ভয় পেয়ে গেলাম যদি সে কোনা বিপদ বাধায়, যদি কামড়ায় কাউকে... সেদিনটা ছিল রবিবার, চিড়িয়াখানা

ভরা দর্শকে। পলাতকের খোঁজে আমি ছুটলাম, অবশেষে আবিষ্কার করলাম তাকে ঈগলদের খাঁচার পাশে। ভিড়ের মধ্যে সে বেড়াচ্ছিল, এমন নিঃশব্দে সে মুখ তুলে তাকাচ্ছিল, আর তার হাবভাবটা ছিল এমনই শান্ত যে কেউই বুঝতে পারে নি সে একটা নেকড়ে।

কপাল ভালো যে আর্গোর সঙ্গে পশু হাসপাতালের কর্মচারী নিকোলাই মিখাইলোভিচের দেখা হয় নি। তাকে সে পছন্দ করতো না, সত্যি বলতে কি তাকে সে ঘৃণা করতো, ঘৃণা করতো অতি তুচ্ছ কারণে। আর্গো একবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। নিকোলাই মিখাইলোভিচের উপর ভার ছিল তাকে অন্য একটা খাঁচায় স্থানান্তরিত করার। যাতে আর্গো কামড়াতে না পারে সেইজন্যে সে তার মুখটাকে বেঁধেছিল একটা দড়ি দিয়ে। এই জোর করে বাঁধার জন্যে আর্গো তাকে ঘৃণা করতো। নেকড়েদের স্মরণ-শক্তি খুব ভালো। প্রায় মাস ছয় পরে আর একটু হলেই আর্গো নিকোলাই মিখাইলোভিচের উপর প্রতিশোধ তুলতো। ব্যাপারটা ঘটে এইভাবে।

খোঁয়াড় থেকে একটা চমরী গরু পালায়। নিকোলাই মিখাইলোভিচ এবং চিড়িয়াখানার আরো কয়েকজন কর্মচারী বেরোয় তার খোঁজে। আর্গোর পাশ দিয়ে তাদের যেতে হয়েছিল। হালে আর্গোকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হতো। যে লোকটিকে সে ঘৃণা করতো অনুসন্ধানকারীদের মধ্যে তাকে দেখে আর্গো তার উপর লাফিয়ে পড়লো না। তার খাঁচার পিছনে সে রইলো ওৎ পেতে বসে, তাকে লক্ষ্য করতে লাগলো বেড়াল যেভাবে ইঁদুরকে লক্ষ্য করে। নিজের যে বিপদ হতে পারে নিকোলাই মিখাইলোভিচ সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল। নেকড়েটার খুব কাছ দিয়ে সে করতে লাগলো যাতায়াত।

যতবারই সে তার পাশ দিয়ে যেতে লাগলো ততবারই আর্গোর ধূসর দেহটা কুঁচকে কুঁচকে উঠতে লাগলো, আর সে এমনভাবে চমকাতে লাগলো যে সেটা প্রায় বোঝাই যায় না। কিন্তু প্রতিবারই সে আবার সামলে নিতে লাগলো নিজেকে।

আর্গো ভালো করেই জানতো তার শিকলের দৈর্ঘ্য। প্রায়ই সমস্ত দিন শিকলে বাঁধা অবস্থায় বসে সে নিজের চিত্তবিনোদন করতো চড়াই পাখী ধরে, এ ব্যাপারে সে খুব ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল, একটাও ফসকাতো না। সে জানতো কোন্ সীমার

বাইরে তাদের কাছে সে পেঁছুতে পারবে না, কখনো ভুল করতো না। এবারেও সে ভুল করলো না।

যে মুহূর্তে নিকোলাই মিখাইলোভিচ সেই সীমার মধ্যে এলো আর্গো এক প্রচণ্ড লাফে পড়লো গিয়ে তার কাছে।

দৈবক্রমে নিকোলাই মিখাইলোভিচ বেঁচে গেল। আর্গো শিকলটায় এমন জোরে টান মেরেছিল যে সে পেছনে ছিটকে পড়লো। সে সঙ্গে সঙ্গে তার ভারসাম্য ফিরে পেয়ে আর একবার লাফালো সামনে, কিন্তু নিকোলাই মিখাইলোভিচ ততক্ষণে নিরাপদ জায়গায় সরে গিয়ে তার সার্টের ছেঁড়া কলারটা আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করছিল।

নতুন বাড়ীতে

এ ঘটনার পর 'জন্তুদের দ্বীপে' আর্গোকে লোবো আর দিকার্কা নামে একটি মেয়ে নেকড়ের সঙ্গে স্থানান্তরিত করা হলো। পুরোনো অঞ্চলের ছোট ছোট
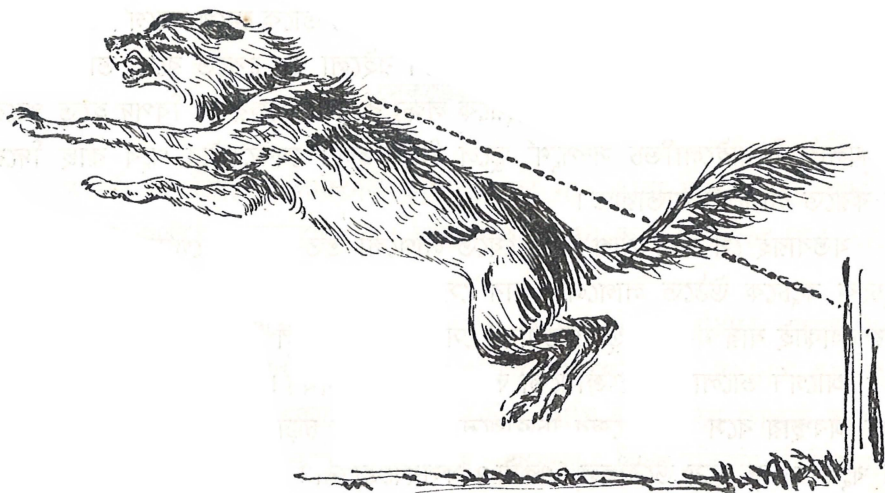
অন্ধকার খাঁচাগুলোর চেয়ে ‘জন্তুদের দ্বীপটা’ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এখানে দৌড়োবার প্রশস্ত জায়গা ছিল, ছিল রোদ, ঘাস, গাছ, আর লোহার শিকের বদলে ছিল জলে ভরা একটা চওড়া পরিখা। এসব মিলে স্বাধীনতার একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল।

‘জন্তুদের দ্বীপে’ যে নেকড়েদের স্থানান্তরিত করা হয়েছিল তাদের উপর শক্তিশালী আর্গো প্রভুত্ব বিস্তার করলো।

আমার কাছে অন্য কোনো নেকড়ের আসার কিম্বা প্রথম মাংসের টুকরো নেবার আইন ছিল না। এই ছোট্ট জমির ছোট্ট নেকড়ে দলের সে ছিল সর্দার। সেখানকার স্বাধীনতার আইনটা আলাদা।

এখানে যেসব নেকড়েছানা জন্মাতো আমার প্রতি তাদের মনোভাবটা ছিল ভারি অদ্ভুত ধরনের।

তারা ছিল বেশ হিংস্র প্রকৃতির। কাউকেই তারা জানতো না। খালি হাতে তাদের কাছে যাওয়া ছিল বিপজ্জনক। কিন্তু আর্গোর জন্যে তাদের মধ্যে আমি স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারতাম। তাদের কাউকে আমার কাছে আসতে সে দিতো না। কেউ আমার খুব কাছে এসে পড়লে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে দিতো কামড়ে।

আর্গো — চিত্রশিল্পী

নেকড়েদের মধ্যে আর্গো ছিল সবচেয়ে সুন্দর আর শক্তিশালী। কোনো ফিল্মের জন্যে নেকড়ের দরকার হলে প্রথমে তাকেই করা হতো পছন্দ।

শীতকালে চিড়িয়াখানার পুকুরের পাশে প্রথম চলচ্চিত্রের ক্যামেরার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। কথা ছিল নেকড়ে শিকারের ছবি তোলা হবে। নেকড়েদের ফাঁদের জন্যে পুকুরটাকে ঘেরা হয়েছিল নিশানা আটকানো দড়ি দিয়ে, সত্যিকারের নেকড়ে শিকারের সময় যেমন করা হয়ে থাকে। নিশানাকে নেকড়েরা ভয় পায়, এতো ভয় পায় যে সেগুলোর উপর দিয়ে লাফিয়ে পালাতেও তারা সাহস করে

না। এ ঘটনার সুযোগ নেয় শিকারীরা। পশ্চাদ্ধাবকেরা যখন নেকড়েদের এই ফাঁদের মধ্যে তাড়িয়ে এনে ফেলে শিকারীরা তখন গুলি ছোঁড়ে।

সব বন্দোবস্ত হলো, যে ক্যামেরা চালাবে সে এক নিরাপদ জায়গায় দাঁড়াবার পর আমি গেলাম আর্গোকে আনতে। দূর থেকে শিকলের ঝন ঝন শুনে সে কান খাড়া করে ছিল, খুসি হয়ে অসহিষ্ণুভাবে চিৎকার করছিল বেড়াতে যাবার জন্যে। আমি শিকলটা আটকে দিলাম, আর্গো ল্যাজ নেড়ে প্রফুল্লভাবে এলো আমার সঙ্গে।

আমরা পুকুরে পৌঁছুলাম। শিকলটা খুলে আমি গেলাম সরে। আর্গো আনন্দিত হয়ে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে খানিক দূরে ছুটে গিয়ে সামনের থাবার উপর ভর দিয়ে বসে তার সঙ্গে খেলা করার জন্যে আমাকে আমন্ত্রণ জানাতে শুরু করলো। অকস্মাৎ শোনা গেল ক্যামেরার খটখট শব্দ। এই অপরিচিত শব্দে নেকড়ের মনোযোগ সঙ্গে সঙ্গে আকৃষ্ট হলো।

সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে সে পড়লো পিছন দিকে লাফিয়ে, আর উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রথমে এক কান চেপে, পরে অন্য কান চেপে শুয়ে শুঁকতে লাগলো বাতাস। দৃশ্যটা ভারি চমৎকার: যে কোনো মুহূর্তে পিছনে লাফাতে কিম্বা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়ে সে যখন সাবধানে কয়েক পা এগিয়ে এলো তার শক্তিশালী ধূসর শরীরটা শাদা তুষারের উপর ফুঠে উঠলো অতি স্পষ্ট ছায়ামূর্তির মতো। ঠিক এই কারণেই ফিল্মের জন্য ছিল তার প্রয়োজন।

পরে ফিল্মের মধ্যে নেকড়েটিকে দেখাবার কথা ছিল যখন সে নিশানাগুলির একেবারে কাছে এসে পড়েছে, কিন্তু তাদের উপর দিয়ে লাফাতে সাহস করছে না। তাকে তাড়াবার আমি যতই চেষ্টা করি না কেন আমার পাশ সে কিছুতেই ছাড়লো না। তার একগুঁয়েমিকে জয় করার জন্যে আমাকে একটা উপায় খুঁজতে হলো। দড়িটা পেরিয়ে আমি কিছু দূরে সরে আর্গোকে ডাকলাম।

আর তারপর ঘটলো সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনা। আর্গো দৌড়ে এসে কুকুরের মতো লাফালো সেই 'সীমা রেখার' উপর দিয়ে, যেটাকে কোনো নেকড়ে পেরুতে সাহস করে না। সে ছুটে এলো আমার পিছন পিছন। শিকারের সব নিয়ম হলো ধূলিসাৎ। যে ক্যামেরা চালাচ্ছিল তার আতঙ্কিত মুখটা ক্যামেরার পিছন থেকে গেল দেখা। ছবিটা নষ্ট হয়ে গেল। আবার সেটাকে গোড়া থেকে তুলতে হলো।

তারপর আমি দড়িটার পাশ দিয়ে হাততালি দিয়ে দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। আর্গো আমার কাছে ছুটে এসে লাফিয়ে পড়তে লাগলো পিছনে। ঠিক এটাই ছিল প্রয়োজন। যে ক্যামেরা চালাচ্ছিল সে খুব খুসি হয়ে উঠলো আর বললো যে বহু দ্বিপদ চিত্রশিল্পীর চেয়ে এই চতুষ্পদ 'চিত্রশিল্পীটির' বুদ্ধি অনেক বেশী।

এরপর থেকে বহুবার আর্গোর ফিল্ম তোলা হয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যেই ক্যামেরার শব্দে সে অভ্যস্ত হয়ে গেল, সেটাকে আর সে লক্ষ্য করতো না। তাকে যা বলা হতো তাই শান্তভাবে করতো। কিন্তু যে লোকটি ক্যামেরার হাতল ঘোরাতো সে হয়ে উঠলো তার সবচেয়ে বড় শত্রু। সে ক্রমাগত চেষ্টা করতো তার পাৎলুনের উপর প্রতিশোধ তুলতে। ক্যামেরা চালককে 'চিত্রশিল্পীর' এক ইঞ্চি লম্বা লম্বা শিকারী দাঁতগুলোর কাছ থেকে প্রায়ই পালিয়ে বাঁচতে হতো গাছে চেপে।

'শিল্পীর' 'দোভাষীর' কাজ করতে হতো আমাকে। নেকড়ের 'কর্তব্য কাজের' কথা প্রযোজক আমাকে বলতো, আর তাকে দিয়ে সে কাজ করানোর উপায় আমি ভেবে বার করতাম। এ কাজ খুব কঠিন ছিল না, কারণ আর্গোর চরিত্র আমি সম্পূর্ণ বুঝতাম। কিন্তু একবার এক ফিল্ম তোলার সময় এমন এক ঘটনা ঘটে আর একটু হলেই যেটার পরিণাম হতো খারাপ।

কথা ছিল একটি মেয়ে আর নেকড়ের মারামারির ফিল্ম তোলার। এমনিতে এটা খুব কঠিন কাজ নয়। আর্গো খেলতে ভালোবাসতো আর খেলার সময় প্রায়ই আসতো আমার দিকে তেড়ে, ভাণ করতো আমাকে কামড়াবার। শুধু দরকার — তাকে খেলতে নামানো।

নির্ধারিত জায়গায় আমরা উপস্থিত হলাম। প্রযোজক আগে কখনো বন্য জন্তু নিয়ে কাজ করে নি। নেকড়েটা অপেক্ষা করতে পারে এই ভেবে সে অন্য কী একটা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। প্রায় তিনটে বাজতে চললো, এটা আর্গোর মাংস পাওয়ার সময়, খিধেয় ক্রমশ সে খুব অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে লাগলো। ক্রমাগত সে লাগলো শুয়ে পড়তে আর উঠে দাঁড়াতে। এটা লক্ষ্য করে আমি জোর দিয়ে বললাম যে ফিল্ম তোলার কাজ সঙ্গে সঙ্গে শুরু হওয়া দরকার। অবশেষে সবকিছু প্রস্তুত হলো। আমার মুখে লাগানো হলো রঙচঙ আর আমাকে বলা হলো একটা ভেড়ার চামড়ার কোট পরতে। ঐ কোটটা সম্বন্ধে আমি আপত্তি করলাম: সেটায় ছিল

ভেড়ার তীব্র গন্ধ, ক্ষুধার্ত নেকড়ের দারুণ প্রলোভনের জিনিস। কিন্তু তাদের সঙ্গে তর্ক করে ফল হলো না, আর তাছাড়া সময়ও ছিল না। নেকড়েটা গরগর করছিল, আমি তার কাছে গেলাম। বিদ্যুৎ গতিতে আর্গো ছুটে এলো আমার দিকে, তার ইস্পাতের মতো দাঁতগুলো বসিয়ে দিলো ভেড়ার চামড়ার উপর। রাগে জ্বলতে লাগলো তার চোখগুলো, আর তার লোমগুলো উঠলো খাড়া হয়ে। যথাসাধ্য শান্তভাবে বার কয়েক তার নাম ধরে ডাকার পর আমার পরিচিত স্বর নেকড়েটা চিনতে পারলো। ধীরে ধীরে অনিচ্ছুকভাবে আর্গো তার দাঁতগুলো তুলে নিয়ে আমার মুখের দিকে বহুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে রইলো চেয়ে। অবশেষে আমাকে চিনতে পেরে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে কানদুটো ঝুলিয়ে নিজের শরীরটাকে সে ঝাঁকালো। তার লোমগুলো মসৃণ হয়ে গেল। তার ভাব দেখে তখন বিশ্বাস করা কঠিন হলো যে মাত্র এক মিনিট আগেও আমি এক ক্রুদ্ধ বন্য জন্তুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলাম।

অনেকগুলো ছবিতে আর্গো অংশ নিয়েছিল — ‘নেকড়ে শিকার’, ‘স্কর্তিনিন পরিবার’, ‘জীবন যুদ্ধ’ এবং আরো অন্যান্য ছবিতে।

আর্গো এখন বুড়ো, তার দাঁতগুলো হয়ে গেছে ভোঁতা, এক ইঞ্চি লম্বা লম্বা শিকারী দাঁতগুলো পড়ে গেছে। কমবয়েসী নেকড়েরা তার স্থান পূরণ করতে প্রস্তুত, কিন্তু তা সত্ত্বেও ‘জন্তুদের দ্বীপে’ ‘চিত্রশিল্পী’ আর্গো এখনো সবচেয়ে সুদর্শন নেকড়ে।

রাজি

রাজিকে আনা হয়েছিল ১৯২৫ সালের শীতকালে। ধ্বংস ও দুর্ভিক্ষের কঠিন বছরগুলোর পর তখন সবে চিড়িয়াখানা জীবজন্তুতে ভরে উঠতে শুরু করেছে। রাজি ছিল আমাদের চিড়িয়াখানায় প্রথম রয়েলে বেঙ্গল টাইগার। তাই তাকে দেখার জন্যে সবার কী আগ্রহ!

যে বাক্সটিতে করে বাঘকে আনা হয়েছিল সেটা ছিল খুব মজবুত — লোহার মোটা পাত দিয়ে বাঁধা। এক কথায় বাক্সটি তৈরি করা হয়েছিল এমনভাবে যাতে জন্তুটিকে নিয়ে আসার সময় পথে কোনোকিছু না ঘটে। বাঘটিকে দেখা যাচ্ছিল না। সে বসে ছিল বাক্সের একটি কোণে, ওখান থেকে শোনা যাচ্ছিল তার অবিরাম চাপা গর্জন। বাক্সটিকে আনা হলো সিংহের খাঁচার কাছে। তারপর দশজন লোক ওটাকে সাবধানে গাড়ী থেকে নামিয়ে খাঁচার গায়ে ঠেস দিয়ে লাগিয়ে শিকের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দিলো যাতে বাক্সটি জায়গা থেকে সরে না যায়।

খাঁচার দরজা খোলা হলে সবাই ভাবলো এই বুঝি বাঘটি এক লাফে খাঁচায় ঢুকে যাবে। কিন্তু জন্তুটির মোটেই তাড়া ছিল না। এবার এমন কি তার চাপা গর্জনও আর শোনা যাচ্ছিল না। মনে হলো, সে যেন লুকিয়ে থেকে কিসের অপেক্ষা করছে। কয়েক মিনিট কেটে গেল... বাঘটিকে খোঁচা দেবার জন্যে পরিচারক যেই একটি লাঠি হাতে নিলো অমনি সে হঠাৎ এক লাফে খাঁচায় গিয়ে ঢুকলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে ফিরেই হিংস্র গর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়লো শিকগুলোর উপর। সবাই খাঁচার কাছ থেকে সরে দাঁড়ালো, তবে বাঘটি কী এক অদম্য ক্রোধে বারবার ঝাঁপিয়ে পড়ছিল শিকগুলোর গায়ে। জন্তুটির শক্তিশালী থাবার আঘাতে খাঁচাটি কেঁপে উঠলো, আর তার ঠোঁটে দেখা দিলো রক্তের ফেনা। পরে বাঘটি হঠাৎ খাঁচার কোণে চলে গেল, এবং যেভাবে সে মুখ ফিরিয়ে মাথাটি লুকোচ্ছিল তাতে বোঝা গেল যে সে মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করছে।

জন্তুটি যাতে শান্ত হয় সেজন্যে ম্যানেজার সবাইকে ওখান থেকে সরে যেতে বললেন। রাত্রে বাঘটিকে দেখাশোনার ভার দেওয়া হলো আমাকে। এতে আমি খুবই খুসি হয়েছিলাম। নতুন বাসায় রাজির কেমন লাগে তা দেখতে ইচ্ছে হলো আমার। আমি পাশেরই একটি বেঞ্চিতে বসলাম। বাঘটি যাতে আমার দিকে মনোযোগ না দেয় সেজন্যে চেষ্টা করলাম একেবারে নড়চড় না করে চুপচাপ বসে থাকতে।

সবাই যখন চলে গেল তখনো রাজি আগের মতো চুপ করে বসে ছিল খাঁচার কোণে। তারপর উঠে এলো সামনের দিকে। কিছুক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো, যেন কোনোকিছু শুনছিল, পরে টেনে টেনে জোরে মিয়াও মিয়াও করতে লাগলো। এর আগে বহুবার আমি বাঘের মিয়াও মিয়াও ডাক শুনেছি, কিন্তু এমন বিষণ্ন ডাক শুনি নি কখনো। 'উ-য়া-ও, উ-য়া-ও,' — মনে হলো, এটা মিয়াও মিয়াও নয়, যেন খাঁচার শিকের ভেতর দিয়ে শূন্য ম্লান দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে আর্তনাদ করছে। আমি উঠে খাঁচার কাছে যেতে চাইলাম, কিন্তু সামান্য নড়তেই সে আমার দিকে ফিরে সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়লো শিকগুলোর গায়ে। এরপর সে আর মিয়াও মিয়াও করতো না। সব সময়ই অনিমেষ তাকিয়ে দেখতো আমি কী করছি, আর একটু নড়লেই উঠতো গর্জন করে।

রাজির খাঁচার কাছে ঝুলছিল একটি উজ্জ্বল বাতি, তাই আমি তাকে ভালো করে দেখতে পেতাম। আমার কাছে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ছিল তার চোখগুলো। চিড়িয়াখানার আর সব বাঘ-সিংহের চোখের মতো নয় ওগুলো — একেবারে অন্যরকম। ঐ জন্তুদের চোখ ছিল বাদামী, আর রাজির চোখ — উজ্জ্বল হলদে। তার চোখ সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। ওগুলোতে ছিল কী যেন এক অদম্য হিংস্রতার ছাপ।

আমি ভালো করে দেখলাম বাঘটির বড়ো, পক্ককেশ মাথা, তার শক্তিশালী পেশল দেহ আর ডোরাকাটা পিঠের উপর বিরাটাকার এক ক্ষতচিহ্ন। দেখে মনে হলো ঘাটি ছিল মারাত্মক। আমি কল্পনাও করতে পারলাম না কী করে সে তা সয়ে নিয়েছে।

অনেক রাত তখন। দু'টা বাজে। আমি বেঞ্চির উপর শুয়ে পড়লাম। তন্দ্রায়

ঢুলছিলাম না ঘুমোচ্ছিলাম জানি না, তবে প্রতিবারই, যখন চোখ খুলতাম, দেখতাম বাঘটি চেয়ে আছে এক দৃষ্টিতে আর শুনতে পেতাম তার চাপা গরগরানির শব্দ। আগের মতোই মেঝের উপর পেটে ভর দিয়ে রয়েছে খাঁচার কোণে — যেকোন মুহূর্তে লাফ দিতে পারে। সকালবেলা যখন পরিচারক এলো, শিকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শুরু করলো বিকট গর্জন।

প্রথম দিন পরিচারক রাজিকে যে মাংস দিলো সে তা এমন কি ছুঁলোই না। খেলো না সে কয়েক দিন। শেষ পর্যন্ত ক্ষুধার জ্বালা আর সইতে পারলো না। চারিদিকে তাকিয়ে রাজি চোরের মতো গেল মাংসের কাছে। মাংসের টুকরোটি সে শুঁকলো, তারপর সামনের পা দুটোতে ভর দিয়ে বসে তা খেতে লাগলো। খাচ্ছিল সে অশান্তভাবে, থেমে থেমে, এবং সব সময়ই প্রস্তুত ছিল ঝাঁপিয়ে পড়তে।

চিড়িয়াখানায় আসার পর থেকে সর্বদাই সে এভাবে খাবার খেতো। অন্য বাঘগুলো মাংস পেয়েই শুয়ে পড়তো, কিন্তু রাজি শুধু গুঁড়ি মেরে বসতো। বনে থাকলে বাঘেরা যেমন খায় খাঁচায় ঠিক তেমনিভাবে সে খেতো।

দর্শকদের রাজি সহ্য করতে পারতো না — তাদের দেখে অভ্যস্ত হতে তার লেগেছিল অনেক দিন। খাঁচার সামনে দাঁড়ানো লোকদের কাউকে দ্রুত নড়তে দেখলেই সে সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়তো শিকের উপর। তবে শিগ্গিরই বুঝতে পারলো যে সে কিছুই করতে পারবে না, তাই এবার থেকে রাজি দর্শকদের দিকে তাকানোই বন্ধ করে দিলো — এমন কি যারা তাকে রাগাতো তাদের দিকেও।

রাত্রিবেলা সব জন্তুরা ঘুমিয়ে পড়তো। একমাত্র রাজিই ঘুমতো না। সারা খাঁচায় ছুটোছুটি ক'রে মিয়াও মিয়াও ডাক ছাড়তো। অন্যান্য বাঘেদের চেয়ে তার স্বরটি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা, — তা কত যে করুণ!

যে ঘরে জন্তুদের খাবার তৈরি করা হতো সেখানে এক রাত্রে একজন মিস্ত্রি উনুন সারাচ্ছিল। সকালে যখন পরিচারক এলো, মিস্ত্রি দেখতে চাইলো সেই জন্তুটিকে যেটি রাতভোর করেছে বুক-ফাটা চিৎকার। পরিচারক সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলো যে কথাটা হচ্ছে রাজিকে নিয়ে। মিস্ত্রিকে সে খাঁচার কাছে নিয়ে গিয়ে দেখালো বাঘটাকে। অনেকক্ষণ মনোযোগ সহকারে সে তাকে দেখলো, দেখলো তার পক্ককেশ মাথা, তার হলদে চোখ...

— বোঝাই যাচ্ছে, ও ছাড়া পেতে চায়, — বাঘটির দিকে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে বললো লোকটি। — মাথা যে শাদা হয়ে গেছে, একেবারে বুড়ো। ওকে খাঁচায় রাখা মুশকিল।

সময় যেতে লাগলো, এবং বাস্তবিকই রাজি খাঁচার জীবনে অভ্যস্ত হতে পারলো না। খেতে শুরু করলো বটে, কিন্তু আগের মতোই মনমরা হয়ে রইলো।

একদিন চিড়িয়াখানায় এলো এক বাঘিনী। নাম তার — বাইয়াদেরকা। সে ছিল অতি সুন্দরী: সুঠাম গড়ন, গায়ে উজ্জ্বল-লাল ডোরা, খেলতে ভালোবাসে — কখনো বা খাঁচার এক দিক থেকে লাফ মারে অপর দিকে, কখনো বা মাংসের টুকরো দাঁতে নিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে করে লোফালুফি, ওটা যেন একটা জ্যান্ত শিকার আর কি। বাঘদু'টি বসতো মুখোমুখি। কেউই জানে না কী করে যে তাদের আলাপ হয়। তবে শিগ্‌গিরই সবাই লক্ষ্য করলো, বাঘেরা নিজেদের মধ্যে 'স্নেহালাপ' শুরু করেছে। তখন স্থির হলো, রাজিকে বাঘিনীর পাশের খালি খাঁচাটিতে নিয়ে যাওয়া হবে।

— মনে হয় না সহজে ও নতুন খাঁচায় যাবে, — সন্দেহের সঙ্গে বললেন ম্যানেজার।

— যাবে না মানে? জোর করে ঢোকাবো। ওর বাপ যাবে: ক্ষিধে পেলে আপনা থেকেই ঢুকবে, — বিশ্বাসের সঙ্গে বলে পরিচারক।

তবে পরিচারকের কথা ফললো না। রাজির খাঁচা ও খালি খাঁচাটার মধ্যে একটি বাক্স রাখা হলো যাতে ওর মধ্য দিয়ে সে তার নতুন বাসায় গিয়ে ঢুকতে পারে। বাক্সটিতে এক টুকরো মাংসও রাখা হয়েছিল। মাংস পড়ে রইলো কয়েক দিন, কিন্তু রাজি তা খেলো না এবং বাক্সেও ঢুকতে চাইলো না। বাক্সের সঙ্গে একটি জ্যান্ত খরগোস বেঁধেও লোভ দেখানো হলো, কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হলো না। কে জানে এসব আয়োজন দেখে বাঘটি হয়তো ভেবেছিল যে তাকে ধরার ফন্দী করা হচ্ছে (যেমন একবার তাকে ধরা হয়েছিল)। অন্য উপায় ভাবতে হলো: স্থির হলো, রাজির পাশের খাঁচাটি খালি ক'রে ওতে বাইয়াদেরকাকে নিয়ে যাওয়া হবে। তাই-ই করা হলো। পাশাপাশি এসে যাওয়াতে মুহূর্তের মধ্যেই বাঘদু'টির পরিচয় হয়ে গেল। এক ঘণ্টা পরেই বাঘিনীর দরজার কাছে এসে রাজি তাকে

আদর করতে চাইলো। আর বাইয়াদেরকা, ঠিক যেন সম্মতি জানিয়ে, দরজায় মাথা ঘষতে লাগলো, এবং চিৎ হয়ে শুয়ে সর্বোপায়ে বোঝালো যে পড়শীকে তার খুবই মনে ধরেছে।

চালচলনে বাঘিনী ছিল রাজির চেয়ে ভিন্ন — চটপটে, চঞ্চল আর ভীষণ ধূর্ত। তার খাঁচার কাছ দিয়ে যাওয়া খুব একটা নিরাপদ ছিল না। হঠাৎ বিদ্যুৎ বেগে শিকগুলোর ফাঁক দিয়ে নিপুণভাবে সে বাড়িয়ে দিতো তার নখওলা থাবা, চেষ্টা করতো পরিচারককে ধরতে। কোনোদিকে না তাকিয়ে নির্ভয়ে সে খেতো তার খাবার, আর পেট ভরে আহারের পর খাঁচার মধ্যিখানে শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে খুব ভালো করে মুছতো মুখ। তারপর পড়তো ঘুমিয়ে।

পাশের খাঁচাতে বাইয়াদেরকা থাকাতে রাজির মনমেজাজ অনেকটা ভালো। সুন্দরী বাঘিনীর প্রতি সে বেশ আগ্রহ দেখাতে লাগলো। প্রায়ই তার সঙ্গে রাজির চলতো আলাপ, — বিশেষ করে যখন দুই খাঁচার মধ্যেকার দরজাটি সরিয়ে শিক বসানো হলো।

সবাই দেখলো, রাজি আর বাইয়াদেরকার সম্পর্ক খুব জমে উঠেছে। তাই ঠিক হলো, তাদের একসঙ্গে থাকতে দেওয়া হবে। আগে থেকে জলের মোটা পাইপ-টাইপ তৈরি রাখা হলো, — যদি মারামারি লাগে জল দিয়ে ছাড়াতে হবে তো। এবার দরজাটি খোলা হলো। দরজা খোলার সময় রাজি গর্জন করে এগিয়ে এলো খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে। দরজা খুলেই সবাই তাড়াতাড়ি সরে পড়লো, — জন্তুদু'টো যাতে ক্ষেপে না যায়। রাজি সঙ্গে সঙ্গেই শান্ত হলো। সে ফিরতে না ফিরতেই বাইয়াদেরকা একেবারে নির্ভয়ে চলে এলো রাজির খাঁচায়, এবং তার সামনে চিৎ হয়ে শুয়ে মেঝের উপর দিতে লাগলো গড়াগড়ি। সম্ভবত, এটাই ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ মুহূর্ত। বাঘিনীর প্রতি রাজির মনোভাব যে কীরূপ তা এখন পর্যন্ত ছিল মানুষের অনুমানের ব্যাপার মাত্র। এবং ম্যানেজার যদিও ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, তবুও ঘটে তো সবকিছুই। এরূপ ঘটনা তো চিড়িয়াখানায় আরো হয়েছে, — যখন সবার চোখের উপর বাঘ কামড়িয়ে মেরে ফেলেছে বাঘিনীকে। এইজন্যেই তো সবাই আতঙ্কের সঙ্গে রাজির হাবভাব লক্ষ্য করছিল, ভয় ছিল সে হামলা করতে পারে। বাঘিনী আপন মনে চিৎ হয়ে মেঝেতে

গড়াগড়ি খাচ্ছে, আর রাজি এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে একটু একটু করে পিছু হটছে, যেন ভয় করছে বাঘিনীর গায়ে তার পা লেগে যাবে। কিন্তু যখন পেছনে যাওয়ার আর কোনো জায়গা ছিল না, রাজি সহসা সোজা হয়ে আদরের ডাক ছাড়লো। সঙ্গে সঙ্গে বাইয়াদেরকা উঠে পড়লো, এবং তার মাথাটি ঘষতে লাগলো রাজির শাদা বুকে, গলায়, গায়ে...

সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। এবার আর মারামারি লাগার ভয় নেই। জন্তুদু'টোর খুব ভাব হয়ে গেল। এমন কি খাওয়ানোর সময়েও তাদের আলাদা করা যেতো না। বাইয়াদেরকা যখন তার খাঁচায় থাকতো, রাজি তখন শুতো ঠিক দরজার কাছে। আর যদি তারা দুজনে একসঙ্গে থাকতো, তাহলে প্রায়ই দেখা যেতো বাইয়াদেরকা কীভাবে চেটে দিচ্ছে তার বন্ধুর শাদা মাথাটি। তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব দেখে সবাই অবাক।

একবার বাইয়াদেরকার অসুখ করলো। সঙ্গে সঙ্গে তা বোঝা গেল। সব সময় হাসিখুসি চটপটে বাইয়াদেরকা কেন যেন চুপচাপ শুয়ে আছে খাঁচায়, চোখে ম্লান দৃষ্টি। মাংস খেলো না। বান্ধবীর এরূপ অদ্ভুত আচরণে উদ্বিগ্ন হয়ে রাজি আদর ক'রে ডেকে তাকে তার রুক্ষ জিব দিয়ে একটু চাটলো। কিন্তু বাইয়াদেরকা কোন সাড়া দিলো না। বহু কষ্টে পরিচারক বাঘিনীকে অপর একটি খাঁচায় নিয়ে গেল। ক্লান্ত বাইয়াদেরকা হাঁপাতে হাঁপাতে তার জায়গায় এসেই শুয়ে পড়লো।

সেসব দিনে আজকালকার মতো তেমন কোনো ভালো পশু-চিকিৎসা কেন্দ্র ছিল না। ছোট্ট একটি ঘরে যে কেন্দ্রটি ছিল তা দেখতে ঠিক চালা-ঘরের মতো লাগতো। তাছাড়া সারা চিড়িয়াখানায় ডাক্তারও ছিলেন একজন। পিওতর মার্কেলোভিচ খুবই ভালো ডাক্তার, কিন্তু হলে হবে কি — হাতে যদি কোনো সাজসরঞ্জাম না থাকে তো কী দিয়ে তিনি সাহায্য করতে পারবেন রুগ্ন বাঘিনীকে!

কয়েক দিন ভোগার পর বাইয়াদেরকা... মারা গেল।

রাজি আবার একা। আবার সে মনমরা হয়ে পড়লো। এখন শুধু রাতে নয়, দিনেও শোনা যেতো তার বিষণ্ণ 'উ-য়া-ও' ডাক। সম্ভবত, বান্ধবীর বিরহে খুব তার প্রাণ কাঁদছিল। তাই সে বারবার আনাগোনা করতে লাগলো খাঁচাটির দরজার

কাছে, যেখানে বসতো বাইয়াদেরকা, আর ওটাকে আঁচড়াতো, ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখতো, পরে বিষাদের নিঃশ্বাস ফেলে পড়তো সরে।

কিছুকাল পরে চিড়িয়াখানায় এলো আরো একটি বাঘিনী। তাকে রাখা হলো সেই খাঁচায়, যেটিতে কোনোকালে থাকতো বাইয়াদেরকা। প্রথম প্রথম মনে হলো বাঘিনীর প্রতি রাজি উদাসীন নয়। যে দরজাটির ওপর পাশে নবাগতা থাকতো তা সে শুঁকলো, কিন্তু পরে এমন কি শব্দ না করেই নিজের কোণটিতে গিয়ে শুয়ে পড়লো। এরপর সে কখনো আর দরজাটির কাছে যায় নি। অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল নতুন বাঘিনীর সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দেবার, কিন্তু কোনো ফল হলো না তাতে। রাজি চিরকাল বিশ্বস্ত থাকলো তার মৃত বান্ধবী বাইয়াদেরকার প্রতি।

তারপর অনেক বাঘই এসেছিল চিড়িয়াখানায়, কিন্তু তাদের একটিও রাজির মতো ছিল না। রাজির বিরাট পক্ককেশ মাথা, হলদে কৌতূহলী তার চোখ, হলদে-হয়ে-যাওয়া পুরনো দাঁত, তার শক্তিশালী নরম দেহ বহু বছর কেটে যাওয়ার পর আজও আমার স্মৃতি থেকে মুছে যায় নি।

দ্বিতীয়াংশ

চিড়িয়াখানার পশুপাখি

কুজিয়া

চিড়িয়াখানায় ঈগলদের সারিতে থাকে বিরাট কালো এক শকুন। নাম তার কুজিয়া।

কুজিয়ার বয়স কত কেউ তা ঠিক জানে না। তবে পরিচারক নিকিতা ইভানোভিচ বলেন, ছাপ্পান্ন বছর আগে তিনি যখন চিড়িয়াখানায় কাজে ঢুকেন তখনই শকুনটি এখানে ছিল। নিকিতা ইভানোভিচের এটা ভালো মনে আছে। তিনি শিকারী পাখিদের দেখাশোনা করতেন। পাখিরা যে সারিতে থাকতো তারই একেবারে শেষের খাঁচাটিতে ছিল শকুন।

প্রথম দিকে নতুন পরিচারকের প্রতি শকুনের মনোভাব খুব একটা ভালো ছিল না। নিকিতা ইভানোভিচ যখন আসতেন, শকুন ক্ষেপে উঠে হামলা করতো, বঁড়শীর মতো ঠোঁট দিয়ে চেষ্টা করতো তাঁকে মারতে। তবে পয়লা-পয়লা এমনটি হয়েই থাকে। শিগ্‌গিরই কুজিয়া পরিচারকের উপর হামলা করা থামালো, এমন কি সে তাঁকে বিলকুল আপনই করে নিলো। দূর থেকে নিকিতা ইভানোভিচকে আসতে দেখলেই সে দাঁড় ছেড়ে ছুটতো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, তবে তিনি যদি পাশ দিয়ে চলে যেতেন তাহলে সে হাস্যকরভাবে গলা বাড়িয়ে তাকিয়ে থাকতো, দেখতো কোন দিকে যাচ্ছেন।

নিকিতা ইভানোভিচও কুজিয়াকে ভালোবেসে ফেলেন। তার আদর-যত্ন করেন তিনিই। তখনকার দিনে চিড়িয়াখানায় গরম ঘরের সংখ্যা খুবই কম, শীতের সময় পাখিদের রাখার জায়গা হতো না, ফলে অনেক পাখিই মারা যেতো। কিন্তু নিকিতা ইভানোভিচ নিজের আদরের পাখিটিকে বাঁচিয়ে রাখেন। শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কুজিয়াকে নিয়ে আসতেন নিজের বাড়ীর চিলেকোঠায়। প্রচণ্ড শীতের দিনগুলো কুজিয়া ওখানেই কাটাতো, তবে গরম শুরু হলেই সে ফিরে যেতো আবার খাঁচায়।

বেশ কয়েক বছর শকুন একা থাকলো এই খাঁচায়। তারপর তার জন্যে আনা হলো এক শকুনীকে। প্রথমে কুজিয়া তার প্রতি ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। তার ভাবখানা এমন যেন খাঁচায় সে ছাড়া আর কেউ নেই।

এলো বসন্ত। রাস্তাঘাট ভরে গেছে বরফ গলা জলে, উজ্জ্বল বাসন্তী সূর্যের দিকে তাকিয়ে মেতে উঠলো ঈগলেরা। শকুনও গেল বদলে।

সে আর আলাদা থাকে না, সব সময়ই যায় শকুনীর পেছন পেছন, নানাভাবে করে সখির তোয়াজ।

কুজিয়া শকুনীকে খুব ভালোবাসে। নিকিতা ইভানোভিচও তা লক্ষ্য করেছেন। একদিন খাঁচার দরজা দিতে ভুলে যান, আর কুজিয়া এই সুযোগে বেরিয়ে পড়ে। নিকিতা ইভানোভিচ তো ভীষণ ভয় পেলেন। তিনি ভাবলেন, শকুন এক্ষুনি উড়ে যাবে... তবে কিছুই হয় নি। সামান্য ঘোরাফেরা করেই কুজিয়া ফিরে গেল খাঁচায়।

তখন নিকিতা ইভানোভিচ ঠিক করেন দুটো শকুনকেই বেড়াতে নিয়ে যাবেন। পাখিদু'টির জন্যে তাঁর দুঃখ হচ্ছিল, খাঁচায় তারা সূর্য প্রায় দেখেই না। বেশ, একদিন খাঁচাটি খুলে দেন। শকুনীকে ছাড়েন পাখা বেঁধে, — কে জানে হঠাৎ যদি উড়ে যায়, আর কুজিয়ার কোনো বাঁধন-টাধন নেই, কারণ পরিচারক জানেন শকুন সখিকে ছেড়ে পালাবে না।

দেখা গেল ঠিকই তাই। কুজিয়া এমন কি চেষ্টাও করলো না উড়ে যেতে। পয়লা দিন থেকেই কাছের ছোটো একটি পাথুরে টিলা তার খুব মনে ধরলো, পরে তাকে যখন ছাড়া হতো সে শকুনীকে নিয়ে সোজা চলে যেতো সেখানে।

এই টিলায় প্রায়ই তারা চার ঘণ্টা অবধি বসে থাকতো। তারপর কুজিয়া, আর পেছন পেছন তার সখিও টিলা থেকে নেমে ফিরে আসতো খাঁচায়। শকুনরা হামেশাই এই সময় পেতো মাংস, খাবার পাওয়ার সময় তাদের ভালোই জানা ছিল।

সারা বসন্তকাল শকুনরা কাটায় টিলায়, মে মাসের শেষের দিকে হঠাৎ তারা সেখানে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। তখন তারা ঘুরে বেড়ায় পার্কের পথে পথে, জড়ো করে ডালপালা আর যতসব আবর্জনা, তারপর তা নিয়ে যায় খাঁচায়। বিশেষ করে কুজিয়াই খাটে বেশি। যাকিছু সামনে পায় তাই সে টানে: কখনো সে নেয়

পরিচারিকার ঝাড়ু, কখনো বালতি থেকে বের করে কাগজ। আর একবার তো এক মিস্ত্রির কোটটিই অল্পের জন্যে গায়েব হয়ে যাচ্ছিল। কোটটি এক মিনিটের জন্যে বেঞ্চিতে রেখে একটু সরেছে লোকটি, ব্যস কুজিয়া তো সঙ্গে সঙ্গেই তা নিয়ে দেয় দৌড়। মিস্ত্রি ভাবলো জিনিসটি ছিনিয়ে নেবে। কিন্তু কুজিয়া ভীষণ ক্ষেপে উঠলো এবং তার হাবভাবে বোঝা গেল স্বেচ্ছায় সে কিছুতেই কোটটি হাতছাড়া করবে না। ছুটতে হলো পরিচারকের কাছে।
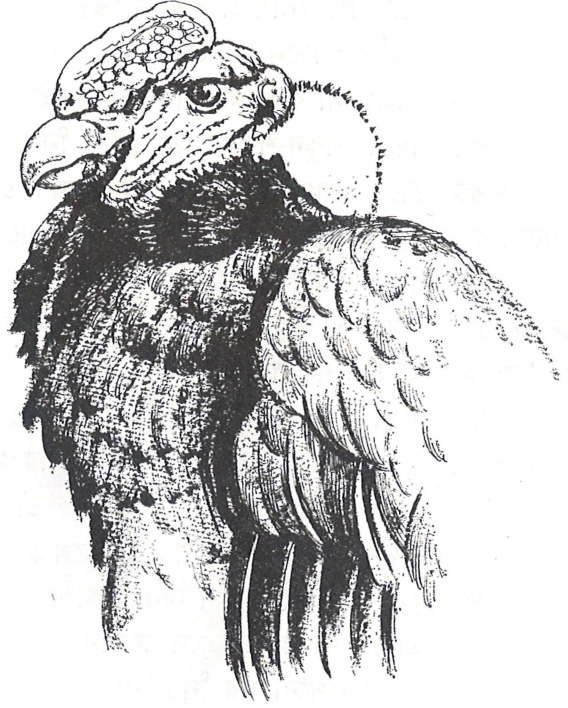
মিস্ত্রি যতক্ষণ নিকিতা ইভানোভিচকে খোঁজাখুঁজি করেছে, শকুনও ততক্ষণ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে নি। সে কোটটি এক কোণে নিয়ে গিয়ে আরামে পাততে লাগলো। এতে কোটটির অবস্থা তো কাহিল: নোংরা করেছে, পকেট ছিঁড়েছে, এবার সে কলার ছিঁড়ার ধান্দায়। এমন সময় ছুটে এলেন নিকিতা ইভানোভিচ আর মিস্ত্রি।

কোটের অবস্থা দেখে মিস্ত্রি তো একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসলো। তবে নিকিতা ইভানোভিচ সঙ্গে সঙ্গেই ভেবে নিলেন কী করতে হবে। তিনি একটি ঝাড়ু ছুঁড়ে দেন কুজিয়াকে। কুজিয়া যেই ঝাড়ুটি ধরতে গেল অমনি নিকিতা ইভানোভিচ খাঁচা থেকে কোটটি নিয়ে দিলেন এক দৌড়।

এই ঘটনার পরে নিকিতা ইভানোভিচ শকুনদের নিয়ে বেড়ানো বন্ধ করেন। তবে তিনি বুঝতে পারেন যে তারা একটি বাসা বানাতে চাইছে, তাই প্রতিদিন তাদের জন্যে ডালপালা বয়ে আনেন। নিকিতা ইভানোভিচ ডালপালা রাখেন খাঁচায়, আর সন্ধ্যার দিকে শকুন-শকুনী তা টেনে নিয়ে যায় তাদের শোবার জায়গায়।

প্রথমে তারা ডালপালাগুলোর গাদি দেয়। তারপর কুজিয়া তার উপর বসার জায়গা করে, এবং ওখানেই শকুনী একটি ডিম পাড়ে ও পরে তাতে তা দিতে বসে।

তখন সারা মনপ্রাণ দিয়ে কুজিয়া তার সখির সেবাযত্ন করে। খাবার পেলে নিজে না খেয়ে দেয় তা শকুনীকে। আর শকুনী যদি কখনো জায়গা থেকে উঠে পড়ে, তো সে নিজেই তার বদলে ডিমে গিয়ে বসে।

মোট একান্ন দিন শকুনরা ডিমে তা দিলো। ডিম যখন ফুটলো তা থেকে বেরুলো ছোট্ট এক বাচ্চা। দেখতে টার্কি ছানার মতো, গায়ে শাদা লোম। ছোট্ট বাচ্চাটির প্রতি পাখাদার মা-বাপের যে কী যত্ন তা আর বললে শেষ হবে না! পালা করে তারা তাকে খাওয়ায়, তাপ দেয় এবং রাখে চোখে চোখে।

তবে শকুন পরিবারটি বেশি দিন টিকলো না চিড়িয়াখানায়। একদিন নিকিতা ইভানোভিচ তাদের খাওয়াতে এসে দেখেন তারা খেতে চাইছে না। কী আশ্চর্য, এমনটি আগে তো কখনো হয় নি। নিকিতা ইভানোভিচ দেরী না করে ছুটলেন ডাক্তারের কাছে।

কিন্তু ডাক্তার আর কী-ই বা করতে পারেন? এসব অনেক আগের ঘটনা, তখনকার দিনে চিড়িয়াখানায় এমন কোনো ল্যাবরেটরি ছিল না যেখানে রোগ ধরা যায়। সপ্তাহ তিনেক শকুনরা ভুগলো। তাদের সেবাশুশ্রূষার জন্যে সাধ্য মতো সবকিছুই করলেন নিকিতা ইভানোভিচ, কিন্তু বাঁচানো গেল একমাত্র কুজিয়াকে।

একা পড়ে শকুন একেবারে মনমরা হয়ে গেল। গায়ের পালক ফুলিয়ে সারাদিন বসে থাকে কিংবা খাঁচায় চলতে চলতে খুঁজে তার শকুনীকে। একবার নিকিতা ইভানোভিচ তাকে যখন খাঁচা থেকে ছাড়লেন, কুজিয়া সঙ্গে সঙ্গে উঠলো সেই পাথুরে টিলায়। তবে সেখানে সে বসলো না। ডানা ঝাড়া দিয়ে হঠাৎ উড়ে গেল আকাশে।

কুজিয়া উড়তে লাগলো উপরে, অনেক উপরে, তাকে খুব ছোটো দেখালো,

এতো ছোটো যে মেঘের মধ্যে প্রায় চোখেই পড়ে না। সবাই ভাবলো, সে আর ফিরবে না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চক্কর দিতে দিতে নিচে নেমে আসে। এই তো সে পার্কের উপরে ভাসছে... এই তো নামছে পথে... কে জানে, যেখানে কোনোদিন ছিল তার বাসা সে জায়গার প্রতি বহু বছরের মায়ার টানেই হয়তো শকুন ফিরে এসেছে তার খাঁচায়।

তারপর কেটেছে অনেক বছর। অনেক দিন বুড়িয়েছেন নিকিতা ইভানোভিচ। বার্ধক্য তাঁকে কুঁজো করে দিয়েছে, আর বুক অবধি গিয়ে পড়েছে শাদা দাড়ি। নিকিতা ইভানোভিচ — আমাদের চিড়িয়াখানার সম্মানীয় কর্মী। তিনি এখনো পাখিদের দেখাশোনার কাজ করেন এবং গরমের দিনে এখনো শকুনকে নিয়ে যান বেড়াতে।

ধীরে ধীরে, তাড়াহুড়ো না করে শকুন যায় তার চিরদিনের বাসায়। বিরাট বিরাট ডানা ঝাপটিয়ে বেড়ার উপর দিয়ে উড়ে এসে বসে সেই পাথুরে টিলায় যেখানে তার কেটেছে অনেকগুলো বছর। পাখা মেলে সেখানে সে বসে থাকে, কোনো নড়চড় নেই, তারপর দিনের শেষে সূর্য যখন পাটে বসে, শকুন আবার পার্কের পথটি ধরে যায় তার খাঁচায়, যেখানে কেটেছে তার জীবনের সুদীর্ঘ ষাটটি বছর।

ছোট্ট টিক্‌টিকির রহস্য

চিড়িয়াখানা পেলো কয়েকটি টিক্‌টিকি। জোয়া নিকোলায়েভনার তখন কত আনন্দ! হবেই তো, চিড়িয়াখানায় এই জাতের টিক্‌টিকি তো এই-ই প্রথম।

জোয়া নিকোলায়েভনা জানেন, একমাত্র এই টিক্‌টিকিরাই ডাকে, তারা শুধু মাটিতেই চলে না, কাঁচ বেয়েও অনায়াসে উপরে উঠে যায় এবং এমন কি ছাদেও চলাফেরা করে। তাই টিক্‌টিকিদের এমন একটি কাঁচের বাক্সে রাখা দরকার যার উপরের দিকে তারের জাল লাগানো।

এরূপ বাক্স মিললো না। সব বাক্সেই রয়েছে বিষাক্ত সাপ। তখন ঠিক হয়, টিক্‌টিকিদের আপাতত রাখা হবে জাল-না-লাগানো একটি বাক্সে যা কাঁচ দিয়ে বন্ধ করলেই চলবে।

তাই হলো। পাঁচটি টিক্‌টিকিই আরামে থাকে। জোয়া নিকোলায়েভনা বাক্সের ভেতরে তাদের জন্যে একটা পাইপের টুকরোও রাখেন। তারা ওটার গায়ে লেগে রয়। এই জাতের টিক্‌টিকিরা পাহাড়ের ফাটলে, পাথরের নুড়ির মধ্যে অথবা কুঁড়ে-ঘরেই থাকতে ভালোবাসে। দিনে তারা লুকিয়ে থাকে অন্ধকার নিরালা কোণে, আর রাতে বেরোয় শিকারে। এজন্যেই তো জোয়া নিকোলায়েভনা বাক্সে পাইপের এই টুকরোটি রাখেন, আর তার পাশেই ঝুলিয়ে দেন একটি বাল্‌ব। গা গরম করার মর্জি হলে বাল্‌বের কাছে বসতে পারে, লুকিয়ে পড়ার ইচ্ছে হলে যেতে পারে পাইপের তলায়: ওখানে গরম-ঠাণ্ডা দুই-ই আছে — টিক্‌টিকিরা তাই তো চায়। তারা যাতে পালাতে না পারে সেজন্যে বাক্সটি দুটো কাঁচ দিয়ে ঢাকা। বাক্সের মধ্যিখানে জোয়া নিকোলায়েভনা করেন ছোট্ট এক ফুটো। এতো ছোট্ট যে তা দিয়ে শুধু বাল্‌বের তারই ঢোকানো যায়, টিক্‌টিকিরা বেরোতে পারবে না কিছুতেই।

তবে টিকটিকিরাও পালাতে চায় নি। বাক্সতে ছাড়তেই চারটি টিক্‌টিকি তো সঙ্গে সঙ্গেই পাইপের তলায় উধাও, আর একটি ঘুরাফেরা করতে থাকে কাঁচের গায়ে।

পয়লা যায় উপরে, কিন্তু একটু পরে সেও ঢুকে পড়ে পাইপের তলায়। জোয়া নিকোলায়েভনা লুকিয়ে মন দিয়ে দেখেন তার চলাফেরা, অবাক হন কী করে যে টিক্‌টিকিরা চলতে পারে খাড়া দেয়ালে, ছাদে এবং এমন কি মসৃণ কাঁচে।

পরে জোয়া নিকোলায়েভনা টিক্‌টিকিদের কিছুটা কেঁচো এনে দেন। চলে যাবার আগে আরো একবার পরখ করেন বাক্সটি।

পরদিন কাজে এসে জোয়া নিকোলায়েভনা প্রথমেই গেলেন টিক্‌টিকিদের দেখতে। সবকিছুই যেন ঠিকঠাক, তবে টিক্‌টিকি নজরে পড়ছে না। 'মনে হয় পাইপের নিচে' — ভাবেন জোয়া নিকোলায়েভনা, যাক তবুও একবার জিজ্ঞেস করে নেন প্রাণীবিদকে:

— মারিয়া মিখাইলোভনা, টিক্‌টিকিদের আপনি দেখেন নি?

— না, এখনো ওদের কাছে যাই নি, সাপদের দেখছি, — বিরাট এক অজগরকে দেখতে দেখতে উত্তর দেন মারিয়া মিখাইলোভনা।

জোয়া নিকোলায়েভনা উপরের কাঁচটি একটু খুলে পাইপের টুকরোটি তুলেন। তিনটি টিক্‌টিকি বিকট হাঁ করে তাকায় তাঁর দিকে। বাকি দুটি নেই। জোয়া নিকোলায়েভনা বিশ্বাস করেন না নিজের চোখকে। বাক্সের সবকিছু তন্নতন্ন করে দেখেন তিনি: বার কয়েক তুলেন পাইপের টুকরো, বের করেন সব পাথর এবং এমন কি কেঁচোগুলো পর্যন্ত, কিন্তু টিক্‌টিকিদু'টো ঠিকই লাপাত্তা।

— মারিয়া মিখাইলোভনা, আপনি টিক্‌টিকিদের সরান নি তো? — কিছুটা আশা নিয়ে জিজ্ঞেস করেন প্রাণীবিদকে, যদিও তিনি ভালোই জানেন যে টিক্‌টিকিদের কেউ কোথাও সরায় নি।

— কী হয়েছে? — বলেন মারিয়া মিখাইলোভনা এবং পরিচালিকাকে উদ্বিগ্ন দেখে তাড়াতাড়ি এলেন তাঁর কাছে। দু'টি টিক্‌টিকি কম পড়ছে শুনে তিনিও বাক্সটি ঘাঁটেন। — ঠিকই, নেই, — বলেন তিনি হতাশায়। — কোথায়ই বা পালাতে পারে তাহলে?

দু'জনেই বাক্সটি ভালো করে দেখেন। কোন-পথে টিকটিকিরা বেরিয়ে গেছে তা খুঁজেন। কিন্তু সবকিছুই ঠিকঠাক। একমাত্র কাঁচের সেই ফুটোটি দিয়েই তারা বেরোতে পারে। তবে এই শীতে ঘরটির বাইরে কোথাও যায় নি নিশ্চয়ই, সব

জানলা-দরজাই তো বন্ধ। কিন্তু এমন বিরাট ঘরে অসংখ্য খাঁচার মধ্যে ছোট্ট দু'টি টিক্‌টিকিকে খুঁজে পাওয়া কি এতোই সোজা! জোয়া নিকোলায়েভনা পড়েন মহা ফ্যাসাদে। কোথায় বা খুঁজবেন পাজি দুটোকে?

ভেবে কূল পান না তাঁরা। তবে কী রূপ জায়গায় টিক্‌টিকিরা লুকোতে পারে তা আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না। তারা গরম, অন্ধকার আর ভেজা জায়গা ভালোবাসে। এই লক্ষণ অনুসারে খাঁচার তলায় তাদের থাকার কথা নয়, আর দু' তলায়ও পালানোর কথা উঠতে পারে না, কারণ দরজা একদম বন্ধ। এতে খোঁজার কাজ অনেকটা সহজই হয়।

— ঢোঁড়া-সাপের খাঁচার তলায় দেখলে কেমন হয়? ওখান দিয়েই তো গরম জলের পাইপটি গেছে। — বলেন জোয়া নিকোলায়েভনা। — জানেন, ওখানেই হয়তো ওরা আছে।

— আমারও তাই মনে হয়, — সায় দেন মারিয়া মিখাইলোভনা। — ওখানে কয়েকটা কেঁচো রেখে দেখা যাক না টিক্‌টিকিরা ওগুলো খায় কিনা।

তাই ঠিক হলো। জোয়া নিকোলায়েভনা কিছুতেই শান্ত হতে পারছেন না। তিনি নিজেই খাঁচার নিচে ঢুকে সেখানে কেঁচো রাখেন। এমন কি কেঁচোগুলো তিনি বার কয়েক ভালো করে গুনেন পর্যন্ত, সকালে এসে যাতে বুঝতে পারেন টিক্‌টিকিরা ওগুলো ছুঁয়েছে কিনা।

বুঝতেই পারছ সে রাত্রে জোয়া নিকোলায়েভনার চোখে ঘুম নেই মোটেই, — রাত পোয়ালেই রক্ষে। সকালে না খেয়েই তিনি ছুটেন চিড়িয়াখানায়। ঘরে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে যান খাঁচার তলার কেঁচোগুলো এখনো আস্ত না সাবাড়। দেখা গেল, হিসেব বিলকুল ঠিক: অর্ধেকটা কেঁচো খতম। মানে, টিক্‌টিকিরা এই খাঁচার নিচেই।

জোয়া নিকোলায়েভনা তাড়াতাড়ি আলো আনতে গেলেন। তিনি আর মারিয়া মিখাইলোভনা আলো দিয়ে দেখেন খাঁচার নিচের সব জায়গা, কিন্তু পলাতকরা কোন্ ফাঁকে লুকিয়ে পড়েছে। কত খোঁজাখুঁজি করেন, কতকিছু ঘাঁটেন, কিন্তু টিক্‌টিকিদের কোনো নামগন্ধই নেই। তবে এখন আশঙ্কা কম। জায়গা যখন জানা গেছে, এবার একটু ধৈর্য থাকলেই হয়। টিক্‌টিকিরা ধরা না পড়ে যাবে কোথায়।

বহু চেষ্টার পর চার দিনের দিন টিক্‌টিকিদের সন্ধান মিললো, তাও আবার জোয়া নিকোলায়েভনা রাত জেগে পাহারা দিয়েছেন বলে। তিনি একটি ওভারকোট পরে কান পেতে চুপচাপ বসে থাকেন খাঁচার পাশে, যাতে তাঁকে দেখা না যায়। হাতে টর্চ — শব্দ শুনলেই জ্বালিয়ে দেবেন।

ঘরটি কত সাপ, টিক্‌টিকি আর কাছিমে ভরা, শব্দও সেখানে কম নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও জোয়া নিকোলায়েভনা টিক্‌টিকির চলার শব্দ ঠিক টের পেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই টর্চের আলো ফেলেন খাঁচার তলায় যেখানে রয়েছে কেঁচোগুলো, হঠাৎ চোখে পড়ে একটি টিক্‌টিকির ছায়া। জোয়া নিকোলায়েভনা মুহূর্তও দেরি না করে হামাগুড়ি দিয়ে ছুটেন সেখানে — একেবারে সোজা খাঁচার তলায়। মাথা গলিয়েই দেখেন টিক্‌টিকি, — উপুড় হয়ে দিব্যি ঝুলছে।

জোয়া নিকোলায়েভনা ফন্দি করে টর্চের আলো ফেলেন টিক্‌টিকির চোখে। তারপর চোখ ঝলসে যেতেই তিনি ধরেন তার চোয়ালে। ব্যস্, বাছাধন আর যায় কোথায়। এবার অন্যটিকে খুঁজেন, কিন্তু ও ততক্ষণে পালিয়েছে। তবে জোয়া নিকোলায়েভনাও বেশ গা করলেন না এতে, শুধু একটি ভয়: ভীত টিক্‌টিকিটি জায়গা বদলাতে পারে, তখন তাকে খুঁজে পেতে মুশকিলই হবে।

সত্যিই টিক্‌টিকিটিকে পাওয়াই গেল না। আর এদিকে জোয়া নিকোলায়েভনার বাড়ীতে অদ্ভুত কী সব ঘটতে লাগলো।

— জোয়া, আমাদের ঘরে কী একটা লুকিয়ে আছে। — পরদিন বাড়ী ফিরতেই জোয়া নিকোলায়েভনাকে একথা ক'টি বলেন তাঁর মা। — আজ খাটের তলায় কয়েক বার কীসের ডাক শুনেছি, আর আমি যখন ঝাড়ু হাতে ঢুকলাম, ব্যস চুপ করে গেল।

জোয়া নিকোলায়েভনা এমনিতেই দারুণ চিন্তিত। মাকে কোনোকিছু না বলেই তিনি সোজা চলে গেলেন নিজের কামরায়। মনের গতি ভীষণ খারাপ, — একটি টিক্‌টিকিকে পাওয়াই যাচ্ছে না। তাহলে কি ওটার আশাই শেষ? এমন একটি বিরল প্রাণীকে হারানো সত্যিই কী বোকামি!.. তাছাড়া চিড়িয়াখানার ম্যানেজারই বা কী বলবেন।

চিড়িয়াখানার ম্যানেজার ইগর পেত্রোভিচ কোনোকালে নিজেই সাপ, বেঙ,

টিক্‌টিকির দেখাশোনা করতেন। এখনো তিনি সরীসৃপদের কথা মনে করেন, প্রায়ই জোয়া নিকোলায়েভনার কাজের খবর নেন। এই তো আজ সকালেই ফোন এসেছিল, জানতে চেয়েছেন টিক্‌টিকিরা কেমন আছে, বললেন তাদের কী খাওয়ানো ভালো, আর জোয়া নিকোলায়েভনা তাঁর সব কথারই উত্তর দেন, কিন্তু বললেন না যে একটি টিক্‌টিকি হারিয়ে গেছে। 'খুঁজে পেলেই বলে দেবো সবকিছু। আগে বলে কেন কষ্ট দেবো?' — ভাবলেন তিনি।

রাত্রে জোয়া নিকোলায়েভনার ভালো ঘুম হলো না। টিক্‌টিকির ডাকের মতো কী সব শব্দে বার কয়েক তাঁর ঘুম ভাঙ্গে। একবার এমন কি তিনি আলোও জ্বালালেন, তাঁর মনে হলো টিক্‌টিকির মতো কোনোকিছু একটা আলমারির পেছনে দেয়াল বেয়ে উপরে উঠছে। 'ওসব নিশ্চয়ই মনের ধান্দা, — ভাবেন জোয়া নিকোলায়েভনা। কী ঝামেলা, বাড়ীতেও টিক্‌টিকির চিন্তা থেকে নিস্তার নেই।' তারপর খেলেন ঘুমের বড়ি, এবং সঙ্গে সঙ্গেই এলো গাঢ় ঘুম।

সকালে তাঁর ঘুম ভাঙ্গে রান্নাঘরের হৈ-হল্লা তর্কাতর্কি শুনে। জোয়া নিকোলায়েভনা গাউন পরে দেখতে গেলেন কী ব্যাপার। দেখেন, সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর সাত বছরের মেয়ে তানিয়া আর দিদিমা। তানিয়ার মুখচোখ উত্তেজনায় একেবারে লাল। দিদিমার হাতে ঝাড়ু।

— দিদিমা, মাইরি বলছি, আমি দেখেছি... এই কেটলিটির সামনেই ছিল... মুখখানা কী বিরাট, লাল টকটকে... আমাকে দেখেই হাঁ করে... মাইরি বলছি, এখানেই ছিল, — বোঝাতে চায় তানিয়া।

— কই, দেখা না। কিছুই তো নেই এখানে। যতসব বাজে কথা। আমি ঝাড়ু দিয়ে সব জায়গা সাফ করেছি, কই কিছুই তো দেখি নি। আমার নিজেরই মনে হচ্ছে ঐখানে টিক্‌টিকি আছে। সকালে চোখ খুলেই দেখি উপুড় হয়ে ঝুলছে দেয়ালে, একেবারে সবুজ।

— না দিদিমা, ওটা সবুজ নয়, শাদা।

— বলি কী আরম্ভটা করেছ, — ক্ষেপে উঠেন দাদু, — একজন বলছে শাদা টিক্‌টিকি দেখেছে, আরেকজন — সবুজ। বলি এখানে কি কয়েক ডজন টিক্‌টিকি ছাড়া হয়েছে?

— আমিও রাত্রে টিক্‌টিকির ডাক শুনেছি, — তর্কে যোগ দেন জোয়া নিকোলায়েভনা।

দাদুর আর সহ্য হলো না। তিনি চুপচাপ বেরিয়েই গেলেন।

— বোঝা দায়, — চিন্তিত মুখে বলে যান জোয়া নিকোলায়েভনা। — আচ্ছা, তানিয়া, — মেয়েকে বলেন তিনি — বল তো, কী তুই দেখেছিস, আর ওটা দেখতে কেমন?

— আমি রান্নাঘরে এলাম, দেখি ডেকচির কাছে কী একটা বসে আছে। মুখটি বড়ো, লাল, চোখ ঝুলছে... আমি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। দিদিমা আসতেই ওটা আর নেই। দিদিমা বলছেন আমি নাকি বাজে বকছি, — দুঃখে তানিয়ার একেবারে কেঁদে ফেলার অবস্থা।

— হুঁ, এটা তাহলে টিক্‌টিকিই। কিন্তু ওটা এখানে এলো কী করে, কিছুতেই বুঝতে পারছি না, — বলেন জোয়া নিকোলায়েভনা।

— তাহলে এখানে একটা টিক্‌টিকি নয়, দুটো। তানিয়া দেখেছে শাদাটাকে, আর আমি — সবুজটাকে।

— না মা, তুমি আর তানিয়া দু'জনেই একই টিক্‌টিকি দেখেছ। টিক্‌টিকিরা যে রঙ বদলায়। তুমি তাকে দেখেছ সবুজ দেয়ালে। তাই সে সবুজ, আর তানিয়া — শাদা রান্নাঘরে, তাই সে শাদা, — বুঝিয়ে দেন জোয়া নিকোলায়েভনা। — আর এবার তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ: আবার যদি টিক্‌টিকি দেখো, তাহলে তাকে ধরবে না, ভয়ও দেখাবে না।

তখন তানিয়ার কী ফুর্তি। তাদের বাড়ীতে থাকবে চমৎকার এক টিক্‌টিকি! সে রঙ বদলায়, ডাকে। বাঃ, কী মজা!

— মা, টিক্‌টিকিটাকে আমরাই রেখে দেবো! আমাদের কাছেই থাকুক। তাই না, দিদিমা?

কিন্তু দিদিমার কাছে তানিয়া কোনো সাড়া পেলো না। দিদিমার মতে, বাড়ীতে শুধু কুকুর-বিড়ালই পালা যায়, এছাড়া আর কিছু নয়। তবে এই জীবটিকে নিয়ে তিনিও অবশ্য চিন্তিত। তা এইজন্যে যে ওটা চিড়িয়াখানা থেকে এবং ওটাকে আবার ওখানেই পাঠানো দরকার। জোয়া নিকোলায়েভনা যখন কাজে চলে যাচ্ছিলেন

দিদিমা এমন কি তাঁর পেছন পেছন বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে বললেন:

— জোয়া, ওর জন্যে খাবার কোনোকিছু নিয়ে আসিস, না হলে না খেয়ে মারা যাবে!

জোয়া নিকোলায়েভনা কথা দিলেন খাবার আনবেন। তারপর তাড়াতাড়ি যান চিড়িয়াখানায়। বাড়ীর ঘটনাটি সবাইকে বলতে তাঁর আর তর সইছে না।

পরিচালিকার বাড়ীতে টিক্‌টিকির অদ্ভুত আবির্ভাবের কাহিনী শুনে মারিয়া মিখাইলোভনা তো হেসে দিলেন:

— হয়তো ওসব আপনার চোখের ধান্দা?

— সবারই চোখে তো আর ধান্দা হতে পারে না! — আপত্তি করেন জোয়া নিকোলায়েভনা। — এছাড়া আমি তানিয়াকে জিজ্ঞেস করেছি, ওর কথা শুনে ঠিক টিক্‌টিকিই মনে হলো। ও এমন কি বইপত্রেও কোনোদিন টিক্‌টিকি দেখে নি!

সেদিন জোয়া নিকোলায়েভনা একটু আগে বাড়ী চলে গেলেন। কিছুটা কেঁচোও নিয়ে যান সঙ্গে করে।

তানিয়া, দিদিমা আর দাদু দরজায় দাঁড়িয়ে তার অপেক্ষা করছেন। বাড়ী পেঁাছতেই তাঁরা সবাই হুড়োহুড়ি করে একসঙ্গে তাঁকে বলতে লাগলেন, সকালে নাস্তা খেত বসে তাঁরা ছাদে টিক্‌টিকিকে দেখেছেন। ও ছাদে হাঁটছিল, যেন মেঝেতে চলছে আর কি। তারপর দেয়াল বেয়ে নেমে পড়ে। এবার সে ছিল খয়েরি রঙের, তবে তাঁরা ভাবেন নি যে ওটা আবার অন্য এক টিক্‌টিকি, কারণ এখন তো তাঁরা জানেনই — টিক্‌টিকিরা রঙ বদলায়।

— দাদু আর আমি ওটাকে ধরতে চেয়েছিলাম, — বলে তানিয়া। — দাদু বস্তা নিতে যাবেন, এমন সময় দিদিমা তাঁকে এ্যায়সা এক ধমক দিলেন। দাদুর আর ধরতে সাহস হলো না।

— এবং খুব ভালোই হয়েছে যে সাহস হলো না, — বলেন দিদিমা। — মেরে-টেরে ফেলবে আবার, শেষে মা'র গলায় দড়ি। বলা হয়েছে, ছোঁবে না, ব্যস তাই সই।

তারপর দিদিমা জোয়া নিকোলায়েভনাকে বলেন, তাঁরা চুপ করে বসে থাকেন, টিক্‌টিকি চলে যায় রান্নাঘরে। তিনি তখন দরজা বন্ধ করে দেন, এরপর কেউ আর যায় নি রান্নাঘরে।

— আজ আমরা বাইরে গিয়ে খেয়েছি! দিদিমা রাঁধেন নি কোনোকিছু, — মাকে তাড়াতাড়ি খবরটি দেয় তানিয়া। দাদু তখন জিজ্ঞেস করেন:

— আর ক'দিন রান্নাঘর বন্ধ থাকবে?

জোয়া নিকোলায়েভনা খুবই খুশি যে টিক্‌টিকিকে পাওয়া গেছে ও সে বসে আছে রান্নাঘরে। আর যাই হোক না কেন, রান্নাঘরে অন্তত তাকে সহজে ধরা যাবে। তাড়াতাড়ি গায়ের ওভারকোট ছেড়ে জোয়া নিকোলায়েভনা গেলেন রান্নাঘরে। ঢুকেই দরজা বন্ধ করে ফেলেন।

কিন্তু এতো ছোটো রান্নাঘরেও টিক্‌টিকিকে খুঁজে বের করা মোটেই সহজ মনে হলো না। প্রথমে তিনি একাই খোঁজাখুঁজি করেন, পরে ডাকেন দিদিমাকে। তাঁরা সারা রান্নাঘর তন্নতন্ন করে খোঁজেন, সমস্ত বাসনপত্র, বাটি-ঘটি, এমন কি খাবার জিনিস পর্যন্ত হাতড়ে দেখেন, কিন্তু টিক্‌টিকির টিকিও দেখা গেল না। পরদিনও ধরা গেল না তাকে, তার পরের দিনও তাই। তবে সময় সময় তাকে দেখা যাচ্ছিল ঠিকই — কখনো শোয়ার কামরায়, কখনো খাবার ঘরে। কখনো আবার হঠাৎ দেখা দিতো গরম চুলোর কাছে ও দিদিমার দিকে লাল চোখে তাকাতো।

— ইস, কী বজ্জাত রে বাবা! — রাগেন দিদিমা। তিনি টিক্‌টিকিকে তাড়া করেন হাতা কিংবা ডেকচির ঢাকনী নিয়ে।

আর এই 'বজ্জাতটি' জানে যে দিদিমা তাকে ছোঁবেন না, তাই সে নড়েই না জায়গা থেকে। তবে অন্যান্যরা যখন আসেন, কে জানে কোথায় সে উধাও হয়ে যায়।

জোয়া নিকোলায়েভনা ভেবে পান না কী করবেন। কী আপদ! এতোদিন কেটে গেল, আর টিক্‌টিকিটাকে কিছুতেই ধরতে পারছেন না তিনি। আজই তো সকাল থেকেই সারা ঘর খুঁজেছেন, কিন্তু কোথাও নেই সে।

— কী করা যায় এবার বলুন, মারিয়া মিখাইলোভনা, — জোয়া নিকোলায়েভনা প্রায় কেঁদেই ফেলেন, — কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না, কোথাও না।

এই কথা ক'টি বলে জোয়া নিকোলায়েভনা আলনার কাছে গেলেন ওভারকোটটি রাখতে। হঠাৎ শুনেন: 'টিক্ টিক্ টিক্'। দুই মহিলাই ফিরে দেখেন, জোয়া নিকোলায়েভনা যে-চেয়ারে বসেছিলেন তাতেই দাঁড়িয়ে আছে আসামী ও ডেকে চলছে তার 'টিক্ টিক্ টিক্' ডাক। মারিয়া মিখাইলোভনা তাঁকে ইঙ্গিত দেন তিনি যেন না নড়েন। তারপর দেয়ালে ঝোলানো একখানা জাল নিয়ে ঢেকে দেন টিক্‌টিকিকে।

পলাতককে চিড়িয়াখানায় আনা হলো। কিন্তু কী করে সে পরিচালিকার বাড়ীতে গিয়ে উঠেছিল তা আজও রহস্যই থেকে গেল।

উলভ্‌রেন

বসন্ত সবে শুরু হয়েছে তখন। চিড়িয়াখানায় এলো নতুন এক বাসিন্দা — উলভ্‌রেন*। চেহারাটা তার অনেকটা বিরাট কোনো নকুলের মতো: ধূসর-বাদামী রঙ, সারা গায়ে লম্বা রুক্ষ লোম। উলভ্‌রেনটিকে খুবই কষ্টে ধরা হয়েছে। থাকে সে নিবিড় বনে, শিকারে বেরোয় রাত্রে। দেখতে মোটাসোটা হলেও দিব্যি গাছে চড়তে পারে।

জন্তুটিকে খাঁচায় রাখতেই সে প্রথমে তা ভালো করে দেখে নিলো। যখন বুঝলো যে সেখান থেকে পালানো যাবে না, সে এক কোণে ঢুকে লুকিয়ে রইলো, এমন কি খাবার খেতেও বেরুলো না।

সারাদিন উল্‌ভ্‌রেন কাটায় এই কোণে। গোল হয়ে সে শুয়ে থাকে সেখানে। এতো বিষণ্ণ ও হিংস্র যে দর্শকদের কেউ যদি তার খাঁচার খুব কাছে এসে পড়ে তো রাগে সে গর্জে উঠে, তখন চোখে তার জ্বলে সবুজ জ্যোতি এবং তাতে মনে হয় উলভ্‌রেন আরো বেশি ক্ষেপছে।

দিনের বেলা সে এরকম ব্যবহারই করে। তবে সন্ধ্যায় চিড়িয়াখানা বন্ধ হয়ে গেলে উলভ্‌রেন নিজের কোণটি থেকে বেরিয়ে আসে। নরম নিঃশব্দ লাফে ছুটে বেড়ায় খাঁচায়, দাঁত দিয়ে শিক ভাঙ্গতে চায় কিংবা থাবা দিয়ে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করে। কিন্তু খাঁচার শিকগুলো ছিল শক্ত, মাটির তলায় সিমেণ্টের তৈরী মেঝে, তা খুঁড়ে পালাবার কোনো সাধ্যি নেই জন্তুটির। তবুও সে রাতের পর রাত খুঁজতে থাকে খাঁচা থেকে বেরোবার কোনো পথ।

উলভ্‌রেন খায় কম। ভীষণ শুকিয়ে গেছে, তাকে যেন একেবারেই খাওয়ানো হয় না।

---

* উলভ্‌রেন (Gulo gulo) — ইউরোপ, এশিয়া ও উত্তর আমেরিকার তাইগা ও তুন্দ্রাবাসী নকুলজাতীয় হিংস্র জন্তুবিশেষ। — অনুঃ

কয়েক সপ্তাহ কাটলো। হঠাৎ জানোয়ারটির আচার-আচরণও গেল বদলে।

সে আর কোণটিতে লুকিয়ে থাকে না, সব সময় অস্থির হয়ে ছটফট করে। একবার এখানে একবার ওখানে খুঁড়ে গর্ত, যাকিছু সামনে পায় তাই তাতে জড়ো করে, বিছায়, তারপর উৎকণ্ঠিত হয়ে আবার খুঁড়ে ও আবার সবকিছু টানে নতুন জায়গায়।

পয়লা-পয়লা কেউই বুঝতে পারে নি কী ব্যাপার। পরে সবাই আঁচ করলো, শিগ্‌গিরই হয়তো উলভ্‌রেনের বাচ্চা হবে, তাই সে ডেরা খুঁজছে।

খাঁচায় একটি ছোটো ঘর রাখা হলো। ঘরটি খোলামেলা, দেখতে কুকুরের ঘরের মতো, এবং এমনভাবে তৈরী যাতে ভেতরে বাতাস ঢুকতে না পারে।

তবে ঘরটি পছন্দ হলো না উলভ্‌রেনের। তা মোটেই সেই গর্তের মতো নয়, যেখানে সে থেকেছে ধরা পড়ার আগে। জানোয়ার কিছুতেই ঢুকতে চাইলো না ঘরে।

শেষ পর্যন্ত অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে ডেরা গাড়লো ঘরটির নিচে। ছোটো একটি গর্ত খুঁড়ে তাতে সে নিজের লোম বিছিয়ে দিলো, আর তার কয়েক দিন পরেই সেখান থেকে শোনা গেল বাচ্চাদের চিঁচিঁ ডাক।

সেদিন থেকে উলভ্‌রেন বাচ্চাদের কাছ থেকে প্রায় সরেই না। তাদের কাছেই শোয়, দেখাশোনা করে, খাওয়ায়, তাপ দেয় ও এতো যত্নের সঙ্গে চেটে দেয় যে তাদের গায়ের লোম সব সময়ই ফুঁয়োফুঁয়ো ও পরিষ্কার দেখায়।

জানোয়ার ডেরা থেকে বেরোয় স্রেফ খাবারের জন্যে। পরিচারক তাকে মাংস ছুঁড়ে দেয়, আর সে তা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে যায় বাচ্চাদের কাছে। আগের মতো এখন সে আর পালাতেও চায় না। একবার পরিচারক দরজা দিতে ভুলে যায়, খাঁচা খোলা পড়ে থাকে — এমন কি তখনো উলভ্‌রেন পালালো না। বাচ্চা হওয়ার পর থেকে তার মনমেজাজও ভালো। ছোটো ছোটো, ফুলো-ফুলো লোমে ঢাকা বাচ্চারা হামেশা মা'র সামনে শুয়ে থাকে, আর যেই সে তাদের কাছে আসে অমনি তারা তাদের ভোঁতা মুখগুলো তুলে চেষ্টা করে তার দুধ খেতে।

বাচ্চারা বেশ নাদুসনুদুস, তবে মা কিন্তু দিন দিন খুব শুকিয়ে যাচ্ছে। তাকে এতো মাংস দেওয়া হয় যে তা এমন কি নেকড়েও খেয়ে শেষ করতে পারবে
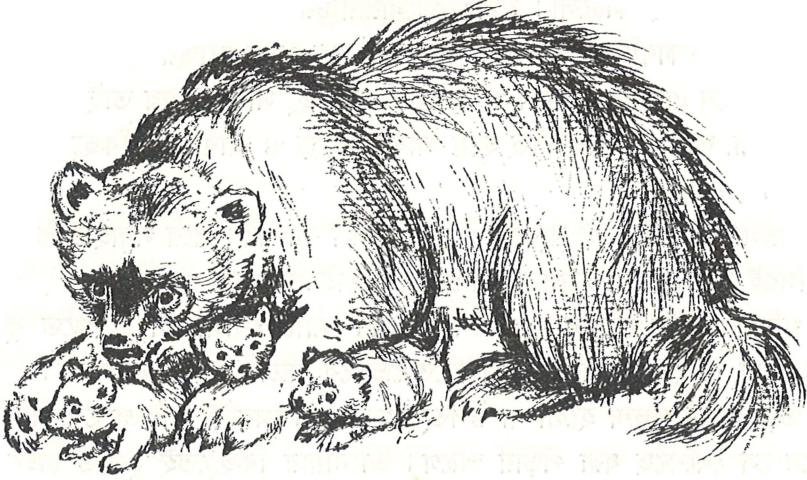
না, কিন্তু সে প্রায় খায়ই না। তাকে যাকিছু দেওয়া হয় সে তা নিয়ে যায় বাচ্চাদের জন্যে, আর নিজে থাকে ভুখা।

আলাদাভাবে তাকে খাওয়ানোর চেষ্টাও হলো। বাচ্চাদের থেকে সরিয়ে অন্য খাঁচায় নিয়ে গিয়ে তাকে মাংস দেওয়া হলো, কিন্তু উলভ্‌রেন বাচ্চাদের কাছে যাওয়ার জন্যে ভীষণ আকুল হয়ে উঠলো, কিছুই খেলো না।

মাস দুয়েক কাটে এভাবে। এতোদিনে বাচ্চারা একটু বড়ো হয়েছে, এখন নিজেরাই ডেরা থেকে বেরোতে পারে। ছোটো বাচ্চাদগুলি কিন্তু ভারি সুন্দর: নাদুসনুদুস, মোটাসোটা, দেখতে না কুকুরছানার মতো, না ভালুকছানার মতো, সারাদিন তারা একসঙ্গে থাকে। বাচ্চারা যখন খেলে মা পাশে বসে দেখে। যদি কোনোটি দৌড়ে একটু বেশি দূরে চলে যায় তো সে সাবধানে তার ঘাড় ধরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

বাচ্চাদের যদি কোনো বিপদের আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে সে কেমন একটা ডাক ডাকে, এবং বাচ্চারা, ঠিক যেন আদেশ পেয়ে, লুকিয়ে পড়ে ঘরের তলায়।

বাচ্চারা যখন পাশের খাঁচাটির কাছে যায় তখনই উলভ্‌রেনের বেশি ভয়। ওই খাঁচায় থাকে দুই নেকড়ে। অনেকদিন থেকেই দস্যুদুটির নজর তার বাচ্চাদের ওপর। খাঁচার কাছে তারা দৌড়ে এলেই নেকড়েরা গর্জে উঠে, তাদের গায়ের লোম

খাড়া হয়ে যায়, দাঁত দিয়ে জাল ধরে করে টানাটানি, চায় ছানাদের পাকড়াতে।

দিনের বেলা না হয় নেকড়েদের খেদায় পরিচারক, কিন্তু রাত্রে তো তাদের রাজ। একদিন নেকড়েরা যখন বরাবরের মতো জাল ধরে টানছে, জাল আর চাপ সইলো না, ছিঁড়ে গেল। হিংস্র জানোয়ারদুটি ঢুকে পড়লো উলভ্রেনের খাঁচায়।

বাচ্চাদের বিপদ দেখে মা সাহসে এগিয়ে যায় তাদের রক্ষা করতে। নেকড়েদুটির চেয়ে তার জোর ঢের কম, বাচ্চা না থাকলে এমন কি সে হয়তো পালিয়েও যেতো। কিন্তু নিজের পেটের বাচ্চাকে রেখে মা কি পালাতে পারে?

সে ক্ষেপে ঝাঁপিয়ে পড়ে নেকড়েদের উপর। কোনোমতে তাদের কামড় এড়িয়ে আবার মারে ঝাঁপ, দস্যুদের কিছুতেই বাচ্চাদের কাছে আসতে দেবে না।

কয়েক বারই নেকড়েরা ঘরের তলায় বাচ্চাদের নাগাল পেতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রতিবারই উলভ্রেন তাদের খেদিয়েছে।

লড়াইয়ে হঠাৎ ঘরটি উল্টে গেল। ছোটো ভীত বাচ্চাদের মাথার উপরে আর কিছুই রইলো না। শিকারোন্মত্ত নেকড়েরা তাদের ধরতে যাবে, কিন্তু মা ছানাদের ঢেকে ফেলে। সে তাদের উপর শুয়ে পড়ে, এবং নেকড়েরা যেদিক থেকেই হামলা চালায় না কেন সে যথাশক্তি তাদের ঠেকিয়ে রাখে।

বাচ্চাদের উপর বসে থাকায় উলভ্রেনের গায়ে কামড়ের পর কামড় পড়লো, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে দুশমনের সঙ্গে লড়ে গেল।

ভাগ্যিস, এমন সময় শব্দ শুনে দারোয়ান ছুটে এসেছিল। তা না হলে অসমান লড়াই কীসে শেষ হতো বলা শক্ত।

লোকটি তাড়াতাড়ি খাঁচা খুলে নেকড়েদের জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে যায়। তারপর এলো উলভ্রেনের কাছে। জন্তুটি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে, এমন কি উঠে দাঁড়ানোরও শক্তি নেই তার। কিন্তু তা সত্ত্বেও, দারোয়ান যখন দেখতে চাইলো বাচ্চাগুলো আস্ত আছে কিনা, সে গর্জে উঠলো — এখনো সে বাচ্চাদের জন্যে জীবন দিতে রাজী।

বাচ্চাদের কোনো ক্ষতি হয় নি দেখে দারোয়ান চলে গেল। উলভ্রেন কোনোরকমে উঠে দাঁড়ালো ও খুব যত্নের সঙ্গে চাটতে লাগলো বাচ্চাদের এলোমেলো লোম।

গালিয়ার সাথী

গালিয়া জীববিজ্ঞানের ছাত্রী। পড়াশোনায় থেকে চিড়িয়াখানায়ও কাজে ঢোকার ইচ্ছা তার। সে একজন ভাবী পক্ষীবিশারদ, ভাবলো চিড়িয়াখানায় নিশ্চয়ই পাখির অভাব হবে না।

চিড়িয়াখানায় এসেই সে প্রথমে গেল পক্ষীবিভাগের পরিচালিকা আন্না ভাসিলিয়েভনার কাছে। জিজ্ঞেস করে তাঁর হাতে কোনো কাজ-টাজ আছে কিনা। ভদ্রমহিলা গালিয়াকে দেখেন আপাদমস্তক, তাকান তার ফ্যাশন-দুরস্ত চুলের দিকে, হাই হিল জুতোর দিকে, তারপর বলেন:

— পরিচারিকা হতে চান?

— পরিচারিকা?! — পাল্টা প্রশ্ন করে গালিয়া। — সে আবার কি, কী করতে হবে আমাকে?

— যে-লোক জীবজন্তুর দেখাশোনা করে সে-ই পরিচারক, — বলেন আন্না ভাসিলিয়েভনা। — আর করতে হয় সবকিছুই। খাঁচা সাফাই, পাখিদের খাওয়ানো, তাদের দেখাশোনা, খাবার তৈরী, বাসনপত্তর ধোওয়া, মোটের উপর সবকিছু।

— কিন্তু কাজটা বোধ হয় কঠিন, — হঠাৎ বলে বসে গালিয়া। আগে সে কোথাও কখনো কাজ করে নি, তাই কাজের এতো লম্বা তালিকাতে সে ঘাবড়ে গেল।

— কাজ কঠিন নয়, — বলেন আন্না ভাসিলিয়েভনা, — শুধু একটু চেষ্টা করলে আর নিজের কাজকে ভালোবাসলেই হয়। — এবং কী একখানা কাগজ গালিয়াকে বাড়িয়ে দিয়ে যোগ করেন: — এই নিন কাজে ভর্তি হওয়ার জন্যে ফর্ম। যদি আমাদের এখানে আসতে চান তো ওটা ভরে দিন, আর কাল সকাল আটটার দিকে কাজে আসবেন।

গালিয়া যখন চলে যাচ্ছে, আন্না ভাসিলিয়েভনা বার কয়েক দেখেন তার দিকে। তিনি ভাবতেই পারেন না যে অমন সুন্দর ফিটফাট মেয়েটি চিড়িয়াখানায় আসবে।

কিন্তু গালিয়া এলো। এলো সে ঠিক সকাল আটটায়, কাজও শুরু করে দিলো। তোতাপাখিদের বিভাগে। গালিয়া দেখে, এসব পাখি মোটেই হাঁসমুরগির মতো নয়। কাজের পয়লা দিনেই গালিয়ার অবস্থা খারাপ — তোতাদের কান ফাটানো ডাকাডাকিতে তার একেবারে মাথা ধরে গেছে।

প্রথমে গালিয়াকে একা খাঁচায় পাঠানো হতো না। তার সঙ্গে থাকেন পুরনো অভিজ্ঞ এক পরিচারিকা — নিউরা মাসি। গালিয়ার সঙ্গে তিনিও খাঁচায় ঢুকেন, দেখিয়ে দেন কীভাবে খাঁচা সাফ করতে হয় কিংবা তোতাদের খাওয়াতে হয়, সময় সময় বলেন:

— এগুলোকে ডরাস না। খাঁচায় ঢুকতেই তারা উপরে চলে যায়।

আর সত্যিই তাই। খাঁচায় ঢুকলেই তোতারা ঝটাঝট উপরে উঠে যায়। পরিচারিকা খাবার রেখে গালিয়ার সঙ্গে বেরিয়ে গেলেই তারা আবার আসে নেমে। তারা কী সহজেই বড়শীর মতো ঠোঁট দিয়ে বড়ো বড়ো আখরোটগুলো ভেঙ্গে খায়। সে এক দেখার জিনিস বটে।

তারপর নিউরা মাসি গালিয়াকে নিয়ে যান অন্য এক খাঁচায়। ওতে থাকে প্রকাণ্ড দুই তোতা। রঙ তাদের কেমন যেন ধোঁয়াটে-নীল। আর ঠোঁটগুলো যা বিরাট না, গালিয়া তো দেখেই অবাক।

— এগুলো বড়ো জাতের, — সাবধানে খাঁচায় ঢুকে প্রতিবারই বুঝিয়ে দেন নিউরা মাসি: — এবং মনে রাখিস: এখানে একা আসবি না। আমি ওদের দেখাশোনা করছি অনেক দিন, কিন্তু এখনো তারা আমাকে কামড়াতে চায়, ভীষণ জেদী।

গালিয়া আগ্রহ নিয়ে দেখে 'জেদী' পাখিদের। অন্যান্য তোতাদের মতো তারা উপরে উঠে যায় না, সব রকমে চেষ্টা করে বিরাট বিরাট ঠোঁট দিয়ে পরিচারিকাকে ধরতে, টেনে নিতে চায় তার মাথার রুমাল। তোতাদের এরূপ ব্যবহার গালিয়ার বরং ভালোই লাগে। তারা খুব ছটফটে, মানুষের প্রতি তাদের হাবভাবও বেশ মজার। কামড়ায় তারা ঠিকই, কিন্তু নাশপাতির মতো খাঁচার উপরে তো আর ঝুলে থাকে না। তোতাগুলো গালিয়ার এতো ভালো লাগলো যে তার মন চাইলো তাদের সঙ্গে মিশে ও এই অবাধ্য পাখিদের কিছুটা 'সভ্যভব্য' করে তুলে। নিজের মনের কথাটি

সে বললো না নিউরা মাসিকে, তবে পয়লা দিন থেকেই গালিয়া চেষ্টা করে বারবার খাঁচার কাছে যেতে, তোতাদের সঙ্গে কথা বলতে কিংবা আলাদাভাবে কোনো ভালো খাবার দিতে। এক কথায়, পাখিদের মন কাড়ার জন্যে সে সবকিছুই করতে রাজি। তার এতো খাটনি অবশ্য জলে গেল না। সপ্তাহখানেক কাটতে না কাটতেই তোতাদু'টি বেশ আগ্রহ দেখাতে লাগলো তাদের তরুণী পরিচারিকাটির প্রতি।

গালিয়া লক্ষ্য করে মর্দা তোতাটি — সে এর নাম রাখে কুতিয়া — মাদীটির চেয়ে সাহসী ও শান্ত। গালিয়া খাঁচার জালের ফাঁক দিয়ে তাকে যখন চিনি দেয় সে দাঁড় থেকে নেমে এসে নির্ভয়ে তা নিয়ে নেয়। কিন্তু মাদী তোতা — গালিয়া এর নাম দেয় আরা — ভীষণ ডোরকো। গালিয়ার হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও সে তার হাত থেকে কিছু খেতে চায় না। তবে এটা সত্যি যে তোতাদের গালিয়াকে পছন্দ হয়, বিশেষ করে সে যখন তাদের সঙ্গে কথা কয়। তোতারাও তাকে কী সব বলে, আর কুতিয়া তো শিকের সঙ্গে ঘেঁষে গিয়ে পালক খাড়া করে দেয়। কিন্তু কী এর অর্থ — রাগছে না সোহাগ করছে, গালিয়া এখনো বুঝে না।

তোতাদের খাঁচায় গালিয়া যাওয়া-আসা করে একমাত্র নিউরা মাসির সঙ্গে। উনি তাকে একা যেতেই দেন না।

— নিউরা মাসি, আজ আমি নিজেই খাঁচা পরিষ্কার করবো, কেমন? — অনেক বার জিজ্ঞেস করেছে গালিয়া। — কাজে তো আমার দু'সপ্তাহ হয়ে গেল।

— দাঁড়া না বাছা, অত তাড়া কীসের, — বলেন নিউরা মাসি। — তোতা না হয় পাখিই হলো, কিন্তু তাকে তো জানা চাই। আরো একমাস কাটুক, তারপর না হয় একাই যাবি। পয়লা-পয়লা সবকিছু বুঝতে হবে তো।

তবে গালিয়াকে একমাস অপেক্ষা করতে হয় নি — এর অনেক আগেই সে নিজে নিজে কাজ শুরু করে দেয়। নিউরা মাসির অসুখ হয়, কাজে আসেন না। অবশ্য বিভাগের পরিচালিকাকে বললে অন্য লোক পাওয়া যায়, কিন্তু গালিয়ার খুব ইচ্ছে সে নিজেকে পরখ করে দেখে। বেশ, ন্যাকড়া ছুরি ঝাড়ু আর বালতিতে জল নিয়ে গেল গালিয়া খাঁচা সাফ করতে। এই প্রথম গালিয়া একা সবকিছু করছে। সেদিন তার কাজ খুব একটা ভালো উৎরোয় নি, সময়ও লেগেছে বেশি। তোতাদের খুব কাছে যেতে তার সাহস হয় নি ও এতো দেরিতে খাবার তৈরি করেছে যে

পাখিরা তো ক্ষেপে একেবারে আগুন — ভীষণ চেঁচাচ্ছে তারা। তবে পরদিন কিন্তু সবকিছু উৎরোলো খাসা, অবশ্য তোতাদের কাছে যেতে এক-আধটু ভয় তো হবেই।

নতুন পরিচারিকাকে দেখেই কুতিয়া আর আরা নিমেষে নেমে এলো তাদের দাঁড় থেকে। সবরকমে চেষ্টা করে তাকে ঠোকরাতে। কিন্তু গালিয়া তাদের ঝাড়ু কিংবা ন্যাকড়া দিয়ে খেদায় না। ধীরেসুস্থে সোহাগের সঙ্গে পাখিদের সে বোঝায় রাগ না করতে। তোতারাও গালিয়াকে ছোঁয় না। কথা বলতে বলতে যখন সে আরাকে হাত বাড়িয়ে দিলো, আরা বিরাট ঠোঁট দিয়ে তার একটি আঙ্গুল ধরে ফেলে, তবে একটু পরেই ছেড়ে দেয়। সম্ভবত মেয়েটির সোহাগী গলা পাখিদের ভালো লেগে গেছে, তাই তারা তাকে ছুঁলো না।

এবার গালিয়া জানে কী করে পাখিদের পটাতে হয়। দেখা গেল, ধীরেসুস্থে আদর করে কথা বললে তাদের খুব ভালো লাগে। তাই সে আরো বেশি দেখাশোনা করে আরা ও কুতিয়ার, এখন সে আর তাদের ডরায় না মোটেই।

আজকাল গালিয়া বরাবর একাই যায় খাঁচায়। নিউরা মাসি সেরে উঠে কাজে এসে তরুণী সহকারিনীর কাজকর্ম দেখে তো অবাক। খুব বাহবা দেন গালিয়াকে।

— সাবাস্ গালিয়া, — বলেন তিনি, — পাখিগুলোকে বেশ শিখিয়েছিস তো। আমার মতো বুড়িকে শুধু তারা ঠোকরাতেই জানে, আর জোয়ান মেয়েকে একেবারে ছোঁয়ই না।

গালিয়ার প্রতি খুব টান তোতাদের। তারা তাকে আর মোটেই ডরায় না। খাঁচায় ঢুকে যেই সে বালতি রাখতে যায় অমনি তোতাদু'টি গড়াতে গড়াতে নিচে নেমে আসে। আরা সঙ্গে সঙ্গে বালতির এক ধারে উঠে ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে ন্যাকড়াটি টানে, অনেকক্ষণ খেলে ওটা নিয়ে। তারপর ঠোঁট দিয়ে জল থেকে ন্যাকড়াটি তুলে নিয়ে চলে যায় সবচেয়ে উপরে। কুতিয়াও চুপচাপ বসে থাকে না। তার নজর ছুরির দিকে। ঠোঁট দিয়ে ছুরির কাঠের হাতল কামড়ে ধরে সেও ওখানা নিয়ে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে পড়ে। গালিয়া তাকে খুব সাধে বিপজ্জনক জিনিসটি ফিরিয়ে দিতে, — ছুরি দিয়ে সে নিজেকে কিংবা আরাকে জখমও তো করতে পারে।

কিন্তু লাভ হয় না সাধাসাধিতে। ছুরিখানা কিছুতেই ছাড়তে চায় না কুতিয়া। যখন সে ডাকাডাকি চেঁচামেচি শুরু করে একমাত্র তখনই গালিয়া ওখানা ফেরত

পায়। কারণ ডাকতে গিয়ে কুতিয়া যেই তার ঠোঁট খুলে অমনি ছুরিখানা পড়ে যায়।

ঝাড়াই-মোছাইয়ের জিনিসপত্র নিয়ে গালিয়াকে কী ঝামেলাই না সইতে হয়। সে যদি বালতি আর ছুরি অন্য খাঁচায়ও রাখে, তো কুতিয়া সহজেই ঠোঁট দিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে ওখানে ঢুকে যায়। তাতে অন্যান্য পাখিরা পায় ভয়। তখন গালিয়া দরজায় তালা দিতে আরম্ভ করে। তবে তোতারা এতে থামে না, এবার তাদের নজর ঝাড়ুর উপর। ঠোকরাতে ঠোকরাতে ঝাড়ুটির একেবারে শ্রাদ্ধ করে ছাড়ে তারা।

পাখিদের এসব বাড়াবাড়িতে গালিয়ার কাজে অনেক বাধা হয়। তবে সে গা করে না। তোতাদের দুষ্টুমিতে সে বরং মজাই পায়। এমন কি সে তাদের খাঁচা সাফাইয়ের কাজটি নিয়ে যায় একেবারে শেষে, যাতে সে বেশিক্ষণ থাকতে পারে তার আদরের পাখিদু'টির সঙ্গে। নতুন পরিচারিকাকে তারা একদম আপন করে নিয়েছে। তারা এমন কি তাকে তাদের ছুঁতেও দেয়। বিশেষ করে কুতিয়া। সে-ই রোজ পয়লা আসে গালিয়ার কাছে, তারপর মাথা নুইয়ে গায়ের পালক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এতে গালিয়া বুঝতে পারে যে কুতিয়া চাইছে সে যেন তার মাথাটি চুলকে দেয়। গালিয়া আদর করে চুলকে দেয় তার গা, কুতিয়ার তা বড় ভালো লাগে।

প্রায়ই কুতিয়া গালিয়ার কোলে উঠে। কখনো তার পকেট থেকে ঠোঁট দিয়ে বের করে ফেলে মিঠাই। কখনো তার জামার বোতামগুলো কামড়ায়।

— কী রে, রোজ রোজ তোর বোতামগুলো যায় কোথায়?! — অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন গালিয়ার মা। প্রায় প্রতিদিনই তাঁকে মেয়ের জামায় বোতাম সেলাই করতে হয়।

গালিয়াকে শেষ পর্যন্ত বলতে হলো যে এসব তোতার 'কাজ'। প্রথমে মা ভীষণ রাগেন, আর তারপর বলেন:

— জানিস্ গালিয়া, কী আমি ভেবেছি: এবার থেকে তোর জন্যে বোতাম ছাড়াই জামা সেলাই করবো। তখন যত ইচ্ছে যাস্ তোর ওই তোতাদের কাছে, কেমন?

মা'র কথা গালিয়ার ভালো লাগে নি। যদিও সে পরিচারিকা ও কাজটি তার নোংরা, তবুও সে হামেশাই খুব ফিটফাট। মা জানেন মেয়ের রুচি। তিনি তার জন্যে এমন এক ফ্যাশন বের করেন যা শেষে গালিয়ার সবচেয়ে প্রিয় কাজের পোশাকে পরিণত হয়। প্রথমত জিনিসটি তাকে খুব মানায়, দ্বিতীয়ত এটা পরে গালিয়া যখন খুশি যেতে পারে তোতাদের কাছে। কুতিয়া যে বোতাম ভেঙ্গে ফেলবে সে ভয়ও আর নেই।

তবে আরা কিন্তু বোতাম-টোতাম নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না। তার সখ অন্য ব্যাপারে: সে নাচ-গান ভালোবাসে। একই নাচ সে নাচে সব সময়, একবার বসে এ পায়ে, একবার ও পায়ে, আর গালিয়া যদি হাতে তালি বাজায়, তাহলে তো আর কথাই নেই। তখন আরা তালে তালে মাথা নেড়ে নাচে এতো মশগুল হয়ে যায় যে তাকে দেখে তখন হাসি থামানো দায়। যেকোন সময় নাচে আরা, বিশেষ করে যখন তার মনমেজাজ ভালো। তবে গায় সে শুধু সকালে কিংবা সন্ধ্যায়, যখন লোকজন থাকে না।

একদিন গালিয়া সঙ্গে আনে গ্রামাফোন। সে দেখতে চায়, তার পাখিদের গান কেমন লাগে। দেখা যায়, গানেও তাদের বিভিন্ন রুচি। আরার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে ওয়াল্‌জ আর জিপসি গান। সে সঙ্গে সঙ্গেই গানে ধুয়া ধরে চেষ্টা করে সুর মেলাতে, এবং মাঝেমধ্যে তার পক্ষে তা সম্ভবও হয়, বিশেষ করে উঁচু সুর বা হাসি থাকলে জমে ভালো। তবে কুতিয়ার কোনো খেয়ালই নেই ওয়াল্‌জ-টয়াল্‌জের দিকে। সে আছে তার ধান্দায়। কিন্তু যেই কুতিয়া 'জাজ' শুনতে পায়, অমনি সে গা ঝাঁকা দিয়ে উঠে সঙ্গে সঙ্গে গাওয়া অর্থাৎ, ঠিক করে বলতে গেলে, চেঁচাতে শুরু করে। সম্ভবত, গানবাজনায় আরার চেয়ে কুতিয়ার প্রতিভা একটু কম।

অন্যান্য তোতারাও সঙ্গীতে বেশ আগ্রহ দেখালো। রেকর্ডখানা যখন শেষ হয়ে গেল তখন যে কী সোরগোল শুরু হলো পক্ষীশালায়। সব তোতারা কী সব চেঁচামেচি জুড়ে দিলো, কী সব বলাবলি করতে লাগলো, যেন মাছের বাজার আর কি। তাদের দেখে প্রাণভরে খুব হাসলো গালিয়া। হাস্যকর এই পাখিগুলোকে তখন যদি দেখতে তোমরা!..

গালিয়া যত বেশি দেখাশোনা করে তোতাদের, যত বেশি জানে তাদের সম্বন্ধে, তত অবাক হয় পাখিদের স্মৃতিশক্তি আর উপস্থিতবুদ্ধি দেখে। যে পোশাকেই গালিয়া আসুক না কেন, কুতিয়া আর আরা তাকে ঠিকই চিনে ফেলে, দরজায় ছুটে যায় একটু আদর পেতে। মেয়েটিকে তারা খুব ভালোবাসে, এমন কি কথা না শোনার জন্যে সে যদি তাদের চড়-চাপড়ও মারে, তারা শুধু রাগে চেঁচায়, কখনো কামড়ায় না। কিন্তু গালিয়া হাত বাড়িয়ে একটু সোহাগের কথা বললেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাগ পড়ে যায় ও আবার আসে আদর কাড়তে।

তবে যারা তাদের সঙ্গে কখনো খারাপ ব্যবহার করে সেসব লোককে তারা ভীষণ ঘৃণা করে ও মনে রাখে। চিড়িয়াখানার কর্মী কুপ্রিয়ানোভের সঙ্গে এরূপ ঘটে। সারা জীবন তোতারা তাকে মনে রাখে। ঘটনাটি এই: গরমের শুরু তখন। তোতাদের বাইরের খাঁচায় নিয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে। সাধারণত কুপ্রিয়ানোভই একাজ করে। অবশ্য গালিয়া তক্ষুণি বলেছে যে সে নিজেই বড়ো জাতের তোতাদের সরিয়ে নেবে। কিন্তু তা করতে তাকে বারণ করা হয়।

— কী যে তুই বলিস, আঙ্গুলগুলো গেলে মজাটা টের পাবি! — ক্ষেপে যান নিউরা মাসি। তিনি কুপ্রিয়ানোভের হাতেই জালটি তুলে দেন।

জাল নিয়ে কুপ্রিয়ানোভ যখন খাঁচায় ঢুকলো, কুতিয়া ও আরা কিন্তু তখনো জানতো না কী ব্যাপার, কেননা তারা চিড়িয়াখানায় এসেছে হালে। তোতাদু'টি নিচে নামতে থাকে, আলাপ করতে চায় অপরিচিত লোকটির সঙ্গে। বরাবরকার মতো আগে নামে কুতিয়া। কিন্তু সে তৎক্ষণাৎই ধরা পড়ে জালে, এমন কি বেচারা একটু ডাকারও সময় পায় না। তারপর তোতাটিকে বাইরের খাঁচায় রেখে কুপ্রিয়ানোভ যায় আরাকে ধরতে।

রহস্যজনকভাবে বন্ধুকে উধাও হয়ে যেতে দেখে আরা ভয় পেয়ে ততক্ষণে উঠে গেছে একেবারে খাঁচার ছাদে। সে বুঝতে পেরেছে এর পেছনে কিছু একটা গোলমাল আছে।

কুপ্রিয়ানোভকে আসতে দেখে সে সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনে ফেলে, শুরু করে ভীষণ হুলুস্থুল, চেঁচামেচি, ডানা ঝাপটানো। আরাকে ধরতে কুপ্রিয়ানোভের বেশ বেগ পেতে হয়। খাঁচার ছাদে একেবারে কোণায় বসে থাকে সে, সেখানে জাল দিয়ে

তাকে ঢেকে ফেলা খুবই ঝামেলার কাজ। তাছাড়া আরা জোরে প্রতিরোধ করছে, থাবা দিয়ে জাল ঠেলে দিচ্ছে, ঠোঁট দিয়ে তা কামড়ে ধরছে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য অনেক কষ্টে কুপ্রিয়ানোভ আরাকে ধরে। তারপর তাকেও সে নিয়ে যায় কুতিয়ার কাছে।

সেদিন থেকে তোতারা লোকটিকে চিনে রেখেছে। সে যা-ই পরুক এবং যতই চেষ্টা করুক না কেন চুপি চুপি খাঁচার কাছে আসতে কিংবা দর্শকদের পেছনে লুকিয়ে থাকতে, পাখিদু'টি কিন্তু তাকে ঠিকই দেখতে পায়। তখন তারা যা চেঁচামেচি লাগায় তাতে পক্ষীশালার কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারে কে আসছে।

— কী হে কুপ্রিয়ানোভ, — হাসে তারা, — এখন তো আর চুপিচুপিও আসতে পারবে না আমাদের কাছে, কিলোমিটার দূরে থাকতেই টের পাই তুমি আসছ।

কুপ্রিয়ানোভ বহুবারই চেয়েছে কুতিয়া আর আরার সঙ্গে 'ভাব করতে'। সে তাদের হরেকরকম মিঠাই দিয়ে কত সেধেছে। তবে তার হাত থেকে তারা কিছুই নেবে না, উল্টে বরং তারা ক্ষেপে গিয়ে তাকে কামড়াতে চেষ্টা করে।

একবার কুপ্রিয়ানোভ তাদের খাঁচায় কী একটা নম্বর লাগাতে এলে তারা একেবারে লঙ্কাকাণ্ড শুরু করে দেয়। এতো কান ফাটানো চিৎকার এমন কি নিউরা মাসি পর্যন্ত কোনোদিন শুনেন নি — তিনি তো অনেক বছরই আছেন চিড়িয়াখানায়। কুতিয়ারই রাগ বেশি। সে শিকের কাছে ছুটে আসে, ডানা ঝাপটা মারে। নম্বরটি বাঁধার জন্যে লোকটি যেই তারটি ঢোকাতে যায় অমনি কুতিয়া করে হামলা।

কুপ্রিয়ানোভ পড়ে মহা ফ্যাসাদে। ডাকে গালিয়াকে। গালিয়া এসে খাঁচার দরজা খুলে ধীরে ধীরে গেল রেগে-আগুন তোতাটির কাছে।

— সাবধানে, কামড়-টামড় যেন না মারে, — তাকে সতর্ক করে দেয় কুপ্রিয়ানোভ।

তবে গালিয়া তার পাখিদের এখন ভালো জানে। সে কুপ্রিয়ানোভকে বলে সরে যেতে, তোতারা যাতে আর না ক্ষেপে। যখন সে চলে গেল, গালিয়া নুইয়ে সোহাগ করে বলতে লাগলো কুতিয়াকে:

— রাগ করো না কুতিয়া, কিচ্ছু হয় নি... কেউ তোমাকে ছোঁবে না... লক্ষ্মীটি, তোমাকে সবাই ভালোবাসে...

আদর পেয়ে কুতিয়া এবার শান্ত। সে গালিয়ার কোলে উঠে তার গালে মাথা লাগিয়ে বসে থাকে। আর গালিয়াও তখন খাঁচায় নম্বরটি বেঁধে দেয়। সেদিকে আর কোনো খেয়ালই নেই কুতিয়ার।

গরমের সময় বাইরের খাঁচায় তোতাদু'টি থাকে বেশ ফুর্তিতে, এখানে তারা যত খুশি খেলতে পারে। সম্ভবত তাদের ভালো লাগে যে খাঁচায় অনেক রোদ আছে, তাতে গা গরম করে বেশ চাঙ্গা হওয়া যায়, তাছাড়া এখানে তারা থাকে খোলা আকাশের নিচে, চারিদিকে কত সবুজ গাছপালা। গাছ থেকে কোনো পাতা পড়লে সেটাকে তোতারা ঠোঁট দিয়ে টেনে আনতে চেষ্টা করে, এবং আনতে পারলে খুশি মনে খায়। আজকাল প্রায়ই শোনা যায় তাদের গান, তাদের কী সব কথা। তবে তারা কী বলতে চায় গালিয়াও সব সময় বুঝে না।

কুতিয়া আর আরা অনেক কথাই জানে, তবে তারা কথাগুলো বলে অস্পষ্ট এবং যখন-তখন। যেমন, আরা যদি বলে 'আমি খাবো,' তার মানে এ নয় যে সত্যিই তার ক্ষিধে পেয়েছে। মোটেই নয়। একেবারে পেট ভরে খাওয়ার পরও সে এরকম বলে। তখন যদি গালিয়া তাকে আরো খাবার দেয়-ও সে তা বিলকুল ছোঁয়ই না।

গরমের সময় তোতাদের খাওয়ানো হয় অন্যরকম। তাদের দেওয়া হয় শাক-সব্জি, নানা ফলমূল বাদাম। আখরোটই খায় বেশি। পয়লা-পয়লা গালিয়া আখরোটগুলো ভেঙ্গে দিতো, সে ভেবেছিল এতো শক্ত খোসা ছাড়াতে পারবে না তোতারা। কিন্তু পরে সে দেখে, তাদের ঠোঁটে ভীষণ জোর, তাতে আখরোট ভাঙ্গা খুবই মামুলি কাজ।

তাদের এমন কি ভালোও লাগে ঠোঁট দিয়ে শক্ত কিছু ভাঙ্গতে। এটা লক্ষ্য করে গালিয়া নিয়ে আসে গোল এক কাঠের গুঁড়ি। কী আনন্দেই না তারা সেটাকে কামড়ায়! গুঁড়িটি নিয়ে তোতারা খুব খাটলো, — শিগ্‌গিরই দেখা গেল তারা তা টুকরো টুকরো করে ফেলেছে।

তোতাদের স্নান করতেও ভালো লাগে, বিশেষ করে গ্রীষ্মের কবোষ্ণ বৃষ্টির নিচে। বৃষ্টি শুরু হলেই আরা আর কুতিয়া চালার নিচে লুকিয়ে না পড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে, তারপর খাঁচার একেবারে উপরে উঠে বৃষ্টির দিকে পেটটি রেখে ঝুলে থাকে। গায়ের পালক ফুলিয়ে আর ডানা মেলে এভাবে তারা তিরিশ-চল্লিশ

মিনিট ঝুলে রয়। দেখলে সত্যিই হাসি পায়। যখন নেমে আসে, খুশি মনে নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করে, গা ঝাড়ে, পালক পরিষ্কার করে।

তোতারা থাকে মিলেমিশে, তবে মাঝেমধ্যে এক-আধটু ঝগড়াঝাটি হয় বৈকি। বিশেষ করে গরমের সময়। তখন কুতিয়া আরাকে ঠোঁট দিয়ে ঠোকরায়, আর আরা এক কোণে লুকিয়ে শুরু করে চিৎকার। গালিয়া নিজের পাখিদের ভালোই জানে, চিৎকারের ধরনেই সে বুঝে কী হচ্ছে ও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় আরার সাহায্যে।

গালিয়াকে দেখা মাত্রই কুতিয়া মার বন্ধ করে ছুটে দরজায়। গালিয়া যখন খাঁচায় ঢুকে, সে উঠে তার কোলে। তখন কুতিয়ার সঙ্গে যা খুশি তা-ই করা যায়। এমন কি হাতে চিৎ করে তাকে শিশুর মতো দোলানোও যায়। পেট উপরের দিকে রেখে কুতিয়া চুপচাপ শুয়ে থাকে মেয়েটির হাতে, সোহাগে করে বকবকম। তারপর গালিয়া তাকে দাঁড়ে বসিয়ে চলে যায়, আর কুতিয়া তখন যায় তার সখির কাছে, তাকে আর মারধর করে না।

পরীক্ষা

দেখতে দেখতে গরম চলে গেল। এলো শরৎ। সময় হলো তোতাদের শীতকালীন ঘরে নিয়ে যাবার। এবার কুতিয়া আর আরাকে নিয়ে যায় গালিয়া, কুপ্রিয়ানোভ নয়। পাখিদের ধরতে তার কোনো জালের দরকার হয় নি। সে সোজা খাঁচায় ঢুকে কুতিয়াকে কোলে তুলে নেয় ও মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে নিয়ে যায় শীতের খাঁচায়। তারপর আরাকেও।

আবার ঘরে এসে তোতাদের ভীষণ খারাপ লাগলো। মনমরা হয়ে তারা খাঁচায় ছুটোছুটি করে, জানলা দিয়ে দেখে, জোরে চেঁচায়। আর তাদের চেঁচামেচি শুনে অন্য তোতারাও তুলে হৈচৈ। ঘরের ভেতরে শুরু হয় ভীষণ গোলমাল, তাতে যেকোন নতুন লোক কালা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু গালিয়া এরূপ সোরগোলে অভ্যস্ত, এতে তার মোটেই অসুবিধা হয় না।

গালিয়া নিজের কাজ খুব ভালোবাসে। খাঁচা সাফাই, পাখিদের খাওয়ানো ইত্যাদি সব কাজ করেও ইনস্টিটিউটে যেতে তার কষ্ট হয় না। সে চলে একেবারে

রুটিন মাফিক, একটুও এদিক-সেদিক হয় না। সেজন্যেই সব কাজ ক'রে সে কখনো-সখনো এমন কি সিনেমা-থিয়েটারেও যেতে পারে।

তবে হঠাৎ একদিন তার এই রুটিনে ব্যাঘাত পড়ে। ঘটনাটি হয় শীতে, ঠিক গালিয়ার পরীক্ষার মুখে। খুব কন্‌কনে শীত তখন, হঠাৎ বিপদে পড়া গেল — ঘর গরম করার বয়লারটি ফেটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মজুত একটি বয়লার দিয়ে হিটিং ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা হয়। কিন্তু বয়লারটি একেবারে ছোটো, ফলে মিনিটে মিনিটে কমতে থাকে ঘরের তাপমাত্রা।

ছুটে এলেন আন্না ভাসিলিয়েভনা।

— জলদি ইলেকট্রিক হিটার বসাতে হবে, — বলেন তিনি, — তা না হলে পাখিদের সর্দি লাগতে পারে। এমনিতেই ওরা জমে যাচ্ছে।

সত্যিই, তোতারা গায়ে গায়ে লেগে জড়োসড়ো হয়ে আছে। কুতিয়া আর আরাও এক জায়গায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে। গালিয়ার এমন কি মনে হলো, তারা কাঁপছে। সে খাঁচায় ঢুকে তাদের হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে একটু গরম করার জন্যে। কুপ্রিয়ানোভ এলো দু'টি ইলেট্রিক হিটার নিয়ে। ওগুলো ঘরের মাঝখানে মেঝেতে বসাতে বলেন আন্না ভাসিলিয়েভনা। হিটার চালু হতেই নাকে এলো তাপের গন্ধ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই থার্মোমিটারে তাপমাত্রা বাড়তে লাগলো।

— যাক, বাঁচা গেল, — স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন আন্না ভাসিলিয়েভনা। — শুধু লোক রাখতে হবে হিটারগুলোর কাছে। তারগুলো পুরনো, কখন আবার আগুন-টাগুন লেগে যায় বলা তো যায় না।

প্রথম রাত্রে ডিউটি করে কুপ্রিয়ানোভ। পরে একটি তালিকা তৈরী হয়। তাতে পক্ষীশালার সবাই আছে, নেই শুধু গালিয়ার নাম।

— আমার নাম নেই কেন? — গালিয়া মন খারাপ করে, কিন্তু তাকে বলা হয়, তার পরীক্ষা, তাই পড়াশোনা করতে হবে।

পরিচালিকাও একই কথা বলেন।

— আপনি এবার পরীক্ষাগুলো দিন, — বলেন তিনি। — এমনিতেই কাজ করে করে পড়াশোনা চালানো আপনার পক্ষে কঠিন।

— দেখবেন, মোটেই কঠিন নয়, — তাঁকে বোঝায় গালিয়া, কিন্তু আন্না ভাসিলিয়েভনা তার অনুরোধে কান দেন না।

তখন গালিয়া ঠিক করে এবার থেকে সে একটু সকাল সকাল আসবে চিড়িয়াখানায়। অন্যান্য কর্মীদের আসার আগেই যত বেশি সম্ভব খাঁচা সে পরিষ্কার করে ফেলবে। সে ভাবলো এতে অন্তত কিছুটা সাহায্য হবে অন্যদের। তাই-ই সে করে। বাড়ীতে গিয়ে কাপড় বদলানো আর খাওয়া গালিয়ার হয়ে উঠে না। চিড়িয়াখানায়ই সে কাপড় বদলে মুখে কিছু দিয়ে ছুটে ইনস্টিটিউটে। বাড়ী ফিরতে গালিয়ার অনেক দেরী হয়। এসেই সে ঘুমিয়ে পড়ে, আর ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই দৌড়য় চিড়িয়াখানায়, যাতে সবার আগে গিয়ে বেশি করা যায়।

শেষ পর্যন্ত বয়লারটি ঠিক হলো। সেদিন গালিয়া ঠিক সময়ে কাজ শেষ করে। বাড়ী যেতে যেতে তার মনে হলো এবার সে কত নিশ্চিন্ত। এতো নিশ্চিন্ত, যেন সে তার পরীক্ষাগুলো দিয়ে দিয়েছে। মন তার ভরে উঠলো খুশিতে।

নেকড়ে আবার খাঁচায়

মিটিং শেষ হয়েছে, কিন্তু তখনো সবাই চলে যায় নি। হামেশা যেমন হয়ে থাকে এবারও অনেককিছু বলা হয় নি, অনেক কথা অস্পষ্ট থেকে গেল, তাই তর্ক চলতে থাকলো। যা নিয়ে তর্ক তা হলো — চিড়িয়াখানায় জন্তুজানোয়ার রাখার জায়গা কম, খাঁচাগুলো ছোটো ছোটো, তাও আবার যা আছে তাতে কুলোয় না।

তর্ক মিটালেন চিড়িয়াখানার মাতব্বর কর্মী পিওতর আলেক্সান্দ্রোভিচ। তাঁর প্রস্তাবটি খুবই সংক্ষিপ্ত ও কঠোর। তিনি বললেন ভালুক, নেকড়ে আর শেয়ালের মতো প্রাণীদের চিড়িয়াখানায় নেওয়া বন্ধ করা হোক। এমনিতেই ওগুলোতে খাঁচা একেবারে গিজগিজ করছে।

প্রস্তাবটি সমর্থন করলো সবাই। ব্যস সব ঠিক, এবার থেকে অতিরিক্ত জন্তু আর নেওয়া হবে না। এমন সময় দরজা খুলে কামরায় ঢুকলো একটি লোক। হাতের টুকরিটি মেঝেতে রেখে কপালের ঘাম মুছে সে বললো:

— কাজাখস্তান থেকে আপনাদের জন্যে উপহার নিয়ে এলুম... নেকড়েছানা।

কারো মুখে কথা নেই, — সবাই চুপ। প্রত্যেকেই বুঝলো, লোকটি অনেক দূর থেকে উপহার নিয়ে এসেছে। না নিলে ভালো দেখায় না। আর নিলেও আরেকটি খাঁচা দখল করতে হয়।

প্রথম কথা বললেন পিওতর আলেক্সান্দ্রোভিচ।

— দেখছি উপহারের জন্যে বেশ দাম দিতে হয়েছে আপনাকে, — বললেন তিনি। — কেন, ওগুলোকে কোনো ফার কারখানায় দিলেই পারতেন। তাতে বরং বকশীশ মিলতো, এতো দূরে আসারও দরকার হতো না।

— দিতে চেয়েছিলুম, — অবাক হয়ে উত্তর দিলো শিকারী। — কিন্তু তা আর হলো না: ছানা দু'টিকে বাড়ীতে দেখাতে নিয়ে এলুম, আর ওদের উপর মায়া হয়ে গেল। রাত কাটিয়ে সকালে উঠেই ছেলেমেয়েদের সোহাগ কাড়তে লাগলো,

শুরু করলো তাদের পেছন পেছন দৌড়োদৌড়ি। মারতে মন চাইলো না, ঠিক করলুম এখানে নিয়ে আসবো। ভাবলুম, ওদের যখন কপালে আছে তাহলে এখানেই থাকুক।

এই বলেই শিকারী নুয়ে পড়ে টুকরি খুলতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে ওর ভেতর থেকে শোনা গেল ছানাদের আঁচড়ানি, চেঁচামেচি। টুকরির ঢাকনাটি খুলতেই নিমেষে বেরিয়ে এলো দু'টি ধোয়াটে মুখ। তাদের গোলাপী জিব চাটতে লাগলো লোকটির হাত।

— এবার আপনারাই কন, ওগুলোকে কি মারা যায়? — হাসলো শিকারী। সে দেখছিল কী করে নেকড়েছানাগুলো আনাড়ির মতো টুকরি থেকে মেঝেতে পড়ছিল।

বাচ্চাদু'টি সঙ্গে সঙ্গেই সবার মন কেড়ে নিলো।

চওড়া-কপাল, লোমওয়ালা ছানাদের সবার সঙ্গে ভাব পাতাতে এক মুহূর্তও লাগলো না: লেজ নাড়লো, হাত চাটলো, আর পিওতর আলেক্সান্দ্রোভিচ যখন ওদের হাঁটুর উপর বসালেন তারা সময় নষ্ট না করেই তাঁকে 'চুমো খেতে' চাইলো। চেটে দিলো তাঁর মুখ, নাক, ঘাড়। শেষ পর্যন্ত একেবারে বেয়াদবের মতো তাঁর দাঁড়ি ধরে টানাটানি শুরু করে দিলো।

— থাক, থাক হয়েছে, — হেসে ফেললেন পিওতর আলেক্সান্দ্রোভিচ। — অত আর তেল মাখতে হবে না!

তাঁর হাসি আর ওদের গায়ে হাত বোলানো দেখেই আমরা বুঝে নিলাম নেকড়েছানাগুলোর ভাগ্যে আছে চিড়িয়াখানায় থাকবে।

বাচ্চাদের রাখা হলো ছোটো এক খাঁচায়। খাঁচাটিতে জায়গা খুবই কম, তবে ছাবালদের ওতে মোটেই অসুবিধে হয় নি। দূর থেকে কাউকে আসতে দেখা মাত্রই তারা ছুটতো দরজার কাছে, কান চেপে এমন মন গলানো চোখে চাইতো যে আপনা থেকেই ইচ্ছে হতো ওদের একটু আদর করি, নিয়ে যাই বেড়াতে।

বেড়ানোর সময় বাচ্চাদুটো ছুটোছুটি আর খেলাধুলো করতো ঠিক যেন কুকুরছানা।

তাদের দেখলে মনে হতো না নেকড়েছানা বলে — তারা ছিল এতোই
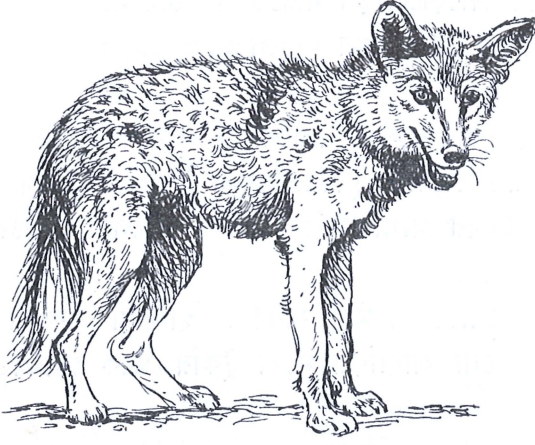
সোহাগী। সময় সময় এমনো হতো, উটকো হয়ে বসে 'তুতকি! তুতকি!' বলে কেউ সামান্য একটু ডাকলেই তারা খেলাধুলো রেখে ছুটে এসে চেষ্টা করতো মুখ চেটে দিতে।

শরৎকাল নাগাদ নেকড়েছানারা বেশ বেড়ে উঠলো। শীতে গা ঢেকে গেল সুন্দর ফুঁয়ো-ফুঁয়ো লোমে। এবার তারা ঠিক নেকড়ের মতোই দেখতে। 'তুতকি' নামে আর কেউ ডাকতো না তাদের। নেকড়েকে নাম দেওয়া হলো 'কাসকির' আর নেকড়েনীকে — 'কাসকিরকা'। কাজাখ ভাষায় এর মানে — নেকড়ে আর নেকড়েনী।

নেকড়েরা সবচেয়ে সুন্দর হলো তিসরা শীতে। তখন নিজের সৌন্দর্যে আর শক্তিতে তারা পুরোপুরি নেকড়ে। বিশেষ করে নেকড়েই খুব সুন্দর — চওড়া কপাল, বিরাট বুক; দেখলে মনে হতো একজন জোয়ান লোককেও উল্টে দেওয়া তার পক্ষে কিছুই নয়। আর অনেক বারই তো খেলতে খেলতে সে এমনটি করেছে।

বাড় আর জোর সত্ত্বেও কাসকির আর কাসকিরকা আগের মতোই বাধ্য ও সোহাগী। তবে হ্যাঁ, সবার সঙ্গে তাদের ব্যবহার সমান ছিল না। যাদের তারা ভালো জানতো তাদের দেখলে দারুণ খুশি হতো, আর যাদের জানতো না তাদের দিকে তাকাতোই না। আগের মতোই বিনা আশঙ্কায় তাদের উঠোনে ছাড়া যেতো কিংবা গলায় বেল্ট পরিয়ে নিশ্চিন্তে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া যেতো ভিড় রাস্তার মধ্য দিয়ে। স্পর্শ করতো না কাউকেই।

তবে নেকড়েরা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতো পিওতর আলেক্সান্দ্রোভিচ ও নিজেদের পরিচারক লিওনিয়াকে। আর বাসবেই তো: লিওনিয়া যে তাদের খাওয়ায়,

আদর-যত্ন করে, আর পিওতর আলেক্সান্দ্রোভিচ প্রায়ই আসেন তাদের কাছে, — বেড়াতে নিয়ে যেতে কিংবা এমনিতেই একটু আদর করতে।

খুব কথা শুনতো নেকড়েরা। তাদের আচার-আচরণও ভালো। সময় সময় ওদের এমন কি শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হতো বক্তৃতায়। চিড়িয়াখানা এরকম বক্তৃতার আয়োজন করতো স্কুলে, ক্লাবে, কলকারখানায়... লিওনিয়া পোষা প্রাণীদের দেখাতো, আর বক্তা তাদের নিয়ে করতেন গল্প।

প্রথমে লিওনিয়ার ভয় ছিল যে নেকড়েদের সামলানো মুশকিল হবে, তবে দেখা গেল মোটেই তেমন কিছু নয়। বিশেষ করে মঞ্চে কাসকিরের ব্যবহার ছিল অতি ভদ্র। তার এমন কি কয়েকজন প্রিয় বক্তাও ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা হলেই 'প্রণাম' করতে ভুলতো না।

সাধারণত লিওনিয়াই কাসকিরকে মঞ্চে নিয়ে আসতো। মাঝখানে রাখা টেবিল অবধি সে তাকে পৌঁছে দিতো, আর তারপর নেকড়ে অনায়াসে একলাফে উঠে পড়তো তাতে।

নড়চড় না করে সে দাঁড়াতো টেবিলে। তখন তাকে কী সুন্দরই না দেখাতো!

বক্তা যখন বলতেন যে এই হিংস্র জন্তুটি মানুষের অনেক ক্ষতি করে, কত গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি মারে, তখন নেকড়েটি যেন বুঝেশুনেই মুখ হাঁ করে দেখাতো তার বিরাট বিরাট দাঁত।

কাসকিরের এরকম ব্যবহারে সবাই খুব মজা পেতো। 'কী সাংঘাতিক জন্তু রে বাবা!', 'এমন জানোয়ারের সামনে পড়লে আর রক্ষে নেই!' — প্রেক্ষাগৃহ থেকে প্রায়ই এমন কথাবার্তা কানে আসতো।

বেশ, এবার বক্তৃতা শেষ। লিওনিয়া ধীরে ধীরে টানে কাসকিরকে, আর কাসকির বাধ্যের মতো একলাফে নেমে আসে টেবিল থেকে। এবং হঠাৎ সবাই দেখতে পায়, নেকড়ে মঞ্চ থেকে চলে না গিয়ে লিওনিয়াকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে বক্তার কাছে।

নেকড়ে একেবারে কাছে এসে পড়েছে, আর বক্তা বিপদ লক্ষ্য না করে আলোচনা চালিয়েই যাচ্ছেন। মিছেই লিওনিয়া তাকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে — আরো এক লাফ, ব্যস নেকড়ে সোজা বক্তার বুকে এবং... চাটছে তাঁর মুখ।

নেকড়ে চলে যায়, কিন্তু হাততালি অনেকক্ষণ থামে না।

কাসকির যাতায়াত করতো ট্রাকে। নিজেই সে গাড়ীতে লাফিয়ে উঠে এবং নিজেই ঢুকে খাঁচায়।

বক্তৃতা শেষে কাসকির যখন চিড়িয়াখানায় ফিরে আসতো নেকড়েনীর আনন্দ কে দেখে! নেকড়েদের মধ্যে ছিল খুব ভাব, তাই ছাড়াছাড়ি হলে তাদের মন হতো ভীষণ খারাপ।

একবার কাসকিরকে নিয়ে যাওয়া হলো সিনেমার ছবি তোলার জন্যে। প্রথম দিন তার ব্যবহার চমৎকার। যে ঘেরা বনে তার ছবি তোলার কথা তার চারিদিক সে ঘুরেফিরে দেখলো, যাকিছু আগ্রহ জাগায় তাই-ই শুঁকলো, লোকের সঙ্গেও তার পরিচয় হলো। অমায়িকভাবে কানদু'টি চেপে ওপারেটরের উদ্দেশে নাড়ালো ল্যাজ, প্রযোজককে দিলো গায়ে হাত বুলাতে। এক কথায়, নেকড়ের প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। শুধু এক আপসোস — সেদিন আর স্যুটিং হলো না, আবহাওয়া খারাপ।

— ঠিক আছে, আজ তাহলে আমাদের 'শিল্পী' আরাম করুক, কালকেই রোদ উঠবে, তখনই আমরা ওর ছবি তুলবো, — বললেন প্রযোজক।

এবং ঠিকই পরের দিনটি ছিল চমৎকার, কিন্তু হলে হবে কি, এবার নেকড়ের মেজাজ গেল বিগড়ে। সে অস্থির হয়ে খাঁচার মধ্যে ছুটছে। লিওনিয়া মাংস দিলো, খেলো না, শুধু কান পেতে কী যেন শুনছে।

নেকড়ের গলায় দড়ি দিয়ে লিওনিয়া তাকে ছবি তোলার জায়গায় নিয়ে যেতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কাসকির জেদ ধরলো ও কিছুতেই সেখানে যেতে চাইলো না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লিওনিয়াকে টানে নিজের বাক্সের দিকে। লিওনিয়া নেকড়ের মনোভাব স্পষ্ট বুঝতে পারলো।

— বাড়ী যেতে চাইছে। নেকড়েনীর জন্যে ওর মন কেমন করছে, — কাসকিরের মনের কথা লিওনিয়া প্রযোজককে বুঝালো।

— সব বাজে কথা, — বিশ্বাস হলো না প্রযোজকের। — এসো, তাড়াতাড়ি তুলে ফেলি, তারপরই চলে যাবে।

তবে 'তাড়াতাড়ি ছবি তুলতে' আর হলো না। কাসকির খাঁচার কাছ থেকে নড়লোই না। প্রথমত সে খাঁচার শিকগুলো খুলতে চেষ্টা করলো, তারপর দাঁত দিয়ে

কামড়ে চাইলো ভাঙ্গতে। নেকড়ে এতো ক্ষেপে উঠেছিল যে তখন সবাই স্যুটিং-ফুটিংয়ের কথা ভুলেই গেল। শেষ পর্যন্ত কাসকিরকে চিড়িয়াখানায়ই নিয়ে যেতে হলো। একটি ছবিও তোলা গেল না।

কাসকির আর কাসকিরকার মিলন যে কত মধুর তা বর্ণনাতীত! জানা গেল নেকড়েনীরও সারাক্ষণ নেকড়ের জন্যে মন খারাপ হয়েছে। সেও খায় নি। তবে এবার তারা একসঙ্গে। দুজনেই তৃপ্তির সঙ্গে খেলো মাংস।

কাসকির আর কাসকিরকা থাকতো খুব মিলেমিশে। এমন জুড়ি মেলা ভার। তাদের যখন মাংস দেওয়া হতো প্রত্যেকে নিজের ভাগেই সন্তুষ্ট থাকতো, কেউ কারো মাংস ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতো না। নেকড়েদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হলে কাসকিরই নেকড়েনীকে ছাড় দিতো। এরপরও যদি নেকড়েনী তাকে আক্রমণ করতো তাহলে কাঁধ পেতে সে সবকিছু সয়ে নিতো, যদিও নেকড়েনীকে জব্দ করা কাসকিরের পক্ষে খুব কঠিন ছিল না।

নেকড়েদের দেখে প্রায়ই আমরা ভাবতাম, খাঁচা থেকে ছাড়া পেলে তাদের ব্যবহার কেমন হবে, পালিয়ে যাবে কিংবা পালাবে না।

এ নিয়ে এমন কি প্রায়ই তর্ক হতো আমাদের মধ্যে। কেউ-কেউ বলতো — ফিরে আসবে, আর কেউ-কেউ — ফিরবে না। কথায়ই তো বলে না 'নেকড়েকে হাজার পোষ মানালেও নজরটি তার বনের দিকেই থাকবে'। নেকড়েরা নিজেরাই আমাদের সন্দেহ ও তর্কের সমাধান করলো।

একদিন পাইওনিয়র শিবির থেকে এলো টেলিফোন, — শিবিরের উদ্বোধন উপলক্ষে একটি ভালুকছানা নিয়ে আসতে অনুরোধ জানাচ্ছে তারা।

শিবিরটি ছিল মস্কোর একেবারে কাছেই। সহজেই যাওয়া যায় সেখানে। কিন্তু সেদিন চিড়িয়াখানার পোষ-মানা সব জন্তুই চলে গেছে বক্তৃতায়। ফিরবে দেরীতে। ভালুকছানাও তাদের সঙ্গে। তখন আমরা ঠিক করলাম ভালুকছানার বদলে কাসকিরকে নিয়েই যাবে। সে শান্ত স্বভারের, যথেষ্ট পোষ-মানা, তাছাড়া নেকড়েকে দেখতে ছেলেমেয়েদেরও ভালো লাগবে।

নেকড়ের সঙ্গে গেলাম লিওনিয়া আর আমি। লিওনিয়া কাসকিরকে ছেলেমেয়েদের দেখাবে, আর আমি নেকড়ের জীবন নিয়ে গল্প বলবো।

যাচ্ছি আমরা ছোটো একখানা গাড়ীতে। লিওনিয়া বসেছে ড্রাইভারের পাশে সামনের সীটে, আর আমি কাসকিরকে নিয়ে — পেছনে।

যতক্ষণ গাড়ী শহরের ভেতর দিয়ে চললো কাসকির বসে ছিল আমার পাশে, চুপচাপ জানলা দিয়ে দেখছিল। মস্কো ছাড়তেই শুরু হলো সবুজ মাঠ, বনজঙ্গল, ঝোপঝাড়... নেকড়ে একটু সরে গেল আমার কাছ থেকে। জানলার কাঁচে মাথা ঘেঁসে নাক দিয়ে ফুটো খুঁজতে লাগলো।

শ্বাস নিতে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। দেখে মায়া হলো আমার। জানলা খুলে দিলাম।

কাসকির সঙ্গে সঙ্গে মাথা বের করে দিয়ে বুক ভরে নিতে লাগলো তাজা হাওয়া। ক্রমশ সে মাথা বেশি বার করতে লাগলো... আমি ভাবলাম এবার কাসকিরের গলার বেল্ট ধরে বসবো, কিন্তু এমন সময় হঠাৎ সে একলাফে চলন্ত গাড়ীর জানলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লো। সবকিছু এতো আচমকা ঘটে গেল যে আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে উঠতে পারি নি কী হয়েছে। শেষে সম্বিৎ ফিরলে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম:

— গাড়ী থামান! গাড়ী থামান! কাসকির পালিয়েছে!

ব্রেক কষে গাড়ী থামানো হলো। লিওনিয়া আর আমি লাফিয়ে নামলাম। কাসকির রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে দেখতে লাগলো চারিপাশে। পরে গা ঝাড়া দিয়ে একটু ইতস্তত করে চললো বনের দিকে।

— কাসকির! এই কাসকির! — দূর থেকে ডাকলো লিওনিয়া। সে ভাবলো তার ডাক শুনেই নেকড়ে ফিরে আসবে।

আমারও তাতে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ফেরা তো দূরের কথা, কাসকির এমন কি একটু থামলোও না। কদম বাড়িয়ে গাছপালার মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

নেকড়ের পিছু পিছু আমরাও বনে ঢুকলাম, তবে তাকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। মিছেই আমরা এতো দৌড়োদৌড়ি আর ডাকাডাকি করলাম — নেকড়ে তো লাপাত্তা।

কাসকিরকে খোঁজে পাওয়ার আশায় এর পরেও বহুক্ষণ আমরা বনে ঘুরলাম, তবে সে নিশ্চয়ই অনেক দূরে চলে গেছে। কোনো ফল হলো না খোঁজাখুঁজিতে।

আমরা আর পাইওনিয়র শিবিরে গেলাম না। এখন আমাদের দরকার যত শিগ্‌গির সম্ভব চিড়িয়াখানায় ফিরে সব ঘটনা জানানো।

সে রাত্রে চিড়িয়াখানার অনেক কর্মীই বাড়ী গেল না। পিওতর আলেক্সান্দ্রোভিচও রইলেন আমাদের সঙ্গে। সম্ভবত তিনিই ছিলেন একমাত্র লোক যাঁর বিশ্বাস ছিল নেকড়েকে ফিরে পাওয়া যাবে।

ভোরের অপেক্ষায় আমরা বসে আছি অফিসঘরে, — নেকড়ের খোঁজে বেরোবো। ফরসা হতে একটু বাকি, কিন্তু আমাদের কারো চোখে ঘুম নেই। আমরা জানতাম যে সকালে নেকড়েকে ধরতে যাওয়া হবে। এই পোষ-মানা সোহাগী প্রাণীটির জন্যে সবারই মন খারাপ, তবে তারা এও বুঝতো যে পোষা নেকড়ে ছাড়া পেলে বিপজ্জনক। সে মানুষ দেখে অভ্যস্ত, কিছুতেই তার ভয় নেই, তাই কেউ জানতো না কখন সে কী করে বসবে।

বসে বসে আমরা নানা কথা ভাবছি, এমন সময় অফিসঘরে দৌড়ে এলো দারোয়ান। মুখে তার অস্থিরতার ছাপ।

— জল্‌দি... জল্‌দি আইয়ে... জানোয়ার! — কোনো রকমে শ্বাস নিতে নিতে বললো সে।

আমরা উঠে দৌড়লাম তার পেছন পেছন।

যেতে যেতে সে বললো যে চিড়িয়াখানার গেটের কাছে একটি জানোয়ার তার নজরে পড়েছে। জানোয়ারটি এতো তাড়াতাড়ি তার সামনে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল যে সে তাকে ভালো করে দেখতেই পায় নি। এরপর দারোয়ান কাছের ঘেরা আঙ্গিনায় শুনতে পেলো কীসের কেঁউ-কেঁউ ডাক। ভাবলো, ওখানে নিশ্চয়ই কোনোকিছু হয়েছে, তবে একা যেতে তার সাহস হলো না।

আমরা দৌড়ে গেলাম আঙ্গিনায়। পিওতর আলেক্সান্দ্রোভিচ বেড়ার দরজা খুলতেই আমরা... স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

নিজের খাঁচার পাশেই নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে 'আসামী', যে আমাদের এতো দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল। এই 'আসামীটি' হলো কাসকির।

— কাসকির! — ডাকলেন পিওতর আলেক্সান্দ্রোভিচ।

নেকড়ে ফিরে তাকালো এবং তাড়াতাড়ি ছুটে এলো পিওতর আলেক্সান্দ্রোভিচের

কাছে। এরপরে আমাদের কাছেও এলো। সে আনন্দে কেঁউ-কেঁউ করলো, চাটলো সবার হাত, মুখ। লিওনিয়া যেই খাঁচার দরজা খুললো নেকড়ে এক দৌড়ে ঢুকে প্রাণভরে আদর করতে লাগলো নেকড়েনীকে।

আর আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম নেকড়ের দিকে: মানুষের প্রতি তার মায়া যে কত বেশি তা ভাবাও যায় না। এই মায়ার টানেই তো সে ফিরে এসেছে চিড়িয়াখানার খাঁচায়।

পাখাদার বন্ধু

রাজহাঁস

চিড়িয়াখানায় আনা হয় অনেকগুলো রাজহাঁস। সাত-আটটা করে তাদের ভরা হয় কাঠের বাক্সে। বাক্স ছিল অনেক, কোনো রকমে জায়গা হয় দু'টি ট্রাকে।

হাঁসেরা নোংরা এবং পথে তারা একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে। এরকম অবস্থায় তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছাড়া যায় না। আগে তারা পালকগুলো পরিষ্কার করুক, একটু চাঙ্গা হোক, তারপর না হয় ছাড়া যাবে পুকুরে।

প্রথমে রাজহাঁসদের থাকতে দেওয়া হয় বড়ো একটি গরম ঘরে। ওখানে বেশ খোলামেলা দু'টি জলের ট্যাংকও আছে। সারাদিন ওগুলোতেই তারা সাঁতার দেয় ও খুব ভালো করে নিজেদের ধোয়। শিগ্গিরই তাদের পালকগুলো শাদা ধবধবে হয়ে উঠে, একটু দাগও নেই কোথাও।

এই ঘরটিতেই হাঁসেরা কাটায় সারা শীত। শেষে এলো বসন্ত। পার্কের পথে পথে গলে তুষার, পুকুর ভরে উঠে জলে। বসন্তের রৌদ্রস্নাত একটি দিনে পরিচারক নিকিতা ইভানোভিচ খুলে দেয় হাঁসেদের ঘরের দরজা। বেশ এক ফালি রোদ এসে ঢুকে ঘরে। সূর্যের আলো দেখে অস্থির হাঁসেরা, শুরু করে ডাকাডাকি, বাড়িয়ে দেয় লম্বা লম্বা গলা, ভিড় করে খোলা দরজার কাছে। ওখানে ডান দিকে পথ আগলে দাঁড়ায় অনেক লোক, আর বাঁ দিকে পুরো এক বালতি খাবার হাতে তাদের লোভ দেখায় নিকিতা ইভানোভিচ।

— আয় আয় আয়! — ডাকে তাদের পরিচারক।

একটি হাঁস সামান্য ইতস্তত করে পা বাড়ায়। তার পেছন পেছন পা ফেলে আরেকটি... তারপর আরো একটি... এবং তারপর সবাই বেরিয়ে পড়ে পথে। দেখে মনে হলো, যেন একটি শাদা ঢেউ এসে ঢেকে দিয়েছে চিড়িয়াখানার সরু পথটি।

প্রথমে হাঁসেরা যায় পরিচারকের পেছন পেছন। কিন্তু সামনের হাঁসগুলো হঠাৎ দেখে একটি পুকুর। সঙ্গে সঙ্গে ডানা ঝাপটা দিয়ে তারা ডাকতে আরম্ভ করে, তারপর ছুটে যায় জলে। বাকি হাঁসগুলোও তাই করে। খাবারের দিকে আর কোনো খেয়ালই নেই তাদের।

পুকুর ভরে গেল সুন্দর, তুলোর মতো শাদা এই পাখিগুলোতে। জলে তারা ডুবিয়ে দেয় তাদের লম্বা গলা, হাজার বার জল ছিটায়, ডানা ঝাপটায়, আর একেবারে সন্ধ্যা অবধি তাদের ডাকাডাকির কোনো বিরাম নেই।

ছাড়া পেয়ে পাখিরা কত খুশি। খাবারের কথা একেবারে ভুলেই গেল তারা। কিন্তু পরের দিন সকালে যেই নিকিতা ইভানোভিচ বালতিটি রাখলো অমনি হাঁসেরা ঝাঁপিয়ে পড়লো খাবারের উপর।

প্রথম শাবক

রাজহাঁসেরা থাকে খুব মিলেমিশে। কখনো তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে না, সব সময়ই রয় একসঙ্গে। কিন্তু একদিন নিকিতা ইভানোভিচ দেখে যে একজোড়া হাঁস দল থেকে সরে পড়ছে। এরা ছিল হাঁসা আর হাঁসী।

থাকে তারা একটু আলাদা আলাদা। অন্য কোনো হাঁস যদি তাদের কাছে আসতে চায় তো মর্দাটা সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে গিয়ে খেদায়। তারপর ফিরে আসে বউয়ের কাছে, অনেকক্ষণ তার সামনে মাথা নাড়ে, সোহাগ করে ডাকে।

শিগ্‌গিরই হাঁসদু'টি একটি জায়গা বেছে নিয়ে বাসা তৈরীর কাজে লাগে। পুকুরের সবচেয়ে দূর কোণে তারা বানাচ্ছে বাসা, বুড়ো ঝাঁকড়া উইলো গাছটির কাছে। ওখানে নিয়ে আসে ডালপালা, শুকনো পাতা... পাখিরা সবকিছু এক জায়গায় জড়ো করে। তারপর হাঁসীটি উপরে উঠে ঠোঁট দিয়ে তা গুছিয়ে নেয়।

বাসা তৈরী হয়ে গেলে হাঁসী পাঁচটি বড়ো, শাদা ডিম পাড়ে। বসে তা দিতে। হাঁস কাছেই থাকে, পাহারা দেয় কেউ যেন বাসার কাছে না আসে। কোনো পাখি একটু কাছিয়ে এলেই হাঁস ছুটে যায় ওটাকে তাড়াতে। আর যে

পাখি সময়মতো পালাতে না পারে তার কপালে যে কী দুর্গতি তা দেখলেই বুঝতে! হাঁসটি উড়ে গিয়ে তাকে বুকে চেপে ধরে ডানা দিয়ে এমন ধোলাই দেয় যে আর বলার নয়।
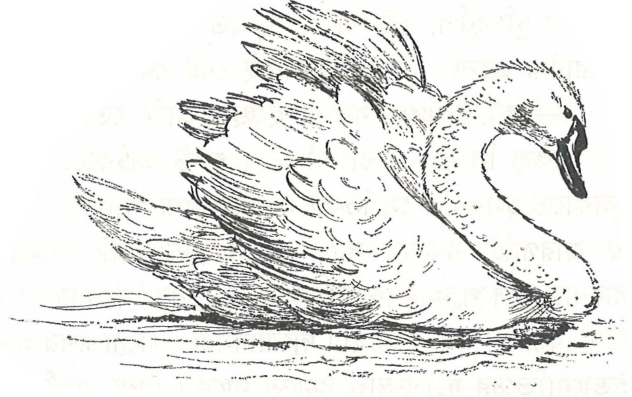
পুকুরের পাখাদার বাসিন্দারা আস্তে আস্তে বুঝতে পারে হাঁসের ডানার জোর। তারা আর তার বাসার চৌহদ্দিতেই যায় না। নিকিতা ইভানোভিচও পাখিদের খাবার দেয় একটু দূরে, হাঁসেরা যাতে না ক্ষেপে। এতোগুলো পাখির মধ্যে কুল্লে একজোড়াই তো বাসা বানিয়েছে। নিকিতা ইভানোভিচ যথাশক্তি চেষ্টা করে বাসাটি টিকিয়ে রাখতে, এবং সে একেবারে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে কবে যে বাচ্চা হবে।

একত্রিশ দিন পরে ডিম ফুটলো। বাচ্চাগুলো ভীষণ ছোটো ছোটো, গায়ে ধোয়াটে লোম। নিকিতা ইভানোভিচের খুব ইচ্ছে হয় কাছে গিয়ে বাচ্চাদের দেখতে, কিন্তু হাঁসেরা তাদের কড়া পাহারায় রেখেছে — এমন কি বাসার চেয়েও বেশি নজর তাদের দিকে। সাঁতার দেবার সময় মা বারবার দেখে বাচ্চারা কাছে আছে কিনা, বাবা চলে পেছন পেছন — পুরো পরিবারের নিরাপত্তার ভার তার উপর।

পাখাদার বাপ-মা'র এতো যত্ন দেখে নিকিতা ইভানোভিচ তো খুব খুশি।

তবে পরিচারকের মনের শান্তিতে হঠাৎ একদিন ব্যাঘাত পড়ে। খাঁচা থেকে শেয়াল পালিয়েছে। ঘটনাটি তেমন বড়ো কোনোকিছু নয়, কিন্তু নিকিতা ইভানোভিচকে তা ভীষণ দুশ্চিন্তায় ফেললো। শেয়ালটি তো পুকুরের দিকেও যেতে পারে, তখন যদি সে হাঁসেদের দেখতে পায় তো বাচ্চাদের একটিকেও আস্ত রাখবে না।

নিকিতা ইভানোভিচের মনে শান্তি নেই মোটেই। দিনে সে কাজ করে, আর রাত্তিরে চুপিচুপি, বউ যাতে শুনতে না পায়, বিছানা থেকে উঠে, কাপড় পরে বেরোবার জন্যে। কিন্তু প্রতিবারই যেই বেরোতে যাবে, বউ তাকে থামিয়ে দেয়:

— কী, কোথায় যাওয়া হচ্ছে! আমি তো আর কালা নই। ফেরো বলছি!

কিন্তু নিকিতা ইভানোভিচকে কেউ আটকাতে পারে না। দোষীর মতো মাথা চুলকাতে চুলকাতে সে ঠিকই বেরিয়ে যায় পুকুরের দিকে। হাঁসেরা যেখানে থাকে ঐ জায়গাটি একবার ঘুরে আসে, দেখে দারোয়ানরা ঘুমোচ্ছে কিনা, তাদের বারবার বলে পুকুরে চোখ রাখতে। তারপর ফিরে ঘরে।

কয়েক দিন কাটলো। দারোয়ানরা কোনো শেয়াল-টেয়াল দেখে নি। নিকিতা ইভানোভিচের দুশ্চিন্তাও কমতে থাকে। কিন্তু একদিন পুকুর ঘুরে বাড়ী ফেরার সময় হঠাৎ সে শুনতে পায় ভয়ঙ্কর হৈ-হল্লা। পুকুর থেকে ভেসে আসে ডানা ঝাপ্‌টানোর শব্দ, হাঁসের ডাক, শেয়ালের রাগী গলা। এ সবকিছু ঘটছে যেখানে হাঁসেদের বাচ্চারা ঘুমোয়। নিকিতা ইভানোভিচ সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটি বুঝতে পেরেই ছুটে গেল সেদিকে।

রাস্তার আলোয় দূর থেকেই সে দেখলো শেয়ালকে। শেয়ালটি পুকুরধারের লোহার শিকগুলোর ফাঁক দিয়ে হাঁসকে ধরতে চাইছে।
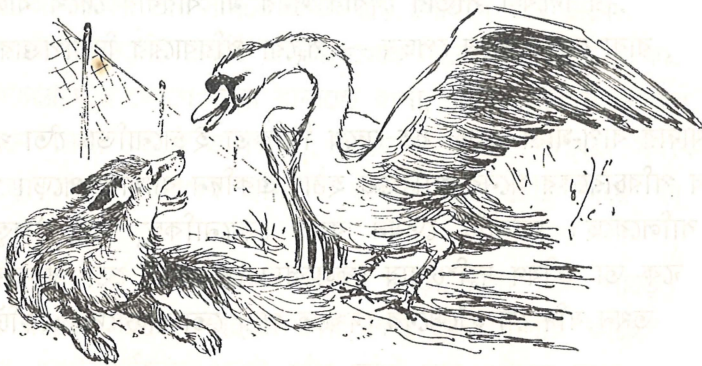
— হেই, দূর দূর! — দৌড়তে দৌড়তে প্রায় বেহুঁশ নিকিতা ইভানোভিচ চেঁচিয়ে উঠে শেয়ালটিকে খেদানোর জন্যে।

সে একদম কাছে এসে পড়েছে, কিন্তু শেয়াল পালায় না। সম্ভবত হাঁস তাকে টেনে ধরেছে, তাই যেতে পারছে না। বেশ কয়েক বার শেয়ালটি হামলা করে হাঁসের উপর, কিন্তু ডানার বাড়ি খেয়েই পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত পরিচারকের দু'একটা লাঠি খেয়ে দেয় ছুট। নিকিতা ইভানোভিচ নিচু বেড়াটি পেরিয়ে দেখে সামনে মাটিতে... পাখা ছড়িয়ে পড়ে আছে হাঁসের একটি বাচ্চা। বাচ্চাটি মাথা তুলছে, উঠতে চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। নিকিতা ইভানোভিচ নুইয়ে বাচ্চাটিকে তুলে নেয়। যেই সে তাকে জামার তলায় রেখেছে অমনি টের পেলো কী যেন জোরে জোরে পিঠ ঠোকরাচ্ছে। ফিরে দেখে বাচ্চাটির বাপ-মা, — সন্তানের বিপদে তারা তাকে বাঁচাতে ছুটে এসেছে।

নিকিতা ইভানোভিচ বাড়ী ফিরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে, সারা গায়ে আঁচড় আর জখমের দাগ। কর্তাকে দেখে গিন্নী প্রাসকোভিয়া ভাসিলিয়েভনা তো দারুণ ঘাবড়ে যায়।

— কী গো, তোমার এ সব্বনাশটি কে করলো? — গিন্নী প্রায় কেঁদে ফেলে।

নিকিতা ইভানোভিচ কোনো উত্তর দেয় না। জামার নিচ থেকে হাঁসের বাচ্চাটিকে বের করে মাথা নেড়ে শুধু বলে:

— উফ্, বেটা কী জখমটাই না করেছে!

বাচ্চাটিকে টুকরিতে রেখে একখানা কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয় তারা। সকালে নিকিতা ইভানোভিচ তাকে নিয়ে যায় ডাক্তারের কাছে। দেখা গেল, বাচ্চাটির পেটে খুব চোট লেগেছে ও ডান পা'টি ভাঙ্গা।

— বাচ্চাটিকে এখানেই রাখতে হবে, নিকিতা ইভানোভিচ, — বলেন ডাক্তার। — বাপ-মা'র কাছে ছাড়া যাবে না। মারা পড়বে।

কিন্তু নিকিতা ইভানোভিচ রাখতে চায় না বাচ্চাকে।

— আমার বাড়ীতে নিয়ে গেলে কী হয়? — জিজ্ঞেস করে সে। — বাড়ীতে থাকলে রাত্তিরেও না হয় উঠে দেখা যাবে আর দিনের বেলা তো কথাই নেই।

ডাক্তার রাজী। নিকিতা ইভানোভিচ যে খুব যত্নশীল পরিচারক একথা তিনি ভালো জানেন। তাছাড়া সে তো চিড়িয়াখানার এলাকাতেই থাকে, দরকার হলে বাচ্চাটিকে সব সময়ই পাওয়া যাবে। ভাঙ্গা পা'টি ভালোভাবে ব্যাণ্ডেজ করে ডাক্তার হাঁসটি ফিরিয়ে দেন পরিচারককে।

পালিত সন্তান

সেদিন থেকে হাঁসের বাচ্চাটি থাকে নিকিতা ইভানোভিচের বাড়ীতে। নিকিতা ইভানোভিচ তার পালিত সন্তানটির নাম রাখে — ভাস্‌কা। আগে ভাস্‌কা নামে তার একটি বেড়াল ছিল। বেড়ালটিকে সে খুব ভালোবাসতো। মনে হয় সেজন্যেই এরও এই নাম।

হাঁসের ছানা ভাস্‌কাকে থাকতে দেওয়া হয় উনুনের কাছে। নিকিতা ইভানোভিচ খড়কুটো দিয়ে সেখানে তার জন্যে বানিয়ে দেয় বাসা, রাখে জলের ছোটো একটি বাটি। পয়লা-পয়লা ভাস্‌কা একেবারে উঠে না। সব সময় শুয়ে থাকে, এমন কি খাবার খেতেও উঠতে পারে না। নিকিতা ইভানোভিচ নিজের হাতে তাকে খাওয়ায়। ঠোঁট খুলে মুখে দেয় নরম রুটি কিংবা জাউ, আর তারপর চামচে করে জল।

ধীরে ধীরে ভাস্‌কা সেরে উঠে। সপ্তাহ তিনেক পর সে ভাঙ্গা পায়ে দাঁড়াতে পারে, এগিয়ে যায় নিকিতা ইভানোভিচের কাছে।

নিজের নামটি সে ভালো জানে। 'ভাস্‌কা' বলে একবার ডাকলেই হলো, সঙ্গে সঙ্গেই সে ফিরে তাকায়, দেখে কে ডাকছে। তবে নিকিতা ইভানোভিচকে সে সবচেয়ে ভালো জানে। ভাস্‌কা সম্ভবত পরিচারককে নিজের মা মনে করে, তাই তার পেছন পেছন সে যায় সবখানে। নিকিতা ইভানোভিচ যখন খেতে বসে, ভাস্‌কা উঠে তার কোলে, প্লেটে ঠোঁট বাড়িয়ে দেয় কিংবা চেষ্টা করে সরাসরি চামচ থেকে কোনোকিছু তুলে নিতে।

— আর ক'দিন পর ও তোমার মুখেই ঢুকে যাবে! — এতো লাই দেখে রাগে প্রাসকোভিয়া ভাসিলিয়েভনা।

কিন্তু নিকিতা ইভানোভিচ শুধু হাসে, ভাস্কার মাথায় হাত বুলায় এবং বলে ঠাণ্ডা খাবার দিতে।

— তুমি যে হামেশা গরম ভালোবাসতে, — অবাক হয় গিন্নী।

— ভালোবাসতুম, তবে এখন আর বাসি না। দাঁতে ব্যথা করে, — বোঝাতে চায় নিকিতা ইভানোভিচ।

প্রাসকোভিয়া ভাসিলিয়েভনা কিন্তু ঠিক ধরতে পারে, আসলে ওর দাঁতে কোনো ব্যথাই নেই, ওর ভয় হাঁসের বাচ্চাটির মুখ যেন পুড়ে না যায়।

নিকিতা ইভানোভিচের বাড়ীতে ভাস্কা থাকে মাসখানেকের বেশি। সে পুরো সেরে উঠেছে, ডাক্তার অনেক আগেই বেণ্ডেজ খুলে ফেলেছেন, এবার তাকে পুকুরে ছাড়া যায়। কিন্তু নিকিতা ইভানোভিচ ভয় পায় ছাড়তে।

আরো কিছুদিন থাকুক না, — বলে সে। আদরের বাচ্চাটিকে কিছুতেই ছাড়বে না নিকিতা ইভানোভিচ।

কিন্তু ভাস্কা এখন বড়ো হয়েছে। তাকে বাড়ীতে রাখা দিন দিন মুশকিল হয়ে উঠছে। সে এতো বেড়েছে যে ছোটো গামলায় তার আর জায়গা হয় না, একটি টব কিনতে হলো।

স্নান করতে তার কী ভালো লাগে! যেই টবটি মেঝেতে রাখা হয় অমনি সে অস্থির, ডাকে, জলের বালতিতে মাথা ঢোকায়। নিকিতা ইভানোভিচ টবে জল ভরা শেষ করার আগেই ভাস্কা তাতে গিয়ে বসে পড়ে। আর তখন কী কাণ্ডটাই না হয়! চারিদিকে জল ছিটাতে থাকে, মেঝে ভেসে যায়, আর বিছানাপত্তর শুকোতে দিতে হয় রোদে।

— কী গো নিকিতার বউ, তোমাদের ভাস্কা বুঝি আবার চান করেছে? — জিজ্ঞেস করে পড়শীরা।

— আর কইয়েন না! ওকে নিয়ে আর পারি না! এক্কেবারে পুকুর বানিয়ে ছেড়েছে! — বালিশ-কম্বল রোদে দিতে দিতে বলে প্রাসকোভিয়া ভাসিলিয়েভনা।

নিকিতা ইভানোভিচ নিজেই বুঝে, পাখিটিকে আর বাড়ীতে রাখা যায় না। ব্যস, একদিন মন বেঁধে তাকে নিয়ে গেল পুকুরে।

বউও সঙ্গে গেল। সেও দেখতে চায় অন্য হাঁসেরা তাদের পালিত সন্তানটিকে কীভাবে নেবে।

— হাঁসদের দেখে ভাস্‌কা নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে, — বলে প্রাসকোভিয়া ভাসিলিয়েভনা।

ঠিকই তাই। ভাস্‌কাকে পুকুরে ছাড়তে না ছাড়তেই সে আনন্দে ডানা ঝাপটিয়ে তাড়াতাড়ি সাঁতরে গেল রাজহাঁসদের কাছে। তাকে পেয়ে তারা খুশি। সবাই ভাস্‌কাকে ঘিরে কী সব ডাকাডাকি করে, মাথা নাড়ে...

নিকিতা ইভানোভিচ আর প্রাসকোভিয়া ভাসিলিয়েভনা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে তাদের ভাস্‌কাকে। বরফের মতো শাদা, বুড়ো রাজহাঁসদের মধ্যে ধোয়াটে পালক জোয়ান ভাস্‌কাকে চিনতে কষ্ট হয় না। ছাড়া পেয়ে তার যে কী আনন্দ! মন ভরে জল ছিটাচ্ছে!

— ভাস্‌কা, এই ভাস্‌কা! — ডাকে তাকে নিকিতা ইভানোভিচ।

কিন্তু সে এমন কি ফিরেও তাকায় না।

— এমনিই হয়: খাওয়াও-দাওয়াও — সব ঠিক আছে, আর চলে গেলে ফিরেও চায় না! — দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাড়ীর দিকে রওয়ানা দেয় নিকিতা ইভানোভিচ।

কিন্তু দশ পা যেতে না যেতেই বউ তাকে ডেকে বললো:

— ওগো, দেখো ভাস্‌কা যে আসছে!

নিকিতা ইভানোভিচ ফিরে দেখে: দল ছেড়ে সোজা তার দিকে সাঁতরে আসছে ভাস্‌কা। সে খুব তাড়াতাড়ি আসছে, ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে চারিদিকে। হঠাৎ নিকিতা ইভানোভিচের উপর চোখ পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে পাড়ে এসে হাজির।

— আয়, সোনা আমার! — ছুটে যায় নিকিতা ইভানোভিচ ভাস্‌কার কাছে।

আর হাঁসটি কিন্তু টের পেলো যে তাকে ছেড়ে যাওয়া হচ্ছে। ভয়ে সে মালিককে আঁকড়ে ধরলো, চেষ্টা করলো মাথাটি তার হাতের নিচে ঢুকিয়ে রাখতে।

এই ঘটনার পর নিকিতা ইভানোভিচ ঠিক করে হাঁসকে ধীরে ধীরে পুকুরে অভ্যস্ত করাতে হবে। আজকাল কাজে নিকিতা ইভানোভিচ একা যায় না, পাশে পাশে চলে তার আদরের ভাস্‌কা।

সব আগে তারা যায় চিড়িয়াখানার দারোয়ানের কাছে চাবি নিতে। তারপর — রান্নাঘরে খাবার পেতে।

সেখানে নিকিতা ইভানোভিচ যখন ভাণ্ডারীর কাছ থেকে খাবার নিতে থাকে, ভাস্‌কা চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। সে দেখে কোন্ বস্তায় কী আছে, সবখানে গলা লম্বা করে উঁকি মারে, চেষ্টা করে ঠোঁট দিয়ে সবকিছু ছুঁতে। একবার তো সে শণের বস্তাটাই খুলে ফেলে। শণ ছড়িয়ে যায় ঘরময়। নিকিতা ইভানোভিচ আর ভাণ্ডারীর অনেক সময় নষ্ট হয় ওগুলো তুলতে।

এতো দুষ্টুমিতেও কেউ কিন্তু ভাস্‌কার উপর রাগ করে না। চিড়িয়াখানার সব কর্মীরাই তাকে ভালোবাসে, দেখা হলেই তাকে কোনোকিছু খেতে দেয়।

পয়লা দিকে সে নিকিতা ইভানোভিচকে ছেড়ে যায় না কোথাও। পরিচারক যদি পুকুরের কাছে কাজ করে, তো সে স্নান করে, সাঁতার দেয়। আর নিকিতা ইভানোভিচ যদি যাওয়ার জন্যে তৈরী হয় তো সে ছুটে তার পেছন পেছন।

ধীরে ধীরে ভাস্‌কা নিকিতা ইভানোভিচকে ছেড়ে একা থাকতে শিখলো। এখন রাত্তিরেও তাকে পুকুরে রেখে চলে গেলে সে আর ছটফট করে না, শুধু গলা লম্বা করে চেয়ে চেয়ে দেখে নিকিতা ইভানোভিচের যাওয়ার পথের দিকে।

ভাস্‌কার এমন মায়ায় সবাই অবাক মানে। বিশেষ করে একবার যখন সে বিপদের সময় তার প্রভুকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে।

ব্যাপারটি ঘটে হেমন্তে। ভাস্‌কা তখন বড়ো হয়েছে, গায়ে জোরও আছে। আগের মতোই নিকিতা ইভানোভিচকে সে ভালোবাসে। পরিচারক যখন তাকে বেড়াতে ছাড়ে সে যায় তার পায়ে পায়ে। একবার তারা চিড়িয়াখানার পথ ধরে যাচ্ছে, নিকিতা ইভানোভিচ হঠাৎ দেখে তার দিকে ছুটে আসছে বছর বয়সী এক ভালুকছানা। ভালুকছানাটি পোষা। তাকে চিড়িয়াখানায় আনা হয়, কিন্তু

এমন অদ্ভুত পরিবেশে সে পায় ভয়। তারপর মালিকের হাত ছাড়িয়ে দেয় দৌড়।

জানোয়ারটি অনেক সর্বনাশই করতে পারতো। নিকিতা ইভানোভিচ তাকে ধরতে চায়, কিন্তু ভালুকটি তাতে আরো ভয় পেয়ে উঠে গর্জে। সে তখন লোকটির উপর ঝাঁপ দেবে, তবে এমন সময় আচমকা সামনে এসে দাঁড়ায় ভাস্‌কা। সে ঝাঁপিয়ে পড়ে জানোয়ারের গায়ে। ভালুক তো একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল, তবে হাঁস তাকে ছাড়ে না, — ধমাধম্‌ কিছুটা বসিয়ে দেয়। ঠিক তক্ষুনি ভালুকের মালিক এসে হাজির। সে ভালুকটিকে শেকলে বেঁধে নিয়ে চলে যায়।

এই ঘটনার পর নিকিতা ইভানোভিচ আরো বেশি ভালোবাসে তার পাখাদার বন্ধুটিকে। রাজহাঁসও তার প্রভুকে আরো আপন করে নেয়। নিকিতা ইভানোভিচকে দেখলেই ভাস্‌কার মন আনন্দে ভরে উঠে, দূর থেকেই সে জোরে জোরে ডাকে, ডানা ঝাপটায়, ছুটে যায় তার কাছে।

ভালুকছানা

ভালুকছানাটির নাম কাপুশা*, কারণ সে হামেশাই ঢিমে তেতালায় চলে: বেড়াতে যায় সবার পরে, খায়ও খুব ধীরে ধীরে। কাপুশার ভাই দ্রানিনোস কিন্তু সেরকম নয়, সে ছিল সবচেয়ে পাঁজি ও রাগী, অন্যান্য ভালুকছানাদের সঙ্গে তার লড়াইয়েরও সময় থাকতো। বোন লিজুনিয়াও পিছিয়ে নেই। নিজেরটা খেয়ে-দেয়ে অন্যদের বাটিগুলোও দিতো চেটে। তবে কাপুশা সেই কাপুশাই রয়ে গেল — কিছুতেই তার তাড়া নেই...

ভালুকছানাদের মধ্যে একমাত্র কাপুশাই ছিল শান্ত স্বভাবের। মনটিও তার সরল। নির্ভয়ে তার মুখে আঙুল দেওয়া যেতো, সরিয়ে নেওয়া যেতো খাবার। দ্রানিনোসের সঙ্গে কিন্তু তেমনটি চলবে না। ওর মুখে আঙুল একবার দিয়ে দেখো না! কাছে এসে চাটতে চাটতে হঠাৎ এমনভাবে কামড়ে ধরবে যে ছাড়াতেই পারবে না। অন্যান্য ভালুকছানাদেরও সে জ্বালাতো সব সময়। গায়ে জোর নেই, কিন্তু লড়াই করতে ওস্তাদ। নাকটি তার সব সময়ই জখম থাকে। সাধে কি লোকে তাকে ডাকে নাকভাঙ্গা।

কাপুশাকে সবাই ভালোবাসে। সে খেলতোও বেশ আলাদা ধরনে: ধীরেসুস্থে, হেলেদুলে। সময় সময় ডিগবাজি খেয়ে বসে তাকিয়ে দেখতো: কী ব্যাপার, গাছটি কেন অন্যদিকে চলে গেল ?

সবচেয়ে তরুণী প্রকৃতিবিদ মানিয়ার সঙ্গে কাপুশার ভারি ভাব, কারণ মানিয়ার জামায় আছে অনেক বোতাম, আর কাপুশা ওগুলো চুষতে ভালোবাসে। কোনোকিছু চুষতে ভালুকছানাদের খুবই ভালো লাগে, বিশেষ করে কাপুশার। সে যা পেতো তাই-ই চুষতো। হোক তা নিজের থাবা, বোতাম কিংবা পড়শীর

---

* মানে যে সবকিছু করে খুব ধীরে ধীরে। — অনুঃ

কান — ওতে কিছু এসে যায় না। চুষতে চুষতে মজা পেলে সে চোখ কোঁচকাতো আর করতো গরগর শব্দ। এমনিতে কাপুশা খুবই শান্ত। এরকম ভালুকছানা মেলে কম। সাধারণত এরা হয় ভীষণ রাগী, পান থেকে চুন খসলেই আর উপায় নেই — সোজা কামড়, তবে কাপুশা কখনো তা করে না।

তাই আমাকে যখন কোনো একটি জন্তু নিয়ে কিন্ডার গার্টেনে আসতে নেমন্তন্ন করা হলো, প্রথমেই আমার নজর পড়লো কাপুশার উপর।

ছেলেমেয়েদের কাছে

সকালেই গাড়ী এলো আমাদের নিতে। ড্রাইভারকে একটু অপেক্ষা করতে বলে আমি গেলাম কাপুশাকে আনতে। কাপুশা বেড়াতে ভালোবাসতো। শেকল পরাতে কোনো ঝামেলা করলো না, খুশ মেজাজে আমাকে খাঁচা থেকে টেনে বের করে আনাড়ির মতো হেলেদুলে চলতে লাগলো আগে আগে। গাড়ীর কাছে এলাম। গাড়ীখানা কালো, অপরিচিত, ভয়ঙ্কর এবং যেসব জন্তুকে কাপুশা জানতো দেখতে তাদের মতো নয় মোটেই। দারুণ ভয় পেলো সে। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, চোখদুটো হলো গোলগোল, ঠোঁট করলো চোখা, এবং নড়চড় না করে এইভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ ফিরেই দিলো দৌড়। অনেক কষ্টে তাকে সামলালাম... জোরে ধরলাম, যেতে দিলাম না,

তাতে কাপুশা ভয় পেলো আরো বেশি। কোত্থেকেই বা তার এতো জোর! জায়গা থেকে সরলো না, যা পেলো ধরে থাকলো এবং এমন বিকট চিৎকার শুরু করলো যে চিড়িয়াখানার সবদিক থেকে লোকজন এলো ছুটে। শেষ পর্যন্ত একটি বাক্সতে বসিয়ে তাকে গাড়ীতে উঠাতে হলো।

সারাটি পথ কাপুশা চেঁচালো, গোঙালো, আঁচড়ালো। শান্ত হলো কিণ্ডার গার্টেনের কাছে এসে। ভালুকছানা দেখিয়ে আমি ছেলেমেয়েদের অবাক করতে চেয়েছিলাম, তাই সে চুপ হওয়ায় আমি খুব খুশি হলাম। চেঁচানো বন্ধ না হলে সবকিছু মাটি হয়ে যেতো।

কাপুশাকে কোনো এক কামরায় রেখে ছেলেমেয়েদের কাছে গেলাম। গোপনতা সত্ত্বেও তারা সম্ভবত ব্যাপার-স্যাপারের কিছুটা জানতো: তারা অধীর হয়ে ছটফট করছে, দরজার দিকে দেখছে আর ফিসফিস বলাবলি করছে কীসব। তবুও যখন কাপুশাকে নিয়ে এলাম প্রথমে সবাই অবাক হলো, আর তারপর তারা বললো: 'নাও, লক্ষ্মীটি, এই নাও।' এবং সঙ্গে সঙ্গেই টেবিলের সবকিছু হয়ে গেল তার।

এখানে কাপুশা ভয় পেলো না। শিগ্‌গিরই সে খেতে লাগলো আপেল, চকলেট, বিস্কুট। এটা ওটা বাছলো, চাইলো সবচেয়ে মিষ্টি খাবার। কিছু পরেই তার পেটটি দেখালো ঢোলকের মতো। সে প্রায় চলতেই পারছিল না এবং ঘুম-চোখে দেখছিল চারদিকে।

ছেলেমেয়েদের কী আনন্দ! তারা যে কী করবে বুঝতে পারলো না। কাপুশার পেছন পেছন চললো, তাকে খুব আদর করলো এবং বললো আরো একটু খেতে।

সেদিন ফিরলাম আমরা বেশ দেরীতে।

চলে আসার সময় ছেলেমেয়েরা বললো কাপুশাকে নিয়ে আরো যেন আসি। রাস্তায় খাবার জন্যে তাকে দিলো মিঠাই। ফেরার পথে সে ছিল চুপচাপ — চেঁচায় নি, আঁচড়ায় নি। গাড়ীতে করে সোজা তাকে নিয়ে এলাম খাঁচার কাছে। বাক্সটি নামালাম। খুলতেই আমরা... চমকে উঠলাম। সে যে কী কাণ্ডকারখানা দেখলেই বুঝতে! কাপুশার সারা মুখ আর মাথা ক্রীমে মাখা। গায়ে লেগে আছে বিস্কুটের

টুকরো, লোমে ঝুলছে গলে-যাওয়া লজেন্স, আর মুখে সে পুরেছে ইয়া বড়ো এক আপেল। তার এই চেহারা দেখে এমন কি ভালুকছানারা পর্যন্ত তাকে চিনতে পারলো না।

কাপুশা বেরোতেই পঁচিশটি ভালুকছানার সবক'টিই একদৌড়ে উঠে পড়লো গাছের একেবারে মগডালে। কিন্তু যখন তারা তাকে চিনে ফেলে নিচে নামলো তখন কী হলো জানো! বেচারী কাপুশা! সে জানে না কোথায় লুকোবে। ভালুকের পাল ছুটলো তার পেছনে, লোম থেকে বেছে নিলো এঁটে-থাকা লজেন্স, কেড়ে নিলো আপেল, দ্রানিনোস আর একটু হলেই খাবল মারতো তার ক্রীম-লাগালো কানে।

ভালুকছানারা সেদিন শুলো খুব দেরীতে। সবাই তারা গাঢ় ঘুমে, তবে কাপুশা এরপরও অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করে করুণ গলায় গোঙালো। তার সারা শরীরে ছিল জখম।

'চিত্রতারকা' কাপুশা

চিড়িয়াখানায় একটি ছবি তোলা হচ্ছিল। ছবিটির নাম — 'কীট-পতঙ্গ'। তাতে অভিনয় করছিল নানা ধরনের পোকা মাকড় প্রজাপতি। কাপুশাও ছিল অভিনয়ে। তার ভূমিকাটি ছোট্ট: গাছে উঠা, মৌচাক খোলা, মধু খাওয়া — ব্যস আর কিছু নয়। ছবি তোলার সময় কোনো ভুলচুক যাতে না হয় সেজন্যে আগেই তাকে কিছুটা তালিম দেওয়া হবে ঠিক হলো। পয়লা বার মৌচাক রাখা হলো মাটিতে। তাতে মধু রেখে ডাকলাম কাপুশাকে। ভয়ে ভয়ে কাছে এলো কাপুশা। অচেনা জিনিস তো, তাই ভয় লাগলো: কে জানে, হঠাৎ কোনোকিছু বেরিয়ে কামড়ে দেবে, তাছাড়া কাপুশা এমনিতেই ডরপোক। অনেকক্ষণ সে মৌচাকের চারিধারে ঘুরলো: এই শুঁকে, এই ছোঁয়; পরে যখন দেখলো ভয়ের কিছুই নেই, পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ফোঁকরে নাক গলিয়ে দিলো। শ্বাস নিতেই পেলো মিষ্টি গন্ধ।

কাপুশা তো অস্থির। মিষ্টি জিনিসটি খেতেই হবে। মৌচাকে সে মাথা ঢোকাতে চাইলো, কিন্তু মাথাটি বড়ো, ঢুকলো না। নানাভাবে সে চেষ্টা করলো, — কিছুতেই কিছু হলো না। তখন সে থাবা ঢুকালো। থাবা সহজেই ভেতরে চলে গেল। কাপুশা মৌচাক খুলে মধু চেকে দেখলো... বাঃ, কী চমৎকার, এ জিনিস কি আর ভালো না লাগতে পারে! কিছুই চাটতে বাকি রাখলো না সে, এমন কি তক্তাগুলো পর্যন্ত। পরে শুয়ে শুয়ে থাবা চাটতে লাগলো।

পরের বার মৌচাকটি আমরা গাছে ঝুলিয়ে দিলাম। মই বেয়ে উঠে ওতে মধু রাখতে রাখতে আমি ডাকলাম 'অভিনেত্রীকে'। 'অভিনেত্রী' এলো ডিগবাজি খেতে খেতে, আর তারপর তাড়াতাড়ি গাছে চড়ে যা দরকার তাই-ই করলো। এ কাজটি তার এতোই মনে ধরলো যে এমন কি প্রয়োজন না থাকলেও সে গাছে উঠতো। তবে তা বেশি দিন চলে নি।

কাপুশাকে আমরা কি আর খামখাই বুদ্ধিমতী বলি! শিগ্গিরই সে বুঝলো, মৌচাকে মধু থাকে একমাত্র তখনই, যখন আমি গাছে উঠি। এই আবিষ্কারের পর থেকে সে আমাকে রাখতো চোখে চোখে। চুপি চুপি গাছে ওঠার কোনো উপায়ই নেই। আমাকে দেখলেই কাপুশা ছুটে আসতো। আমি গাছের দিকে গেলে সেও আমার পেছনে পেছনে। মোটাসোটা গোলগাল, কিন্তু দৌড়োয় তাড়াতাড়ি, পালাবার সাধ্যি নেই। পা ধরতে পারলেই হলো, শুরু করে টানাটানি, চিৎকার, আর মধু যদি না দাও — মারবে এক কামড়। একবার কাপুশা কেড়ে নিলো পুরো এক বয়াম মধু, চোখ ফেরাতে না ফেরাতেই সব সাবাড়।

'না, — ভাবলাম আমি, — এভাবে কাজ হবে না, তোকে বরং এবার থেকে খাঁচায় পুরে রাখবো, সব তৈরী হলেই দেবো বেরোতে।' তাই-ই করলাম। কাপুশার তা পছন্দ হলো না। তখন সে কী যে না করলো! চেঁচালো, খাঁচার জাল ছিঁড়লো, পরে থাবা জোড় করে অনুনয় জানালো তাকে ছেড়ে দিতে। এতে হাসি পেলো।

এমন 'অভিনেত্রী' দেখে প্রযোজক তো খুশিতে একেবারে ডগমগ। কাপুশার ছবি তুলতে তাঁর আর তর সইছিল না।

যাক শেষ পর্যন্ত ছবি তোলার বহুপ্রত্যাশিত দিনটি এলো। সকাল থেকেই রোদ উঠেছে সেদিন, আমরা সবাই ভীষণ ব্যস্ত, তাড়াহুড়ো করছি, তৈরী হচ্ছি। মৌচাকের ভেতরে মৌমাছিও রাখা হয়েছে। প্রযোজক আবার দেখেন সবকিছু ঠিক আছে কিনা। এমন সময় কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ কী হলো জানো? কাপুশা থাবা দিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে পড়লো বেরিয়ে।

তখন যে কী হুলুস্থুল শুরু হলো ভাবাও যায় না! সবাই ছুটলো 'অভিনেত্রী'কে আটকাতে। প্রত্যেকেই ধরতে চেষ্টা করলো তাকে। কিন্তু নিপুণতার সঙ্গে লোকের হাত এড়িয়ে সে উঠে গেল গাছে। তাড়াহুড়োতে দেখতেই পেলো না তার চারিদিকে কত মৌমাছি উড়ছে।

আগের মতো এবারও কাপুশা থাবা গলালো মৌচাকে। ব্যস আর যায় কোথায়, ভন্ ভন্ ভন্ — কালো মৌমাছির ঝাঁক বেরিয়ে এসে তাকে ঘিরে ফেললো। প্রথমে সে চেষ্টা করলো মৌমাছিদের সঙ্গে লড়তে। থাবা দিয়ে মারে তাদের, ঢাকে মুখ। কিন্তু মৌমাছিরা ঢুকে তার নাকে কানে চোখে, লোমের মধ্যে লুকিয়ে এমন কামড় দিলো যে কাপুশা এমন কি মধুর কথা ভুলেই গেল। ডিগবাজি খেয়ে নামলো সে গাছ থেকে, মাটিতে দিলো গড়াগড়ি, চেঁচালো, তারপর উঠে দেয় ছুট — একেবারে সোজা খাঁচায়।

এক কথায়, যাকিছু দরকার সে করলো, কিন্তু ছবি তোলা গেল না। আবার করে গাছে উঠানোর চেষ্টাও হলো ব্যর্থ। মধু দেখিয়েও কাজ হলো না। পরদিন সকালে দেখা গেল কাপুশার সারা গা ফুলা, অসুখ করেছে, কিছুই খেলো না।

এইভাবেই শেষ হলো 'অভিনেত্রী' কাপুশার মধু চুরির ভূমিকা।

১৩ নং বাসা

প্রথমে টিয়েরা থাকতো বড়ো, খোলামেলা খাঁচায়। তারা ছিল অনেক এবং হরেক রঙের — নীল, সবুজ, হলদে...

সারাদিন তারা আনন্দে করে কিচিরমিচির, উড়ে বেড়ায় খাঁচায়। রঙবেরঙের টিয়েরা যখন দাঁড়গুলোতে বসে থাকে, তাদের দেখলে মনে হয় যে এটা রঙবেরঙের জীবন্ত পাতায় সাজানো একটি গাছ। কখনো পাতাগুলো এক জায়গা থেকে উড়ে যায় আরেক জায়গায়, কখনো ভয় পেয়ে এলোমেলোভাবে উঠে উপরে এবং ঠিক তেমনি এলোমেলোভাবে আবার বসে পড়ে ডালে ডালে।

ফেব্রুয়ারির শুরু তখন। পাখির ঝাঁক জোড়ায় জোড়ায় ভাঙ্গতে লাগলো। নিউশা মাসি — ইনিই পাখিদের দেখাশোনা করেন — মোটা, শক্ত সুতোর একটি জাল নিয়ে রঙ মাফিক টিয়েদের বসাতে লাগেন। কাজটি খুব কঠিন ও ভীষণ পরিশ্রমের। পাখিকে ধরা চাই সাবধানে, একটি পালকও যাতে নষ্ট না হয়, দেখা চাই কী তার রঙ, যদি সবুজ হয়, তো তাকে ছাড়া দরকার সবুজ টিয়েদের কাছে, হলদে হলে — হলদেগুলোর কাছে, আর নীল টিয়েকে — নীলদের দলে।

নিউশা মাসি একাজ করে আসছেন একনাগাড়ে বহু বছর। তিনি ছাড়া আর কেউ এতো ভালো জাল চালাতে পারে না। তাঁর হাতে পাখির মোটেই চোট লাগে না বা একটি পালকও ভাঙ্গে না।

কাজ শেষ করে নিউশা মাসি নীল টিয়েদের খাঁচায় হঠাৎ দেখেন একটি কুৎসিত ফিকে-নীল মাদী পাখিকে।

— কেন যে আমি এই বিশ্রী পাখিটিকে আগে দেখতে পাই নি? — চিন্তা হয় নিউশা মাসির।

পাখিটিকে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ধরে অন্য খাঁচায় রাখা যায়, তবে নিউশা মাসি আরেকবার টিয়েদের জালাতে চান না।

— আগে যখন দেখি নি, থাকুক আর কি, — নিজেকেই বলেন তিনি।

তারপর নিউশা মাসি খাঁচায় কাঠের ছোটো ছোটো বাসা ঝোলাতে আরম্ভ করেন। বাসা অনেক। প্রতি খাঁচায় যত জোড়া পাখি ঠিক ততটাই।

সবুজ টিয়েদের খাঁচায় চোয়ান্নটি বাসা ঝুলিয়েছেন নিউশা মাসি। এর মানে এখানে আছে চোয়ান্ন জোড়া পাখি আর প্রতি জোড়ার জন্যে দরকার আলাদা এক একটি বাসা, তার উপর আবার নম্বরও লাগানো চাই যাতে সহজে জানা যায় কোন্ বাসায় কী হচ্ছে।

নিউশা মাসি কাজ শেষ করতে না করতেই পাখিরা তাড়াতাড়ি বাসা বাছতে শুরু করে দেয়। কয়েক দিনের মধ্যে সবগুলো বাসাই ভরে গেল পাখিতে, শুধু ১৩ নং বাসাটাই কেন জানি খালি পড়ে রয়।

নিউশা মাসি কিছুতেই বুঝতে পারেন না কেন এমন হলো। প্রথমে তাঁর মনে হয়, বাসাটি হয়তো আরামের নয় কিংবা তাতে ঢোকার ফোকরটি খুব ছোটো। নিউশা মাসি মই বেয়ে উঠেন দেখতে কী ব্যাপার। কিন্তু না তো, ফোকরটি বিলকুল ঠিক, গোল, মাপে কোনো গণ্ডগোল নেই, ভেতরের গদিটিও একেবারে চমৎকার। এক কথায়, সবকিছুই ঠিক আছে, তবে কেন যেন পাখি নেই।

পরিচারিকা বাসাটির দিকে খেয়াল রাখেন, কেন এখানে পাখি থাকে না তিনি জানতে চান।

পয়লা-পয়লা কিছুই চোখে পড়ে নি নিউশা মাসির। পরে একদিন দেখেন যে একটি সবুজ টিয়ে হামেশা আলাদা আলাদা থাকে। অন্যান্য টিয়েদের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। পাখিরা অনেক আগেই জোড়ায় জোড়ায় ভেঙ্গে গেছে, আর সে এখনো একা। পালকগুলো তার এলোমেলো, দেখায় তাকে মনমরা, খায় কম।

নিউশা মাসি ভাবলেন টিয়েটির অসুখ করেছে। আসলে কিন্তু অসুখের জন্যে সে এরকম হয় নি। একবার টিয়েটি মনমরা হয়ে বসে ছিল তার দাঁড়ে, তখন খাঁচার অন্য পাশে তার কাছে এসে বসে সেই কুৎসিত নীল মাদীটি, যেটি নিউশা মাসির মোটেই ভালো লাগে নি।

মাদীটাকে দেখে সবুজ টিয়ে খুশিতে একেবারে নেচে উঠে, চেষ্টা করে খাঁচার ফাঁক দিয়ে তার দিকে মাথাটা গলাতে।

তার মানে এই মাদীটাই হচ্ছে টিয়েটির অসুখের জন্যে দোষী! সম্ভবত একই খাঁচায় থাকার সময় তাদের দোস্তি হয়, আর এখন ছাড়াছাড়ি হয়ে তাদের দিন কাটছে খুবই কষ্টে।

পাখিটির জন্যে দুঃখ হয় নিউশা মাসির। তিনি তখন কুৎসিত সেই ফিকে-নীল মাদীটাকে ধরে সবুজ টিয়ের খাঁচায় ছেড়ে দেন। এ কাজ অবশ্য চিড়িয়াখানার নিয়মের বিরুদ্ধে।

পরদিন সকালে দেখা যায় ১৩ নং বাসাটি আর খালি নেই। বাসার কাছে দাঁড়ে বসে দু'টি টিয়ে: একটি সবুজ, অন্যটি ফিকে-নীল। তারা মনের আনন্দে গান গায়, সযত্নে পরিষ্কার করে পরস্পরের পালক। দিন কয়েক পরে মাদীটা ছোটো ডিম পাড়ে ও পরে ওগুলোতে তা দিতে বসে।

রাতদিন সে ডিমে তা দেয়। এমন কি খাবারের জন্যেও বেরোয় না কোথাও। সখিকে খাওয়ায় সবুজ টিয়ে, একেবারে মা যেমন বাছাকে ঠোঁট দিয়ে খাওয়ায়, ঠিক তেমনি। যদি মাদীটার উড়বার ইচ্ছে হয় তো সে নিজে তার জায়গায় বসে ডিমে তা দিতে থাকে।

এভাবে কাটে সতেরো দিন। সব পাখিরই ডিম ফুটে বাচ্চা হয়েছে, বাচ্চা হয়েছে ফিকে-নীল মাদী টিয়েটিরও। বাচ্চারা শুয়ে আছে গদিতে, ছোটো ছোটো, গায়ে শাদা লোম, ঠোঁটগুলো বিরাট, আর বাপ-মা দুজনে সারাদিন তাদের জন্যে আনে আধার।

নিউশা মাসি টিয়েদের এখন খেতে দেন বেশির ভাগ নরম খাবার। সেদ্ধ ডিম কুচি কুচি করে কেটে জাউয়ে মিশিয়ে দুধে-ভেজা রুটির সঙ্গে খাওয়ান তাদের। তিনি এ সমস্তকিছু করেন এজন্যে যাতে বাচ্চাদের খাওয়াতে পাখিদের বেগ পেতে না হয়।

তাছাড়া নিউশা মাসি আজকাল কাজেও আসেন বেশ আগে। এসেই তিনি তাঁর শাদা পোশাক পরে তাড়াতাড়ি খাঁচাগুলো দেখতে যান: সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা জানা চাই তো। তারপর সবকিছু সাফ করেন, খাবার বানান, পাখিদের খাওয়ান।

একদিন টিয়েদের খাঁচায় নিউশা মাসি হঠাৎ দেখতে পান ক'টি বাচ্চাকে।

তারা ১৩ নং বাসাটির নিচে মেঝেতে পড়ে আছে। ঠিক সেই বাসাটিরই নিচে, যেটি অনেক দিন খালি ছিল ও পরে যেটিতে বসত পেতেছিল কুৎসিত নীল মাদী টিয়েটি।

— দাঁড়া পোড়ারমুখী! বাচ্চাগুলোকে ফেলে দিয়ে কী নিশ্চিন্তেই না বসে আছে! — রাগে চেঁচিয়ে উঠে নিউশা মাসি তাড়া করেন বাসার কাছে বসে থাকা পাখিটিকে।

তারপর বাচ্চাক'টিকে সাবধানে তুলে রাখেন বাসায়।

— আবার ফেলে দেখ, মজাটা টের পাবি!— ধমকান তিনি মাদীটাকে।

এরপর ডায়েরি নিয়ে যা ঘটেছে তার সবকিছুই লিখে ফেলেন বিশদভাবে।

এই ঘটনার পর থেকে ১৩ নং বাসাটির দিকে নিউশা মাসির কড়া নজর। কে জানে, আবারো তো মাদীটা বাচ্চাগুলোকে ফেলে দিতে পারে।

তবে দেখা গেল পরিচারিকার ভয় মিছে। দুই টিয়েই বাচ্চাদের এমন ভালো আদর-যত্ন করে যেন কিছুই হয় নি। বিশেষ করে মাদীটাই খাটে বেশি। সকাল থেকে সন্ধে অবধি সে শুধু আধারই আনে। সারাদিন বাচ্চাদেরই খাওয়ায়, নিজে খাওয়ার সময় পায় না কোনো কোনো দিন।

— ইশ্, কী যত্ন! নিজে শুকিয়ে না মরলেই হয়, — চিন্তায় পড়েন নিউশা মাসি। নীল মাদী পাখিটার উপর এখনো তাঁর রাগ আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও খাবারের টেবিলটা বাসার কাছে টেনে দেন যাতে দূরত্ব কিছুটা কমে যায়।

নিউশা মাসি খুব ভালোবাসেন তাঁর পাখাদার বন্ধুদের, তাদের জন্যে তিনি খুব ভাবেন। বিশেষ করে পাখিদের বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ার দিন এলে। আর ভাবনা হবেই তো: সেদিন যে তিনি তাঁর কাজের ফলাফল দেখেন। তিনি পাখিদের কেমন ভালো দেখাশোনা করেছেন তার উপরই তো নির্ভর করে বাচ্চাদের স্বাস্থ্য। তাই পঁয়ত্রিশ দিনের দিন, যখন ১৩ নং বাসাটি থেকে পাখিদের বেরিয়ে আসার কথা, নিউশা মাসি ভীষণ চিন্তিত হন। সকাল থেকে খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন কি দুপুরে খেতেও যান নি, আর বাচ্চাদের বেরোবার কোনো নামগন্ধই নেই।

— তাহলে সত্যিই কি কমজোর?— দুর্ভাবনা হয় নিউশা মাসির।

আর অপেক্ষা করতে না পেরে তিনি খাঁচায় ঢুকে দেখতে চান কী হচ্ছে বাসাটিতে। এমন সময় হঠাৎ বেরিয়ে আসে একটি বাচ্চা।

বাসাটি থেকে ফড়ফড় করে উড়ে এসে বসে সে বাপ-মা'র কাছে দাঁড়ে। তার পেছন পেছন অন্যান্য বাচ্চারাও আসে। 'দুই... তিন... — খাতায় টুকে রাখেন নিউশা মাসি। — আরো চারটি... — আগের সংখ্যাটি ঠিক করে নেন। — কী আশ্চর্য, সাতটি বাচ্চা! এতোগুলোকে খাওয়ানো কি খেলার কথা!'

ঠিক তখনই কিন্তু আরো কয়েকটি বাচ্চা বেরুলো বাসা থেকে। 'আট... দশ... এগারো!'— তাড়াতাড়ি গুনেন নিউশা মাসি। এগারোটি!.. অবাক হন। এতো বছরের কাজে তিনি কখনো এক পাখির এতোগুলো বাচ্চা দেখেন নি।

শেষ সংখ্যাটি না লিখেই তিনি ছুটেন পরিচালিকাকে ডাকতে।

নিউশা মাসি পরিচালিকার সঙ্গে ফিরে এসে দেখেন, দাঁড়ের উপর এগারোটি নয়, বারোটি পাখির ছানা। সবাই তারা বসে বসে খুব কিচিরমিচির করছে।

এতো বিরাট পরিবার দেখে পরিচালিকাও অবাক।

— আপনি ভুল করেন নি তো, নিউশা মাসি? — জিজ্ঞেস করেন তিনি। — হয়তো কিছুটা বাচ্চা অন্য বাসা থেকে, আর আপনি সবগুলোকে গুলিয়ে ফেলেছেন?

— কী যে বলেন, আন্না ভাসিলিয়েভনা!— রাগ করেন নিউশা মাসি।— আমি যে নিজের চোখে দেখেছি কোন্ ফোকর দিয়ে বাচ্চারা বেরিয়েছে। এই বাসাটির দিকে আমার খুব নজরও রয়েছে। সবকিছু লিখে রেখেছি: কীভাবে খাইয়েছি, কীভাবে মা বাচ্চাদের ফেলে দিয়েছিল।

— বাচ্চাদের ফেলে দিয়েছিল?— জিজ্ঞেস করেন আন্না ভাসিলিয়েভনা।— অদ্ভুত। আচ্ছা বেশ, ডায়েরিখানা দেখান তো। এক পাখির এতোগুলো বাচ্চা হতেই পারে না।

নিউশা মাসি মোটা একখানা খাতা এনে দেন পরিচালিকাকে।

আন্না ভাসিলিয়েভনা ডায়েরি খুলে মন দিয়ে দেখলেন অনেকক্ষণ। সে জায়গাটি তিনি পড়লেন যেখানে লেখা আছে কীভাবে নিউশা মাসি ক'টি ছানাকে মেঝেতে দেখতে পান ও কীভাবে তাদের তিনি বাসায় তুলে রাখেন।

— বাচ্চারা কোন্ জায়গায় পড়ে ছিল?— জিজ্ঞেস করেন আন্না ভাসিলিয়েভনা।

— এই যে এখানে, বাসাটির ঠিক নিচে, — দেখিয়ে দেন নিউশা মাসি।— এখান থেকেই আমি তাদের তুলে নিই।

আন্না ভাসিলিয়েভনা এমন কি নুইয়ে পড়লেন সেই জায়গাটির উপর যেন এখনো সেখানে ছানারা পড়ে আছে। তারপর সোজা হয়ে নিজের ঠিক সামনে দেখেন ১২ নং বাসাটি, আর ১৩ নং বাসা ঝুলছে একটু দূরে।

— হুঁ, এবার বুঝলাম, — হেসে ফেলেন আন্না ভাসিলিয়েভনা, — বাচ্চারা পড়েছিল ১২ নং বাসা থেকে, আর আপনি ওদের তুলে রেখেছেন ১৩ নম্বরে।

নিউশা মাসি তো একেবারে থ। পরে ছুটে গিয়ে মই এনে তাড়াতাড়ি উঠে ১২ নং বাসাটিতে উঁকি মারেন। হ্যাঁ, তাই: বাসা খালি। এটা থেকেই বাপ-মা বাচ্চাদের ফেলে দিয়েছিল! আর আমাদের নিউশা মাসি ওদের বেশ ঢুকিয়ে দেন পাশের বাসাটিতে, তাছাড়া কী গালিটাই না দিয়েছিলেন ছোট্ট নীল মাদী পাখিটাকে।

নিউশা মাসি নিজের অজান্তেই হাত বাড়িয়ে দেন পাখিটাকে একটু আদর করার জন্যে, কিন্তু সে তা বুঝলো না। সে ভয় পেয়ে ছুটোছুটি করে তার বারোটি বাচ্চার কাছে, চেষ্টা করে তাদের আগলে রাখতে। নিউশা মাসি খাঁচা থেকে বেরিয়ে যেতেই সে শান্ত হয়। সে বসে তার বাচ্চাদের পাশে। ছ'টি বাচ্চা সবুজ, আর ছ'টি — নীল। এখন এই কুৎসিত পাখিটি নিউশা মাসির কাছে খুব সুন্দর ঠেকলো। পরিচালিকার দিকে ফিরে পাখিটিকে দেখিয়ে তিনি আনন্দে বলে উঠেন:

— আমি আগে কেন বুঝতে পারি নি সে এতো সুন্দর!

আন্না ভাসিলিয়েভনাও নিউশা মাসির সঙ্গে একমত।

বেলা

১

একবার চিড়িয়াখানায় একদল বাঁদর নিয়ে আসা হলো। তাদের একেকটি একেকরকম: কোনোটি খুব ছটফটে, কোনোটির লেজ লম্বা, কোনোটি দেখতে কুকুরের মতো। দলে বেরা আর বেলা নামে দু'টি শিম্পাঞ্জীও ছিল।

চিড়িয়াখানায় আগে যেসব শিম্পাঞ্জী ছিল বেরা দেখতে অনেকটা তাদেরই মতো। তবে বেলা কিন্তু মোটেই সেরকম নয় — সে মোটা-তাগড়া, কাঁধগুলো তার চওড়া ও শক্তিশালী, খুব তীক্ষ্ন দৃষ্টি ছোটো বাদামী চোখে। আপনা থেকেই সবার নজর গিয়ে পড়তো তার উপর।

খাঁচায় ছেড়ে দেবার পর বেলা বেশ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলো। তারপর গেল দোলনাটির দিকে। লম্বা শক্তিশালী হাত দিয়ে তা ধরে কিছুক্ষণ দোলার পর একলাফে চলে গেল আরেকটি দোলনায় — সার্কাসে যেমন হয় ঠিক তেমনি। কয়েক বার এরকম লাফালাফির পর বেলা মেঝেতে নেমে আস্তে আস্তে শিকগুলোর কাছে এলো, দেখতে লাগলো পরিচারিকা কী করছে।

আশেপাশে কী হচ্ছে তা দেখতে বেলার খুবই ভালো লাগতো। চাবিগুলোর দিকে তার নজর ছিল বেশি। পরিচারিকা যেই চাবিছোড়ান টেবিলের উপর রাখতো অমনি বেলা চেষ্টা করতো তা নিয়ে নিতে। এটা টের পেয়ে মেয়েটি তার চাবিছোড়ান একটু দূরেই রাখতো যাতে বাঁদরটা নাগাল না পায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এক দুর্ঘটনা ঘটলো।

একদিন মেয়েটি রান্নাঘরে গেল খাবার আনতে। দরজাটি বন্ধ করার সময় ঝাড়ুটি কী করে পড়ে গেল সে তা দেখতে পায় নি। ঝাড়ু মেঝেতে পড়ার আগেই বেলা নিমেষে শিকের কাছে এসে হাজির।

লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে ঝাড়ুটি তুলে নিতে বেলার বেশিক্ষণ লাগলো না। পরে ওটা দিয়ে সে চাবিগুলো টেনে এনে খাঁচা খুলতে শুরু করে।

দরজার বাইরের দিকে যখন তালা ঝুলছে তখন ভেতর থেকে তা খোলা খুব একটা সহজ নয়, তবে আমাদের বেলাকে একাজটি করতে মোটেই বেগ পেতে হয় নি।

খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়েই বেলা প্রথমে গেল রান্নাঘরে। ডেকচি খুলে খুলে সব খাবার চেকে দেখলো; যাকিছু তার ভালো লাগলো না তা সঙ্গে সঙ্গেই উপুড় করে ফেলে দিলো, আর যা পছন্দ হলো — বেছে বেছে খেলো মনভরে। পেট ভরে গেলে বেলা রান্নাঘরের দরজা খুলে মেজাজে বেরিয়ে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গেই বাঁদরটি সবার চোখে পড়লো। রান্নাঘর থেকে একটু দূরে যেতে-না-যেতেই লোকে তাকে ঘিরে ফেললো, তারপর ছুটে এলেন চিড়িয়াখানার ম্যানেজার, পরিচারক এবং আরো অনেকে।

চারিদিকে এতোগুলো লোক দেখে বেলার হাবভাব গেল একবারে বদলে। ভয়ে তার কাঁধের আর গলার লোম খাড়া। দাঁত দেখাতে লাগলো, শুরু হলো বিকট চেঁচামেচি, লাফালাফি আর আতঙ্ক। তখন একটি বড়ো জাল আনা হলো।

কয়েক জন লোক জাল দিয়ে ধরতে চাইলো পলাতকাকে। কিন্তু বেলা হঠাৎ লোকগুলোর পায়ের নিচ দিয়ে গলে বেরিয়ে গেল। তারপর চটাপট উঠে পড়লো একটি গাছে।

চকলেট, আপেল আর কলা দেখিয়ে বেলাকে ডাকাডাকি করে কোনো লাভ হলো না। এসব মজার মজার খাবারের দিকে সে এমন কি তাকালোই না। গাছেই বসে রইলো, ও-জায়গা ছাড়ার কোনো ইচ্ছে তার আছে বলে মনে হলো না।

ডাকতে হলো দমকলের লোককে। এরূপ অদ্ভুত অভিজ্ঞতা তাদের সম্ভবত এই প্রথম।

গাড়ী এলো। তাড়াতাড়ি আস্তিন গুটিয়ে ফেললো দমকলের লোকেরা, তারপর একজন লোক জলের একটি মোটা নল বাঁদরটির দিকে তুলে ধরলো। ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা লাগলো বেলার গায়ে। সে চেঁচিয়ে উঠলো, হাত দিয়ে মাথা ঢেকে তাড়াতাড়ি নামতে লাগলো গাছ থেকে।

সবাই ভাবলো, এবার বেলা নিশ্চয়ই নিজের খাঁচায় ফিরে যাবে, কিন্তু বেলা ঠিক তা করলো না। সম্ভবত গাছে থাকতেই বেলা অন্য উপায় ভেবে রেখেছিল। খাঁচায় ঢুকতে ঢুকতে হঠাৎ সে মোড় নিয়ে বেড়া ডিঙ্গিয়ে পয়োনালী বেয়ে উঠে পড়লো পাশের পাঁচতলা স্কুলের ছাদে। কেউ তার পথ আটকে দাঁড়াবার ফুরসৎই পেলো না।

ছাদে উঠে বেলা নিশ্চিন্ত। চালের ধার দিয়ে মহানন্দে বেড়াতে বেড়াতে মজা করে দেখছিল নিচে কী হচ্ছে। এবার বেলাকে ধরা আগের চেয়ে কঠিন, এবং সেও নিশ্চয়ই তা খুব ভালো বুঝতে পেরেছিল। বাস্তবিকই পাঁচতলা বাড়ীর ছাদে বিশালাকার বাঁদরটিকে ধরা শুধু কঠিনই নয়, বিপজ্জনকও।

আমাদের একজন কর্মী তাকে নামাতে উঠলো ছাদে। লোকটি চিড়িয়াখানায় অনেক দিন। জন্তুজানোয়ারের স্বভাব-চরিত্র তার খুবই ভালো জানা। বাঁদরটিকে মিছিমিছি না ক্ষেপানোর জন্যে সে তার সহকারীদের চিলেকোঠায় ঢুকে যেতে বললো। তারপর সাহস করে সে গেল বেলার কাছে। এই লোকটি আগে বাঁদরদের দেখাশোনা করতো, তাই সে ভেবেছিল যে, বেলা তাকে চিনতে পারবে ও ছুঁবে না। এবং সে ঠিকই ভেবেছিল। লোকটিকে চিনতে বেলার দেরী হলো না। সোহাগের ডাক ডেকে বাঁদরটি তার কাছে গিয়ে হাত ধরে তাকে টানতে লাগলো পয়োনালীর দিকে, যেন তারই সঙ্গে ওটা বেয়ে নামার জন্যে অনুরোধ করছে আর কি। মনে হয়, ততক্ষণে ছাদে থাকার সখ তার মিটে গেছে, তাছাড়া তার সারা শরীরও আবার ভিজে জবজবে, ঠাণ্ডায় বেশ কাঁপছিল।

লোকটি বেলাকে নিজের কোটটি পরিয়ে দিলো যাতে তার সর্দি না হয়। কোটের পকেটে যাকিছু ছিল বেলা সঙ্গে সঙ্গে সব বের করে ফেললো। তবে কোট

খুললো না। তারপর আবার সে লোকটির হাত ধরে বসলো, এবার তাকে সে কোনোমতেই হাতছাড়া করবে না।

বার কয়েক লোকগুলো চিলেকোঠা থেকে বেরিয়ে এসে বাঁদরকে ঘিরে ফেলতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তাদের একটু দেখতেই বেলা ভীষণ ক্ষেপে উঠে। তৎক্ষণাৎ চলে যায় চালের একেবারে ধারে এবং লোকটিকেও টানে নিজের সাথে সাথে।

মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল। তবে পাঁচতলা বাড়ীর ছাদে তার সঙ্গে সারা রাত তো আর কাটানো যায় না!

অগত্যা ঝুঁকিই নিতে হলো। বাড়ীর দেয়ালের গায়ে গায়ে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেওয়া হলো দমকলবাহিনীর বিরাট লম্বা সিঁড়ি। লোকটি এই সিঁড়ি বেয়েই নামবে ঠিক করলো। বাঁদরের মতো সঙ্গিনীকে নিয়ে এভাবে নামা খুবই বিপজ্জনক। কেউই জানতো না, বেলা হঠাৎ কখন কী করে বসবে। যেকোন মুহূর্তে সে লোকটিকে ধাক্কা দিতে পারে, আর এতো উঁচু থেকে পড়ে যাওয়াটা মোটেই শক্ত কিছু নয়।

যেই লোকটি সিঁড়িতে পা ফেললো অমনি সবাই আতঙ্কে থ। কেউ একবার চেঁচিয়ে উঠলো, কিন্তু চুপ করে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। কী হয় বলা তো যায় না, তাই নিচে তাড়াতাড়ি একটি জাল মেলে ধরা হলো। শত শত লোক মহা আতঙ্কে দেখছিল উপরে কী হচ্ছে।

বাঁদরের হাত ধরে লোকটি ছাদের একেবারে ধারে এলো। সাবধানে পা রাখলো সিঁড়িতে। তারপর নামলো এক ধাপ। বেলা তার হাত ছেড়ে হঠাৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ আরম্ভ করলো। সবাই উঠলো শিউরে। লোকটি থেমে গিয়ে আদর করে ডাকলো বাঁদরকে। বেলা আবার শান্ত হয়ে বাধ্যের মতো তার পিছু পিছু নামতে লাগলো।

স্কুলটির চারতলা বরাবর পেঁাছার পর দেখা গেল একটি জানলা খোলা। লোকটি সুযোগ হারালো না, সে সিঁড়ি থেকে জানলার পৈঠায় গিয়ে উঠলো। ঢুকলো ক্লাসে। তার পিছু পিছু চতুষ্পদী সঙ্গিনীও। ভাগ্যিস ক্লাসে কেউ ছিল না, — তখন টিফিনের ছুটি।

তাড়াতাড়ি দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে লোকটি হুঁশিয়ার করে দিলো কেউ যেন ক্লাসে না ঢুকে। নিজে থাকলো বেলার সঙ্গে।

বড়ো খোলামেলা কামরায় চেয়ার টেবিল ডেস্কের মধ্যে বেলার খুব ভালোই লাগলো। ডেস্কের ঢাকনা খুলে বের করলো ব্যাগ, কাগজকলম, বইপত্তর... লোকটি বেলাকে থামাতে চাইলো, কিন্তু সে ডেস্ক থেকে ডেস্কে করতে লাগলো ছুটোছুটি, শুরু হলো ঢাকনা বন্ধ হওয়ার ধড়াম ধড়াম শব্দ। বেলা এমন চেঁচামেচি আরম্ভ করলো যে লোকটি তাকে ছুঁলোই না।
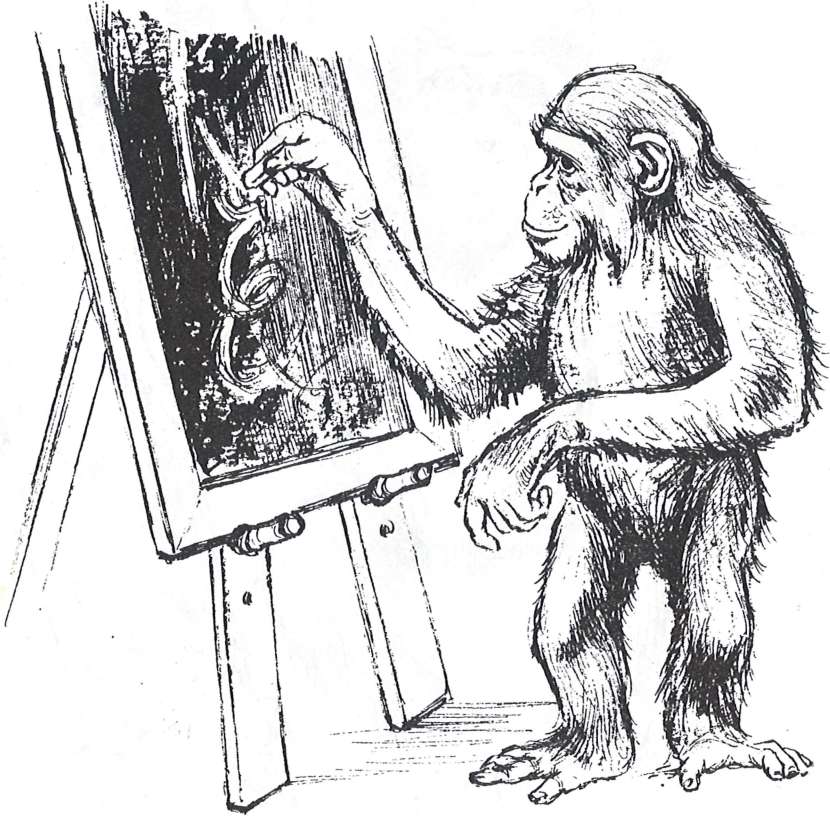
হঠাৎ বাঁদরটি খুঁজে পেলো একটুকরো চক। তা না হলে সে ক্লাসের শ্রাদ্ধ করে ছাড়তো। সম্ভবত বেলা জানতো চক দিয়ে কী হয়, তাই সে ওটা দিয়ে হিজিবিজি কী সব আঁকতে লাগলো।

সে 'আঁকায়' মজে গেলে একটি খাঁচা নিয়ে আসা হলো। বেলা চেঁচিয়ে উঠলো, পেছনে সরে গেল, কিন্তু পালাবার কোনো উপায় নেই দেখে আপনা থেকেই চুপচাপ খাঁচায় ঢুকলো।

তার আধঘণ্টা পরে দেখা গেল পলাতকা নিজের খাঁচায় বসে তৃপ্তির সঙ্গে আঙ্গুর খাচ্ছে।

সিংহের বুদ্ধি

আমাদের চিড়িয়াখানায় বহু বছর বেঁচে ছিল এক বুড়ো সিংহ। তার নাম — মেনেলিক। জোয়ান বয়সেই তাকে বন থেকে ধরে চিড়িয়াখানায় আনা হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে ছিল অতি নিরীহ জন্তু। অল্পদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলো, যখন তার থাকার জায়গাটি পরিষ্কার করা হয়, তখন তাকে অপর একটি খাঁচায় চলে যাওয়া উচিত। তাই পরিচারক যেই দরজা খুলতো, কোন ডাকচিৎকারের অপেক্ষা না করে সে সেখানে চলে যেতো। খাবার পর মেনেলিক পরিচারককে খাঁচা থেকে হাড়ের টুকরো তুলে নিতে দিতো, অন্যান্য সিংহের মতো ওগুলো ধরে রাখার চেষ্টা করতো না।

পরিচারক মেনেলিককে খুব ভালোবাসতো।

— চমৎকার জীব, ভারি দেমাকে, — প্রায়ই বলতো সে। — তাকে নিয়ে ঝামেলাও কম। যেই দরজা খোলা হয় অমনি সে অন্য খাঁচায় চলে যায়। এবং এমন কি খাঁচার সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও কাউকে ছুঁয় না।

এবং তা সত্যিই, অন্য কোনো জানোয়ারের একটু কাছে গেলেই সেটা সঙ্গে সঙ্গে থাবা বের করে দেয়, চেষ্টা করে ধরতে, কিন্তু মেনেলিক কখনো তা করে নি। খাঁচা সাফ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতো।

মেনেলিকের দৃষ্টি ছিল শান্ত, আত্মবিশ্বাসে ভরা। আর ঘন দীর্ঘ কেশরযুক্ত সুউন্নত মাথা তার চেহারাকে করে তুলেছিল মহিমামণ্ডিত। মুখের পাকা গোঁফ আর ইতিমধ্যে হলদে-হয়ে-যাওয়া দাঁতও তাকে মানিয়েছিল খুব। তবে বুড়ো হওয়া সত্ত্বেও মেনেলিকের স্বাস্থ্য ছিল অতি চমৎকার। কখনো তার অসুখ করতো না। সর্বদাই তৃপ্তির সঙ্গে খেতো পুরো আট কেজি মাংস, — এটাই ছিল তার নির্ধারিত আহার। খেতো সে খুবই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে, — তাড়াহুড়ো না করে, আর পরে বেশ যত্ন সহকারে হাড়গুলো চেঁছে খেয়ে একেবারে শাদা করে ফেলতো, মনে হতো যেন ওগুলোর উপর এমন কি কখনো মাংস ছিলই না।

একবার একটি ঘটনা ঘটলো। মেনেলিক সবটা মাংস খেলো না। কই, এরকম তো আর কখনো হয় নি। পরিচারক সঙ্গে সঙ্গে গেল ডাক্তার ডাকতে।

ডাক্তার তাঁর বিপজ্জনক রোগীদের যে শুধু ভালোভাবে জানতেন তাই নয়, তারা যেসব রোগে ভুগতো সেগুলোর লক্ষণও তাঁর জানা ছিল। আর মেনেলিকের লক্ষণ ছিল এইগুলো: মাংস যা দেওয়া হতো তার পুরোটা খেতো না, খাবারের পর বিশ্রাম না করে শুয়ে অস্বস্তিতে এপাশে ওপাশে গড়াগড়ি দিতো, দাঁতের ফাঁক দিয়ে পড়তো লালা।

কিছুক্ষণ সিংহটাকে দেখার পর ডাক্তার পরিচারকের দিকে ফিরে বললেন:

— মেনেলিকের কৃমি হয়েছে। ওগুলোকে বের করতে হবে। কাল থেকেই চিকিৎসা শুরু করবো।

পরের দিন জন্তুদের খাওয়ানোর সময় ডাক্তার এলেন। শাদা স্মক পরে তিনি সোজা গেলেন খাবার তৈরীর ঘরে। ওখানে বিরাট এক গামলায় ছিল মাংস। ডাক্তার তা থেকে ছোট একটি টুকরো কেটে নিয়ে তাতে ওষুধ ভরে নিজেই সিংহকে দিলেন।

মেনেলিক ইতিমধ্যে সুস্থ বোধ করছিল। সে ছিল খুব ক্ষুধার্ত। ওষুধ দেওয়া মাংসের টুকরোটি গিলে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে। তবে কিছু পরে যখন ওষুধের প্রতিক্রিয়া শুরু হলো, মেনেলিকের খুব বমি হতে লাগলো। অনেকক্ষণ সে কষ্ট করলো, তবে এই উদ্দেশ্যেই তো তাকে ওষুধ দেওয়া হয়েছিল।

কয়েক দিন পরে আবার মেনেলিককে ওষুধ খাওয়ানোর কথা ছিল। শাদা স্মক পরা সেই ডাক্তার এলেন। এক টুকরো মাংস নিয়ে তাতে ওষুধ ভরে দিলেন মেনেলিককে। কিন্তু তার খিদে থাকা সত্ত্বেও এবার আর ডাক্তারের হাত থেকে মাংস সে নিতে চাইলো না।

তখন ডাক্তার অন্য এক উপায় ঠিক করলেন। পুরো মাংসটাতেই তিনি ওষুধ ভরলেন। পরিচারককে বললেন সেটা সিংহকে দিতে। কিন্তু মেনেলিক পরিচারকের কাছ থেকেও মাংস নিলো না, — তা দেখে ডাক্তার তো অবাক! সে এমন কি মাংস ছুঁলোই না, যদিও ওষুধ ছিল গন্ধহীন এবং এতো ভালো করে লুকনো যে সিংহ তা টেরই পায় নি।

পরের দিন ডাক্তার আবার মেনেলিককে দেখতে এলেন। তাকে দেখে মনে হলো সে সম্পূর্ণ সুস্থ আর তার মনমেজাজও ভালো। খাবার তৈরীর ঘরের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল সে, এবং বোঝাই যাচ্ছিল, কী ধৈর্যের সঙ্গেই না সে খাবারের অপেক্ষা করছে। কিন্তু যখন মাংস দেওয়া হলো মেনেলিক এবারও তা স্পর্শ করলো না, যদিও মাংস ছিল ওষুধ ছাড়া।

সিংহের এরূপ অদ্ভুত ব্যবহারে অভিজ্ঞ ডাক্তার মহা চিন্তায় পড়লেন: কী ব্যাপার, সুস্থ অথচ মাংস খাচ্ছে না।

পরের বার ডাক্তার এলেন একদিন পরে। তিনি জানতে চাইলেন মেনেলিক কেমন আছে, কেমন খেয়েছে।

— ভালোই খেয়েছে, — বললো পরিচারক, — ভালোই আছে। এক্ষুনিই খাওয়াবো, নিজেই দেখতে পাবেন।

কিন্তু ব্যাপার-স্যাপার দেখে পরিচারক তো থ মেরে গেল। মেনেলিক আবার খেলো না, দূর থেকে মাংসের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের মুখই শুধু চাটলো।

— বোঝা দায়। আপনি না থাকলে খায়, আর আপনি এলেই তার খাওয়া বন্ধ, — বললো পরিচারক।

— মনে হয় তাই। আমি না থাকলে খায়, আর থাকলে খায় না, — এটা আপনি ঠিকই বলেছেন। বেশ, কাল আমি আসবো না, আপনি নিজেই মাংসে ওষুধ ভরে ওকে খেতে দেবেন। আশা করি, সবই ঠিক হবে।

ডাক্তার ঠিকই বলেছিলেন। মেনেলিক ওষুধ দেওয়া সবটা মাংসই খেলো, এমন কি হাড়গুলোও ভালো করে চাটলো। তারপর নিজের কোণে গিয়ে পড়লো শুয়ে। এখন সবাই সিংহটির মতিগতি বুঝতে পারলো। শাদা স্মক পরা ডাক্তার এসে তাকে ওষুধ দিয়েছিলেন, তাতে তার ভীষণ বমি হয়েছিল। বুদ্ধিমান সিংহ সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিয়েছিল যে এই শাদা পোশাক পরা লোকটিই সেই জন্যে দায়ী। সে তা মনে রেখেছিল এবং যখনই ডাক্তার আসতেন সে আর মাংস খেতো না।

তবে এই বুদ্ধি মেনেলিককে সাহায্য করলো না, কারণ ওষুধ সে ঠিকই খেয়েছিল এবং কয়েক দিন পরে সম্পূর্ণ সুস্থও হয়ে উঠেছিল।

মুসিক

মুসিক জন্মেছিলই এক্কেবারে ছোট্ট। এতো ছোট্ট যে বলার নয়। সঙ্গে সঙ্গেই ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনার নজর পড়লো না তার উপর। মাকে খুব শক্ত করে আঁকড়ে ধরে তার বুকে সে এমনভাবে ঘেঁষে থাকে যে তাকে প্রায় দেখাই যায় না।

মুসিক — মিকির প্রথম সন্তান। সম্ভবত এই জন্যেই মা'র এতো ভয়। বাচ্চাকে সে ঠিকমতো খাওয়ায় না, শুধু চিন্তা করে, চারিদিকে তাকায়, তাকে হাত দিয়ে রাখে ঢেকে। ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা যখন খাঁচায় ঢুকেন মিকিকে আপেল দিতে, সে চেঁচিয়ে ওঠে হামাগুড়ি দিয়ে চড়ে খাঁচার একেবারে উপরের তাকে।

বানরের এরূপ আচার-আচরণ পরিচারিকার পছন্দ হলো না। কুড়ি বছরেরও বেশি তিনি বানরের দেখাশোনা করছেন, জানেন তাদের স্বভাব। তাই তিনি নিশ্চিত, অস্থিরমতি মিকি কখনো ভালো মা হতে পারবে না।

এবং ভুল করেন নি ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা।

বাচ্চা হওয়ার পর থেকেই মিকি খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। সবচেয়ে উপরের বরগায় বসে থাকতো, নামতো সবাই চলে যাবার পর। নামতো কিন্তু খুব সাবধানে, বাচ্চাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধ'রে। কাছে রুটি-ফুটি যা পেতো তাই-ই মুখে পুরে তাড়াতাড়ি আবার আগের জায়গায় উঠে পড়তো। তবে ভালো খাবার তার জুটতো না কখনো, কারণ ভালো সবকিছু অন্যান্য বানররাই খেয়ে ফেলতো।

বার কয়েক মিকিকে আলাদা খাঁচায় নিয়ে রাখার চেষ্টা হয়, কিন্তু সবই বৃথা। এতো বিরাট এক খাঁচায় বাঁদরকে ধরে ফেলা তো আর চাট্টেখানি কথা নয়। তার উপর মিকির রয়েছে ছোট্ট বাচ্চা। ছুটোছুটির সময় বাচ্চাটি পড়ে গিয়ে মারাও তো যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে আগের খাঁচায়ই রাখতে হলো মিকিকে, তবে শুধু চোখে চোখে এই যা।

বেশির ভাগ সময় ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনাই তার দেখাশোনা করতেন।

শিগ্‌গিরই তিনি লক্ষ্য করলেন, ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া না করার দরুন মিকি শুকিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া তার সর্দিও হয়েছে, ভীষণ কাশছে। ঝামেলা কি আর একটা, তার উপর আবার দেখা গেল মিকির বুকে দুধ খুবই কম।

বাচ্চাকে দেখেই তা বোঝা যায়। মায়ের বুক থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে প্রায়ই সে করুণ সুরে চেঁচায়। আর মা যদি খায় সে তার মুখে দেয় হাত ঢুকিয়ে। বানরছানার সবে দুই সপ্তাহ হয়েছে, এই বয়সে এক দুধ খেয়েই তার বাড়ার কথা।

ছোট্ট মুসিক দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে আর তার মা খুব কাশছে দেখে সবাই ভীষণ চিন্তিত। বানর-ঘরের পরিচালিকা তামারা আলেক্সান্দ্রোভনা ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা আর ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক করেন বাচ্চাকে মিকির কাছ থেকে সরিয়ে নেবেন।

অবশ্যই এটা দারুণ ঝুঁকির ব্যাপার, কিন্তু অন্য উপায় তো নেই।

যাকিছু দরকার সবই করলেন ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা নিজে। সারা খাঁচায় তিনি ঘন খড় বিছিয়ে দেন, তাতে বাচ্চাটি পড়ে গেলেও মরবে না। সবকিছু যখন তৈরী, শুরু হয় ধর-পাকড়।

কিন্তু কয়েকটি লোক ঝুটমুট জাল দিয়ে মিকিকে ধরতে চেষ্টা করে। সে তীরের বেগে ছুটতে থাকে তাদের মধ্যে, তাড়াতাড়ি উপরে উঠে যায় কিংবা জাল ধাক্কা দিয়ে বলের মতো উড়ে যায় অন্য পাশে।

মনে হলো, তাকে ধরা অসম্ভব।

হঠাৎ লাফ দেওয়ার সময় মিকি জাল ধরতে গিয়ে হাতটা দেয় ঢিলে করে। ঐ হাতেই বাচ্চাটিকে ধরে রেখেছিল। মুসিক হাতছাড়া হয়ে পড়ে যায় নিচে। সবাই ভাবলো, বাচ্চাটি মরেই যাবে। কিন্তু ছোট্ট বানরছানার বরাত ভালো। বরগাতে না লেগে পড়লো গিয়ে এক গাদা নরম খড়ের উপর।

ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা ছুটে যান বাচ্চাটিকে তুলতে। কিন্তু অন্য একটি বানর তার আগেই বাচ্চাটিকে কায়দা করে তুলে নিয়ে দেয় ছুট। তারপর বোঝা নিয়ে যেই উপরে উঠতে যাবে অমনি সবাই তাকে জালে জড়িয়ে ফেলে।

জালটি ধীরে ধীরে খোলা হলো। এদিকে মিকি সারা খাঁচায় ছুটোছুটি করছে, খুঁজছে বাচ্চাকে। তবে বাচ্চা ততক্ষণে চলে গেছে ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনার কাছে। তিনি তাকে রাখলেন তাঁর গরম সোয়েটারের ভেতর।

বানরটির কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার সময় মুসিক ভীষণ কেঁদেছে। ছোটো ছোটো হাতে তাকে এ্যায়সা আঁকড়ে ধরেছিল, যেন ও তার মা আর কি। কিন্তু যেই তাকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো অমনি সে ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনার সোয়েটারের তাপ অনুভব করলো। এবার সে তাঁকে জড়িয়ে ধরে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে চেঁচামেচিও বন্ধ।

ডাক্তার রাইসা আন্তিপোভনাও বানর ধরার সময় হাজির ছিলেন। তিনি দেখতে চান মুসিককে—পড়ে গিয়ে চোট খেয়ে হাড়-টাড় মচকাতে পারে তো। কিন্তু মুসিক কিছুতেই ইকাতেরিনা

আন্দ্রেয়েভনাকে ছেড়ে যেতে চাইলো না। কী আর করা, পরিচারিকার হাতেই দেখতে হলো তাকে। ভাগ্যিস কোথাও চোট-ফোট লাগে নি। তবে দু'সপ্তাহের বাচ্চাটি যে কী রোগাসোগা আর ছোট্ট তা যদি তোমরা একবার দেখতে! তার মাথাটি আখ্‌রোটের চেয়ে সামান্য বড়ো, মুখটি কুঞ্চিত আর হাতগুলো ভীষণ চিকন, — এতো চিকন যে কী বলবো! দেখে দুঃখই হয়। ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনার একেবারে গায়ে লেগে থাকে, কেউ একটু তাকালেই মাথাটি লুকিয়ে ফেলে তাঁর সোয়েটারের তলায়, ভয়ে চেঁচায়।

— ইশ্‌, কী আরামেরই জায়গাটা না পেয়েছে! — হাসেন রাইসা আন্তিপোভনা। — তাহলে কী করা, ওকে বাচ্চা জন্তুদের মধ্যে রাখবো, না আগে নিয়ে যাবো হাসপাতালে? — জিজ্ঞেস করেন তিনি তামারা আলেক্সান্দ্রোভনাকে।

— আর আমি মুসিককে নিজের কাছে নিয়ে গেলে কী হয়? — বলেন ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা।

এতো অল্প সময়ের মধ্যেই মুসিক ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনাকে আপন করে নিয়েছে দেখে ছানাটির প্রতি তাঁরও মায়া বেড়ে গেল। খুব ইচ্ছে হলো, ছোট্ট বাচ্চাটিকে পালতে নেন।

— আমার তো মনে হয় কথাটি মন্দ নয়, — রাজী হন তামারা আলেক্সান্দ্রোভনা। তারপর ডাক্তারের দিকে চেয়ে বলেন:— বাচ্চাটাকে নিয়ে ঝামেলা কি আর কম হবে: গরম জায়গায় রাখতে হবে, রাত্তিরে কাউকে পাশে থাকা চাই, আর ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনার কাছে থাকলে এতো ঝামেলাও নেই, অত লোকেরও দরকার হবে না। তাছাড়া তিনি কুড়ি বছরেরও বেশি বানরের দেখাশোনা করছেন, তাদের তিনি ভালোই জানেন।

রাইসা আন্তিপোভনা যুক্তিগুলো মেনে নেন। ছোট্ট মুসিক ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনার কাছেই থেকে যায়।

জেদী

ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা জানতেন যে মুসিককে নিয়ে তাঁর ঝামেলা কম হবে না।

শুরু থেকেই মুসিক খেতে চাইলো না।

বাড়ী এসেই ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা পয়লা দুধ গরম করেন, ঢালেন তা শিশিতে, নিপ্‌ল্‌ লাগিয়ে মুসিককে খেতে দেন। সে মুখ ফিরিয়ে নেয়, বোতলের দিকে এমন কি তাকায়ই না। তখন ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা তাকে চামচে তুলে খাওয়াতে চান, তা থেকেও সে খায় না। যখন জোর করে মুখে দুধ ঢাললেন সে তা ফেলে দেয়। ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা যে-দুধই তাকে খাওয়াতে চেয়েছেন — হোক তা মিষ্টি, চিনি ছাড়া, পাতলা কিংবা খুব ঘন, — তাই-ই সে ফেলে দিয়েছে মুখ থেকে।

ফ্যাসাদে পড়লেন ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা। সারা রাত ঘুম হলো না তাঁর। এবার রাত পোয়ালেই বাঁচেন। সকালে তিনি রাইসা আন্তিপোভনা আর তামারা আলেক্সান্দ্রোভনার কাছে যাবেন ঠিক করেন, কিন্তু তার আগে ওঁরা নিজেরাই এলেন।

— কেমন চলছে ? — শুধালেন তামারা আলেক্সান্দ্রোভনা।

— খারাপ, — বলেন ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা, — সারা রাত কী হেঙ্গামটাই না হলো, আর ও একফোঁটা দুধও খেলো না! — অসহায়ভাবে হাত নাড়েন তিনি। ঘরেরও সবকিছু লণ্ডভণ্ড।

ঘরের চেহারা সত্যিই ছিল একেবারে যাচ্ছেতাই। সারা টেবিল কাপ, প্লেট, হরেক রকম দুধের বোতল, ছোটো-বড়ো নিপ্‌ল্‌, চামচ এবং আরো কতকিছুতে ঠাসা। আর এ সবকিছুর মূলে যে, সেই মুসিক আগের মতোই বসে আছে ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনার সোয়েটারের তলায়। ওটা তিনি খুব সম্ভব রাত্রে গা থেকে খুলেনই নি।

— বটে, ব্যাপার-স্যাপার খুবই খারাপ, — মাথা নাড়েন রাইসা আন্তিপোভনা। ঘরের অবস্থা দেখেই তিনি বুঝতে পারেন ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা বাস্তবিকই সাধ্যমতো সবকিছু করেছেন। — ঠিক আছে, আবার দেখা যাক।

তিনজন মহিলাই আবার বাচ্চাটিকে খাওয়াতে বসলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

রাইসা আন্তিপোভনা এমন কি বাচ্চাদের জন্যে তৈরী বিশেষ ধরনের দুধও নিয়ে এলেন। তাও খেলো না মুসিক।

তখন তাঁরা ঠিক করেন, তাকে অন্তত কোনোকিছু খাওয়াতেই হবে যাতে সে টিকে থাকতে পারে। অনেককিছুই দেন তাকে, তবে খেলো শুধু কমলার রস। যাক তাও ভালো, এটাও কিন্তু কেউ আশা করে নি।

তাকে এক রস খাইয়েই রাখতে হলো। তবে দিন কয়েকের মধ্যেই ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা বহু কষ্টে ছোট্ট জেদী এই বানরটিকে দুধ খেতে শেখান।

এবার থেকে মুসিক একটু মোটাসোটা হতে লাগলো।

ছোটো শিশুদের যে দুধ খাওয়ানো হয় মুসিকও তা খেতো। সে যখন একটু বড়ো হলো পেতো আপেলের কুচি, দুধে ভেজানো রুটি এবং আরো অনেককিছু, — এক কথায়, ছোট্ট এক বানরকে ঠিকমতো বেড়ে উঠতে যাকিছু দরকার তার সবই।

মুসিক সবকিছু অবশ্য সমান আগ্রহে খায় না। বিভিন্ন ফলের রস খায় সানন্দে, জাউ খুব একটা পছন্দ না হলেও কোনো রকমে সহ্য করে, তবে ব্যাপার যখন মাছের তেল অবধি গড়ায় তখন ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনার লাঞ্ছনার একশেষ — জোরজবরদস্তি সামান্য কয়েক ফোঁটা খাওয়াতে পারলেই অনেক।

মুসিকের থাকার ব্যাপারেও ঝামেলা কম নয়। যেমন, সে কিছুতেই একা থাকবে না। তার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা — ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনার সোয়েটারের তলা।

মুসিকের জন্যে ছোটো একটা খাঁচা কেনা হয়, দেখতে শিশুদের খাটের মতো। তাতে পালকের নরম গদি বিছানো, আর গদির নিচে গরম জলের ব্যাগ, মুসিকের যাতে ঠাণ্ডা না লাগে।

কিন্তু হলে হবে কী। যেই ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা তাকে ওতে শোয়াতে যান অমনি সে শুরু করে প্রচণ্ড চিৎকার, হাতের কাছে যা পায় তাই আঁকড়ে ধরে। তখন বাধ্য হয়ে কোলেই নিতে হয় আবার।

দুষ্টু মুসিক

মুসিক কিন্তু ভীষণ দুষ্টু। সে যখন ছোটো, তখন অবশ্য তা সহ্য করা যেতো। কিন্তু সে যত বড়ো হতে থাকে, তার দুষ্টুমিও তত বেশি অসহ্য হয়ে উঠে।

উজ্জ্বল চক্‌চকে জিনিসপত্তর মুসিকের খুবই পছন্দ। বিশেষ করে এ থেকেই বিরক্তিকর অনেককিছু ঘটতো। যেমন ধরো, ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা তাঁর বোনার কাজ নিয়ে বসেছেন, মুসিক হঠাৎ তাঁর নাক থেকে চশমাটি টেনে নেবে, কিংবা বোনার কাঁটা ধরে মারবে এক টান — ব্যস, তখন সব কাজ পণ্ড। অথবা এরকমও করতো: ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা হয়তো খেতে বসেছেন, চামচখানি মাত্র মুখে নেবেন, এমন সময় মুসিক তাতে মারে এক ঝাপ্‌টা, সবখানি সুপ পড়ে যায় তাঁর পোশাকে।

তখন ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা ঠিক করেন তাকে খেলনা কিনে দেবেন।

মুসিককে সঙ্গে নিয়েই যেতে হলো দোকানে, কারণ সে তো কিছুতেই বাড়ীতে থাকবে না। ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা ওভারকোট পরার আগেই মুসিক তার জামার নিচে গিয়ে আরামে বসে আছে। তাকে মোটেই দেখা যাচ্ছে না, এমন কি বাসে পাশের লোকটির মাথায়ই আসে নি যে তার কাছে বসা মহিলাটির সঙ্গে রয়েছে একটি বানর।

দোকানে ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা খেলনা দেখাতে বলেন। এটা ওটা অনেক খেলনাই তিনি দেখেন, তবে কোন্‌টা নেবেন জানেন না। তাঁর সামনে — পুরো একগাদা রবারের হাঁস, কুকুর, মাছ, ভেলভেটের ভালুক, সেলুলয়েডের ঝুনঝুনি, কিন্তু তিনি ভেবে পান না, কোন্‌টা নিলে ভালো হয়।

শেষ পর্যন্ত দোকানের মেয়েটির আর সহ্য হলো না, সে বললো:

— জানি না, আপনাকে আর কী দেবো, তবে এগুলোই তো ছোট্ট বাচ্চার জন্যে মানানসই খেলনা।

— তা অবশ্য ঠিকই, তবে কী জানেন... আমার... আমার বাচ্চাটি আর সব বাচ্চার মতো নয়... ও... ও একটু...— কী বলবেন ভেবে না পেয়ে আমতা-আমতা করলেন ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা।

— জেদী, — তাঁর মুখের কথা শেষ করে মেয়েটি। — বুঝলাম, সবই বুঝলাম, — সহানুভূতি জানানোর ভঙ্গিতে সে মাথা নাড়লো। — আচ্ছা, তাহলে যদি কোনো চাবিওলা খেলনা নেন তো কেমন হয় ?— বলে মেয়েটি।

— না। জানেন...— ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা আবার আমতা-আমতা করেন, কিন্তু জানেন না কী করে বলবেন যে খেলনা দরকার বানরের জন্যে।

তবে বলতে আর হলো না। মুসিকই সব ঝামেলা মিটিয়ে দিলো। অন্ধকারে বসে বসে তার হয়তো জ্বালা ধরে গেছে। ওভারকোটের ভেতর থেকে চুপিচুপি উঁকি মেরে দেখে সামনে খেলনার স্তূপ। ব্যস, আর যায় কোথায়, একলাফে সোজা টেবিলে।

বানরের এরূপ অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে মেয়েটি যে কত অবাক হয়েছে সেকথা না বললেও চলবে। সে তো একেবারে দিশেহারা। কী করবে বুঝতে পারলো না। কিন্তু ক্ষুদে দুষ্টুটি মোটেই হকচকিয়ে যায় নি। সে বেশি বাছাবাছি করলো না, মেজাজে একটি লাল ঝুনঝুনি তুলেই আবার একলাফে চলে গেল ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনার কোলে।

মেয়েটির চমক যখন ভাঙ্গলো মুসিক তো ততক্ষণে খেলনা নিয়ে উধাও। তারপর মেয়েটি এবং খদ্দেররা এ নিয়ে অনেক হাসলো।

আর এমনিতে অন্যান্য দোকান-পাটেও মুসিক অনেক কাণ্ডকারখানা করেছে।

যেমন, একবার পাশে দাঁড়ানো এক ভদ্রমহিলার নাক থেকে ঝাপটা মেরে চশমা ফেলে দিলো। মহিলাটি অবশ্য রাগেন নি, তিনি এমন কি মুসিককে একটি লজেন্সও দেন, কিন্তু ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা তো তার এরূপ ব্যবহারে লজ্জা পেলেন।

বাড়ীতেও মুসিককে রাখা দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে। এখন সে বড়ো হয়েছে। আগের মতো আজকাল সে আর গরম সোয়েটারের তলায় বসে থাকতে ভালোবাসে না।

প্রথম প্রথম সে আশেপাশের জিনিসপত্রই নাড়াচাড়া করতো। ধরতে মানা এমন কোনো জিনিসের দিকে সে যদি যেতো, তাহলে ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনাকে উঠে একটু দরজার কাছে গেলেই হতো, সঙ্গে সঙ্গেই চেঁচিয়ে সে ছুটতো তাঁর পেছন পেছন, আঁকড়ে ধরতো তাঁর কাপড়।

তবে ধীরে ধীরে এই দুষ্টুটিকে ঠকানোও মুস্কিল হয়ে উঠে। ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা যদি বাইরে চলে যাচ্ছেন এমন ভাবও দেখাতেন সে আর দৌড়তো না তাঁর কাছে। মুসিক শুধু ভালো করে দেখতো, তিনি যেন দরজা খুলে বেরিয়ে না পড়েন। আর যেই তিনি তা করতে প্রস্তুত অমনি সে এক নিমেষে ছুটে গিয়ে ঝুলে পড়তো তাঁর পোশাকে। তখন তাকে ছাড়ানো দায়। দিন দিন মুসিকের নিপুণতাও বাড়লো। এখন সে ভালো লাফও মারতে পারে। পর্দা বেয়ে উপরে উঠে বইয়ের তাক কিংবা নরম বিছানায় ঝাঁপ দেওয়া তো তার পক্ষে খুবই মামুলী ব্যাপার।

ঘরের অতিরিক্ত সবকিছু সরিয়ে ফেলতে হয়। বইয়ের তাকে সুন্দর পুতুলগুলো নেই অনেক দিন, সরানো হয়েছে আয়না, আতরের শিশি, চিরুনি, ব্যাগ, মোট কথা সবকিছু যা কৌতূহলী বানরটির মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে।

ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনার অনেক জিনিসই সে ভেঙ্গেছে ও ছিঁড়েছে, কিন্তু একদিন যখন আলমারি থেকে কাপ-প্লেট সবকিছু ফেলে একেবারে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে দিলো, তিনি বুঝলেন যে এবার মুসিককে বিদায় দেবার সময় হয়েছে।

নতুন জায়গায়

প্রথমে ঠিক হলো মুসিককে চিড়িয়াখানার অন্যান্য বানরদের সঙ্গে রাখা হবে। তবে শেষ পর্যন্ত তাকে পাঠানো হয় পোষা জন্তুদের বিভাগে।

ওখানে হরেক রকম জন্তুজানোয়ার। নেকড়ে, শেয়াল, সুন্দর ময়ূর, কাঁটাময় সজারু এবং আরো অনেক পশুপাখি। সবাই তারা পোষ-মানা, এবং খুশিমতো তাদের কোলেও নেওয়া যায়।

চিড়িয়াখানার এই বিভাগটি দর্শকদের দেখানো হয় না। তবে এখানকার পশুদের প্রায়ই নিয়ে যাওয়া হয় ক্লাবে, স্কুলে, পার্কে। তখন সবাই তাদের দেখতে পায়। এই জন্তুদের নিয়ে দর্শকদের গল্পও বলা হয় অনেক।

পোষা জন্তুদের বিভাগের দেখাশোনা করেন গালিনা গ্রিগোরেভনা। তাঁর হাতেই মুসিককে দেওয়া হবে। ও তো একেবারে পোষ-মানা। গালিনা গ্রিগোরেভনার কাছে অনেক জন্তুই আছে, নেই শুধু বানরই।

মুসিক যাতে শিগ্‌গির অভ্যস্ত হয় এবং বিচ্ছেদের দরুন বেশি নেতিয়ে না পড়ে সেজন্যে গালিনা গ্রিগোরেভনা তাকে সঙ্গে সঙ্গে নিলেন না। প্রথম প্রথম তিনি শুধু তার কাছে বেড়াতে যান, কখনো আনেন মিষ্টি কলা, কখনো বা আঙুর, খেলেন তার সঙ্গে।

কিন্তু এতোসব প্রস্তুতি সত্ত্বেও নতুন জায়গায় এসে তার ভীষণ কষ্ট হলো।

তাকে খাওয়ানোর জন্যে গালিনা গ্রিগোরেভনাকে কী খাটুনিটাই না করতে হয়েছে। সে কিছুই ছোঁয় না, চেঁচায়, খাঁচা থেকে চায় বেরিয়ে পড়তে। পাশে যখন লোক থাকে একমাত্র তখনই হয় শান্ত।

মুসিকের শিক্ষাদীক্ষা

মুসিক যখন নতুন জায়গায় সবকিছুর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে লাগলো, গালিনা গ্রিগোরেভনা তার দেখাশোনার ভার দেন তরুণ প্রকৃতিবিদ ওলিয়াকে। ওলিয়া মুসিককে বেড়াতে নিয়ে যায়, লক্ষ্য করে তার চালচলন। তারপর সে ঠিক করলো তাকে চেয়ারে বসতে ও প্লেট থেকে চামচে করে খেতে শেখাবে।

তরুণ প্রকৃতিবিদরা নিজেরাই তার জন্যে চেয়ার-টেবিল বানায়। জিনিস দু'টি ছোটো, ঠিক মুসিকের মাপে মাপে। ছেলেমেয়েরা যখন চেয়ার-টেবিল নিয়ে এলো, মুসিক মন ভরে তা দেখলো। তারপর উঠে টেবিলে, বসে কিছুক্ষণ, নেমে যায়। পরে টেবিলটা উল্টে দিয়ে তার পায়া কামড়াতে লাগে। তখন সর্ষে মাখতে হলো পায়ায়। মুসিক সর্ষে চেখে দেখলো, নাক সিটকালো, এরপর আর কখনো তা ছুঁলো না।

ওলিয়া মুসিককে টেবিলের পাশে চেয়ারে বসিয়ে বলে:

— বসো মুসিক, বসো, — এবং তাকে দেয় এক টুকরো চিনি।

কিন্তু মুসিক কোথায় আর বসে। চিনি খেয়েই সে একলাফে উঠে পড়ে ওলিয়ার কোলে। আরো মিঠাই চাই।

তবে ওলিয়া তাকে চিনি দিলো না। বানরকে আবার সে বসায় চেয়ারে আর বলে:

— বসো মুসিক, বসো, — এবং একমাত্র বসার পরই তাকে আরো এক টুকরো চিনি খেতে দেয় ওলিয়া।

মুসিক তাড়াতাড়ি আদব-কায়দা শিখে ফেলে। তিন দিনের দিন ওলিয়া যখন তাকে বললো: 'বসো মুসিক, বসো', সে লক্ষ্মীটির মতো বসে পড়ে চেয়ারে ও ধৈর্য্য ধরে মিঠাইয়ের অপেক্ষা করতে থাকে।

তবে দেখা গেল, বানরকে চামচে করে খাবার খেতে শেখানো কিন্তু ঢের কঠিন। মুসিক চামচ ধরে ঠিকই, কিন্তু যেই তার সামনে খাবার রাখা হয় অমনি সে চামচ-টামচ ফেলে দেয়, খেতে শুরু করে দুই হাতেই।

ওলিয়া জানে না, তাকে নিয়ে কী করবে। সে রেগে জোর করে মুসিকের হাতে চামচ ধরিয়ে দেয়, আর মুসিক এতে ক্ষেপে উঠে, চেঁচায়, বারবার চামচ ছুঁড়ে ফেলে।

— এতো রাগ করতে নেই, ওলিয়া, — বলেন গালিনা গ্রিগোরেভনা। 'পড়াশোনা' কেমন চলছে দেখতে আসেন তিনি, তখনই তাঁর চোখে পড়ে তাদের ঝগড়াঝাঁটি। — জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে বুঝেশুনে চলতে হয়, কখ্‌খনো মাথা গরম করতে নেই, নতুবা যাকিছু শেখাচ্ছ তাতে কোনো ফল হবে না। আরো ভালো করে ভেবে দেখো, কী করে মুসিককে চামচ ধরতে বাধ্য করা যায়।

গালিনা গ্রিগোরেভনা মনে করিয়ে দেন যে মুসিক রঙচঙে জিনিস ভালোবাসে। ওলিয়াকে বললেন তাকে প্লাষ্টিকের একটা রঙীন চামচ এনে দিতে।

বেশ, ওলিয়া তাই-ই করলো। পরদিনই সে চিড়িয়াখানায় কিনে আনলো গাঢ় নীল এক চামচ।

চামচখানা দেখতেই মুসিক তা কেড়ে নেয় ওলিয়ার হাত থেকে। কিছুতেই দেবে না। ওলিয়া যখন তার সামনে খাবার রাখলো সে আগের মতো চামচখানা আর ফেলে দিলো না। মুঠোর মধ্যে ধরলো শক্ত করে।

তারপর ওলিয়া মুসিকের হাত ধরে সাহায্য করে চামচটি দিয়ে প্লেট থেকে মিষ্টি আঙুরের রস তুলে খেতে। তবে কাজটা সে করে সাবধানে, যাতে রস পড়ে না যায়।

কয়েক দিন পরে মুসিক অনায়াসে চামচ দিয়ে খেলো। চামচখানা সে এতোই ভালোবেসে ফেলে যে সে সব রকমে চেষ্টা করে তা খাঁচায় নিয়ে যেতে। আর সুযোগ পেলে অনেক সময় সে চামচখানার সঙ্গে এমন কি ঘুমোয়ও।

দেখা গেল, সবচেয়ে সহজ — মুসিককে বই 'পড়তে' শেখানো। অবশ্যই আসল পড়া নয়, এমনিই বইয়ের পাতা উল্টানো। তবে খাসা উৎরাতো কিন্তু, মনে হতো মুসিক যেন সত্যিই বই পড়ছে।

বইখানি বড়ো। পাতাগুলো প্লাই-উডের। প্রথমবার ওলিয়া ওখানা রাখলো বানরের সামনে টেবিলে, এবং মুসিক যাতে দেখতে পায় সেইভাবে পাতার মধ্যে

লুকিয়ে দিলো একটুকরো বিস্কুট। মুসিক সঙ্গে সঙ্গে পাতাটি উল্টে বিস্কুটখানা খেয়ে নিলো।

'পড়ার' এ অভ্যাসটা সে খুব তাড়াতাড়িই আয়ত্ত করে। একদিন যখন মুসিককে ঘরে ছাড়া হলো সে কী কান্ডটাই না করলো। গালিনা গ্রিগোরেভনার টেবিলে বসে সেদিন সে এমন পড়াটাই 'পড়েছে' যে বই-ডায়েরি-কাগজ-পত্র আর আস্ত রাখে নি, সবকিছুর শ্রাদ্ধ করে ছেড়েছে।

মুসিক শিগগির 'গুনতে'ও শিখলো। তখন থেকে তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হতো। প্রথম প্রথম মুসিককে দেখানো হয় খাঁচায়, তবে যখন সে আদব-কায়দা পুরো শিখে নেয় গালিনা গ্রিগোরেভনা তাকে কোলেই রাখতেন।

মিলন

বছর কাটে। এতোদিনে ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা একবারও দেখতে আসেন নি মুসিককে। গালিনা গ্রিগোরেভনার মুখে তিনি শুনেছেন, মুসিক বেশ বড়ো হয়েছে, আছে ফুর্তিতেই। তাই তিনি আর তাকে কষ্ট দিতে চান না।

তবুও মুসিককে দেখার ভীষণ ইচ্ছে তাঁর, কিন্তু দেখতে হবে লুকিয়ে — সে যেন টের না পায়। তখন চিড়িয়াখানায় দর্শকদের পোষা জন্তুজানোয়ার দেখানোর কথা। ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা জানতেন এ খবর। তিনি ঠিক করেন, চুপি চুপি গিয়ে একবার দেখে আসবেন তাঁর আদরের মুসিককে।

আসতে একটু দেরী হলো ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনার। তিনি যখন হলঘরে ঢুকেন মুসিক তখন চেয়ারে বসে দেখাচ্ছে সে প্লেট থেকে চামচে করে কী চমৎকার খেতে পারে।

ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা বসতে যাবেন, এমন সময় মুসিক কী শব্দ শুনে মাথা ফেরাতেই দেখতে পেলো তাঁকে। তখনই শুরু হলো দক্ষযজ্ঞ। খাবারের প্লেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, মঞ্চ থেকে লাফিয়ে পড়ে, নীল চামচ হাতে নিয়েই দশর্কদের মাথা টপ্‌কিয়ে ছুটলো সে ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনার কাছে। কেউ

ব্যাপারটি বুঝতে পারার আগেই মুসিক গিয়ে চড়ে বসলো তার পুরনো পালিকার ঘাড়ে।

সে তাঁকে এতো জোরে জড়িয়ে ধরে, এতো জোরে তাঁকে আঁকড়ে থাকে যে তখন তাকে ছাড়িয়ে নেবার কথাই উঠতে পারে না। অবশ্য তা করা দরকারও হয় নি। মুসিককে নিয়ে ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা নিজেই মঞ্চে উঠলেন, আর গালিনা গ্রিগোরেভনা বলে গেলেন বানরটির পুরো ইতিহাস।

ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনাকে যে মুসিকের ভালো মনে আছে সেকথা বলার কোনো দরকার হলো না, কারণ দর্শকরা নিজের চোখেই মুসিক আর তার পালিকার মিলনের দৃশ্যটি দেখে তা বুঝতে পারলো।

গালিনা গ্রিগোরেভনার গল্প বলা শেষ। দর্শকদের সবাই হাততালি দিয়ে খুব প্রশংসা করলো ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনা আর মুসিকের। যাবার সময় তারা ইকাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনাকে বলে গেল, তিনি যেন অবশ্যই মুসিককে নিয়ে একটি গল্প লেখেন।

চিড়িয়াখানায় 'ঘরোভূত'

একদিন সকালে চিড়িয়াখানার পরিচারক প্রাভিকোভ্ সিংহের বাড়ীটা পরিষ্কার করতে গিয়ে জায়গাটাকে চিনতে পারলো না। মেঝের উপর ছড়িয়ে রয়েছে ভাঙা ফুলের টব, ফুল আর মাটি, আর খোলা উনুন থেকে ছাইগুলোকে হয়েছে জড় করা। প্রাভিকোভ্ চোখ রগড়ালো। আগের রাত্রে সে আর তার সহকারী পরিচারক পাভেল খুড়ো সবকিছু গুছিয়ে রেখে গিয়েছিল, আর এখন!.. কে একাজ করতে পারে? কিন্তু ভাববার সময় ছিল না। দর্শকরা আসতে শুরু করার আগেই জায়গাটাকে পরিষ্কার করা আর খাঁচাগুলোকে ধোয়া দরকার। ঠিক তখনই এলো পাভেল খুড়ো। পরিচারকরা ভাবলো যে তামাসাটা নিশ্চয়ই কেউ ইচ্ছে করে করেছে। তারা তাদের কাজ শুরু করে দিলো। যথারীতি প্রাভিকোভ্ কাজ শুরু করলো রাজি নামে বিরাট বাঘটাকে নিয়ে। চিড়িয়াখানার ভিতর সবচেয়ে হিংস্র বাঘ ছিল রাজি। প্রাভিকোভ্ যখন তার কাছে যেতো সে তখন শিকগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো, সেগুলোকে তার থাবা দিয়ে এমন জোরে আঘাত করতো যে খাঁচাটা উঠতো কেঁপে।

রাজিকে প্রাভিকোভ্ ভয় করতো না। সে জানতো যে বাঘটার থাবাটা এতো চওড়া যে শিকগুলোর ভিতর দিয়ে সেটা গলে বেরুতে পারবে না, ভাস্‌কা নামে চিতাবাঘের সরু থাবাটা বেশী ভয়ের জিনিস। এমন কি খাঁচার মধ্যেও ভাস্‌কা শিকার করতে ভালোবাসতো। প্রাভিকোভ্ যখন পাশ দিয়ে যেতো তখন সে এক কোণে গুঁড়ি মেরে বসে তাকে লক্ষ্য করতো ঠিক যেমন বেড়াল ইঁদুরকে লক্ষ্য করে। আর মুহূর্তের জন্যে যদি পরিচারক অসাবধান হতো তাহলে বেরিয়ে আসতো ভাস্‌কার থাবা — দারুণ শক্তিশালী থাবা, তাতে ধারালো নখ, একবার সেটা তোমায় ধরলে তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন।

পরিচারক তার জন্তুদের ভালো করে জানতো। ভাস্‌কা কেন আজ যথারীতি

শিকগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো না সেটা ভেবে সে অবাক হলো। প্রাভিকোভ্ যখন কাছে গেল সে দেখতে পেলো চিতাবাঘের খাঁচায় রক্ত, মেঝের উপর সর্বত্রই রক্তের ছাপ। প্রাভিকোভ্ ভয় পেয়ে গেল। সে একটা লম্বা লোহার ডাণ্ডা তুলে নিয়ে শিকগুলোর উপর লাগলো ঠুকতে। জন্তুটাকে দাঁড় করানো দরকার, যাতে প্রাভিকোভ্ দেখতে পারে তার কী হয়েছে। ভাস্‌কা উঠে কয়েক পা খুঁড়িয়ে গেল। তার সামনের থাবার একটা থেকে পড়তে লাগলো রক্তাক্ত ছাপ।

ডাক্তারকে ডেকে পাঠানো হলো। তিনি ভাস্‌কাকে লোভ দেখিয়ে শিকগুলোর কাছে আনলেন, ভালো করে দেখলেন তার থাবাটা আর বললেন কেউ কামড়ে দিয়েছে। যদিও ভাস্‌কার খাঁচায় মারুস্‌কা নামে একটি চিতাবাঘ থাকতো কখনো সে কামড়াতো না, তবু সন্দেহটা পড়লো তার উপর।

বাকি দিনটা কাটলো যথারীতি। দুটোর সময় এসে পোঁছুলো মাংসের খোরাক, তিনটের সময় জন্তুদের হলো খাওয়ানো, আর তারপর পরিচারকরা জল খাবার পাত্রগুলো ভরে দিয়ে বাড়ী চলে গেল।

পরের দিন প্রাভিকোভ্ আর পাভেল খুড়ো পোঁছুলো একসঙ্গে। সিংহের বাড়ীর দরজাটা খুলেই তারা থ... কী ঘটতে পারে! মনে করা যেতে পারে যে তারা গতকাল জায়গাটাকে পরিষ্কার করে নি। সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে ভাঙা ফুলের টব আর ছেঁড়া ফুল, আর প্রাভিকোভের প্রিয় মারুস্‌কার একটা থাবা দিয়ে পড়ছে রক্ত। এটা খুব বাড়াবাড়ি ব্যাপার!

সবকিছু পরিচারকরা যে অবস্থায় দেখেছিল সে অবস্থায় ফেলে তারা গেল দারোয়ানকে প্রশ্ন করতে যে কেউ সিংহের বাড়ীর চাবিটা নিয়েছিল কিনা। দারোয়ান বেজায় চটে উঠলো। সে চেঁচিয়ে বললো, 'এতো বছর আমি এখানে কাজ করছি, কোনোদিন কোনো গণ্ডগোল হয় নি।'

মারুস্কার থাবা পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন যে কেউ কামড়ে দিয়েছে।

ঠিক একই ধরনের কামড়ের চিহ্ন দেখা গেল আর একটি চিতাবাঘের থাবায়।

সেদিন থেকে পরিচারকদের আর শান্তি রইলো না। প্রতিদিন সকালে সিংহের বাড়ীর দরজা খুলে তারা দেখতে পেতো ঘরটা লণ্ডভণ্ড হয়ে রয়েছে, কোনো না কোনো জন্তুকে হয়েছে কামড়ানো। প্রাভিকোভ্ বুঝতে পারলো না কী করা দরকার। সবকিছু সে চেষ্টা করলো। চাবিটাকে সে নিয়ে গেল সঙ্গে করে, দরজাটাকে করলো চিহ্নিত, কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হলো না। আর পাভেল খুড়োর কথা যদি ধরো, সব সময় সে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিল যে এটা একটা কোনো 'ঘরোভূতের' কাজ। ডাইনী আর ভূতের অস্তিত্বের উপর তার ছিল দৃঢ় বিশ্বাস। সিংহের বাড়ীতে ভূত এসে কায়েমি হয়ে বসেছে এই ভেবে সে যখন অন্য জায়গায় বদলী হওয়ার জন্যে আবেদন করলো, স্থির করা হলো এই সব নৈশ ঘটনার কারণ আবিষ্কার করা এবং 'ঘরোভূতটাকে' ধরা চাই।

সেদিন সন্ধেয় প্রাভিকোভ্ আর পাভেল খুড়ো যখন তাদের চাবিগুলো দিয়ে বাড়ী চলে গেল তখন 'তরুণ জীববিদ্যাবিৎদের ক্লাবের' কয়েক জন ছেলে দারোয়ানের কাছে গিয়ে সিংহের বাড়ীর চাবিগুলো চাইলো আর তাকে দেখালো ম্যানেজারের লেখা একটা চিঠি। ওতে বলা হয়েছে ছেলেদের চাবি দিতে। দারোয়ান খুব আশ্চর্য হয়ে গেল, কিন্তু তাদের সে দিয়ে দিলো চাবিগুলো। তারা চলে যাবার পর বহুক্ষণ ধরে তাদের দিকে সে তাকিয়ে রইলো।

পরে চিড়িয়াখানা বন্ধ হয়ে যাবার পর ছেলেরা সিংহের বাড়ীতে গিয়ে দরজার তালা খুলে ভিতরে ঢুকে খাঁচার লম্বা সারির নীচে রইলো লুকিয়ে। কাছাকাছি কিছুক্ষণ সামান্য খস্‌খস্ শব্দ শোনা গেল, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সবকিছু হয়ে গেল চুপচাপ। এই অনধিকার প্রবেশের জন্যে যে জন্তুগুলো জেগে উঠেছিল তারা সবাই শান্ত হয়ে এলো শুধু রাজি ছাড়া। স্বাধীনতার জন্যে তার দারুণ মন কেমন করছিল। কর্কশ গলায় মৃদুস্বরে ডাকতে ডাকতে বহুক্ষণ ধরে সে তার খাঁচার ভিতর করতে লাগলো পায়চারি। কিন্তু অবশেষে সেও পড়লো শুয়ে। সবকিছুই সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে গেল, ঘড়ির টিক টিক শব্দ যেতে লাগলো শোনা। এগারোটা বাজলো।

অকস্মাৎ সিংহের বাড়ীর দূরের এক কোণ থেকে শোনা গেল একটা খস্‌খস্‌ শব্দ। ছেলেরা উঠলো চমকে কিন্তু পরক্ষণেই আশ্বস্ত হলো — ওটা শুধু একটা ব্যাজারের জেগে ওঠার শব্দ। সে খাঁচার শিকগুলোর কাছে গিয়ে বাতাস শুঁকে খাঁচাটার উপরে সাবধানে চড়লো। চিতাবাঘটা জেগে উঠে সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠলো সতর্ক। ইতিমধ্যে ব্যাজারটা আড়াআড়িভাবে রাখা শিকটাকে ধরে দুটো শিকের মাঝখান দিয়ে নিজের মুখটাকে ঢুকিয়ে খাঁচার ভিতর থেকে নিজের শরীরটাকে কুঁকড়ে মুচড়ে পড়লো বেরিয়ে।

ভাস্‌কা নামে চিতাবাঘটা তার খাঁচার শিকগুলোর কাছে এসে একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ব্যাজারটার কাছে আসার জন্যে অপেক্ষা করে রইলো। ব্যাজারটা কোনো রকম সন্দেহ করে নি। সে খাঁচাটার বাইরের দিক বেয়ে নেমে লম্বা সরু কার্ণিশ দিয়ে চলতে লাগলো। যেই চিতাবাঘটার খাঁচার পাশ দিয়ে যাচ্ছে সতর্ক জন্তুটা দিলো এক লাফ। ব্যাজারটাকে ধরার জন্যে তার থাবাটা খাঁচার অনেক বাইরে গেল বেরিয়ে, কিন্তু তাড়াতাড়ি সেটাকে সে টেনে নিলো যন্ত্রণায় হুঙ্কার ছেড়ে। তার থাবা দিয়ে পড়তে লাগলো রক্ত, ব্যাজারটা কিন্তু সম্পূর্ণ শান্তভাবে গেল চলে। কার্ণিশের শেষে একটা বেঞ্চি বেয়ে সে মাটির উপর নামলো, তারপর ফুল গাছের আধারগুলোর উপর দৌড়ে উঠে সে তার লম্বা লম্বা নখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগলো মাটিটা।

ছেলেদের ইচ্ছে হয়েছিল এই পলাতককে ধরতে, কিন্তু তাদের মনে পড়লো সে কাজের জন্যে তারা আসে নি। তাই যেখানে তারা ছিল সেখানেই রইলো।

ব্যাজারটা কোনো বিপদ লক্ষ্য করে নি। আধারের উপরে লঘু পায়ে চড়ে সে শুরু করলো টবগুলোকে টেনে ফেলতে। ভঙ্গুর ক্রিস্যানথিমাম আর এ্যাসটারগুলো পড়ে ভেঙে গেল... তাদের সুন্দর শাদা ফুলগুলো মেঝের উপর

গেল ছড়িয়ে আর সিংহের বাড়ীটা ভরে উঠলো টব পড়ার শব্দে। জন্তুরা জেগে উঠে তাদের খাঁচার মধ্যে পায়চারি শুরু করলো, লাগলো গর্জন করতে আর হাঙ্গামাকারীর দিকে ঘন ঘন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাইতে। ব্যাজারটা কিন্তু তার কাজ করে চললো। সে চললো এক ফুল গাছের আধার থেকে অন্যটায়, — যতক্ষণ না সিংহের বাড়ীর সমস্ত ফুলগুলো পড়লো মেঝের উপর। তারপর সে ভাঙা টবগুলো থেকে মাটি লাগলো ছুঁড়তে, অধ্যবসায় সহকারে খুঁজতে লাগলো কোনো একটা জিনিস, আর সেটাকে পেয়ে চিবিয়ে চললো তারিয়ে তারিয়ে।

ফুলগুলো শেষ হবার পর ব্যাজারটা সমস্ত পিকদানী আর আধারগুলো উল্টে ফেললো, এমন কি উনুনের মধ্যে গিয়ে মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো ছাইগুলো। তারপর সে শুরু করলো খেলতে। তার হাবভাব এমন মজাদার হয়ে উঠলো যে লুকিয়ে থাকা ছেলেরা বহুকষ্টে হাসি চাপলো। ব্যাজারটার শরীরটা এমন নমনীয় হয়ে উঠলো — মনে হলো না যে তাতে কোনো হাড় আছে। সে ডিগ্‌বাজি খেতে লাগলো, তার লোমগুলো খাড়া খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো, তাকে দেখাতে লাগলো একটা বলের মতো। দম দেওয়া খেলনার মতো সে লাফাতে লাগলো, তারপর টবের একটা ভাঙা অংশ কিম্বা একটা নুড়ি তার সামনের থাবাগুলো দিয়ে ধরে সে শুয়ে রইলো চিৎ হয়ে।

রাত্রি কেটে গেল। সিংহের বাড়ীর একটা জানলার ভিতর দিয়ে সরু এক ফালি দিনের আলো গেল দেখা। ছেলেদের কেউই কিন্তু ঘুময় নি। একটা ব্যাজার কাছে থাকলে ঘুমনো যায় না!

বাইরে শোনা গেল চাবির ঝন ঝন শব্দ। সেটা শুনে ব্যাজারটা উঠলো চমকে। তারপর অকস্মাৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো একটা টুলের উপর, সেখান থেকে কার্ণিশে, আর তারপর পরিচিত পথ ধরে ছাতের উপরকার শিকগুলোর একটা ফাঁক দিয়ে সে ফিরে গেল তার খাঁচায়। খাঁচাটা তার গর্তের কাজ করলো, সেখানে আশ্রয় নিলো ব্যাজারটা। সে অদৃশ্য হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রাভিকোভ্‌ আর পাভেল খুড়ো এলো ভিতরে। বাড়ীটার লণ্ডভণ্ড অবস্থা আর খাঁচাগুলোর তলা থেকে ছেলেদের গুঁড়ি মেরে বেরুতে দেখে বিস্ময়ে তারা শুধু

প্রসারিত করতে পারলো তাদের হাত। ছেলেরা একে অন্যের চেয়ে জোরে চিৎকার করে বলতে শুরু করলো ব্যাজারটার নৈশ উদ্ভট কাণ্ডকারখানার কথা।

— 'আমরা কিন্তু কোনো ঘরোভূতকে দেখি নি', — ছেলেদের একজন অবশেষে বললো।

প্রাভিকোভ্ হাসতে লাগলো। সে ব্যাজারটার খাঁচার কাছে গিয়ে বাঁকা শিকগুলো ভালো করে দেখে সেগুলোকে সাবধানে বেঁধে দিলো একটা তার দিয়ে। সেদিন থেকে সিংহের বাড়ীতে সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা ফিরে এলো। পাভেল খুড়োও ঘরোভূতের অস্তিত্বে আর বিশ্বাস করতো না।

সত্যি ঘটনা

মে মাসের সুন্দর রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। ইচ্ছে হলো খিড়কি নয়, ব্যালকনির দরজা খুলতে। মন চাইলো বাইরে দাঁড়িয়ে বুক ভরে নেই বসন্তের তাজা সুরভি হাওয়া। দরজা খুলে রৌদ্রস্নাত ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন তাতিয়ানা স্তেপানোভনা। কিন্তু তিনি দু'পাও এগুতে পারেন নি, হঠাৎ মাথার উপরে কোথাও শোনা গেল ফোঁসফোঁস শব্দ। তাকাতেই তাতিয়ানা স্তেপানোভনার পিলে গেল চমকে: তাঁর মাথার ঠিক উপরেই ঝরকা থেকে মাথা বের করে ফোঁসফোঁস করছে সাপ।

তাতিয়ানা স্তেপানোভনার মনে নেই কখন কীভাবে এক দৌড়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছিলেন। তাঁর চমক ভাঙলো বাক্স দিয়ে দরজাটি ঠেলে দেবার ঠিক পরক্ষণেই।

এবার তাড়াতাড়ি গৃহ-তত্ত্বাবধান-বিভাগে গিয়ে জানানো দরকার যে বাড়ির ব্যালকনিতে সাপ। সাহায্য চাই! না, গেলে চলবে না: হঠাৎ যদি আলোচকা ইশকুল থেকে আসে... তখন মেয়ের যে কী বিপদ হতে পারে শুধু এই কথাটি ভাবতেই তাঁর গা শিউরে উঠলো। বরং স্বামীকেই টেলিফোন করা যাক।

ভ্লাদিমির নিকোলায়েভিচ বহুক্ষণ স্ত্রী কী বলছেন মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পান না: ব্যালকনিতে কোন্ এক সাপ... শিগ্‌গির এসো... যাক শেষ পর্যন্ত ব্যাপার বুঝে বললেন:

— আবুল-তাবুল কী সব বকছো! সাপ? পাঁচ তলায় সাপ কোত্থেকে আসবে! ওসব তোমার চোখের ধান্দা।

উত্তরে তাতিয়ানা স্তেপানোভনা স্বামীকে খুব ঝাড়লেন। কী আর করা, ভ্লাদিমির নিকোলায়েভিচকে বাড়ী যেতেই হলো। ততক্ষণে আলোচকাও ইশকুল থেকে ফিরেছে। সে সাপটা দেখার চেষ্টা করছে।

ভ্লাদিমির নিকোলায়েভিচ এসেই গেলেন সোজা ব্যালকনিতে। তিনি বাক্স সরিয়ে দরজা খুললেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই ধড়াম ক'রে দিলেন বন্ধ করে। মুখটি তাঁর একেবারে শুকিয়ে গেল; সাপই তো মনে হচ্ছে। তবে ওটা এলো কোত্থেকে? তাছাড়া, ওকে ঝরকা থেকে বের করা যায় কী করে? শিগ্‌গিরই কিছু একটা করা দরকার। স্ত্রীকে দরজা বন্ধ রাখতে বলে ভ্লাদিমির নিকোলায়েভিচ বেরিয়ে পড়লেন। তিনি জানেন না কোথায় যাবেন সাহায্যের জন্যে। শেষে একটু ভেবে এক পুলিশের কাছে গেলেন।

— আপনি বলতে পারেন কোথায় আমার জানানো দরকার? — একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। — ব্যাপারটি কী জানেন, আমাদের ব্যালকনিতে কাদের এক সাপ, আমরা জানি না ওর মালিক কে কিংবা কীভাবে ওকে ধরবো!

— সাপ?! — অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে পুলিশ, তবে কাঠোর গলায় যোগ করলো: — জানেন, আমি এখন ডিউটিতে আছি, রসিকতা রাখুন।

তবে পুলিশটি শেষ পর্যন্ত বুঝলো যে লোকটি তার সঙ্গে তামাসা করছে না। তাকে সে চিড়িয়াখানায় ব্যাপারটি জানাতে বললো।

— চিড়িয়াখানা খুব কাছেই, — বললো সে, — ওখানে অনেক জান্তা লোক আছে, ওরাই আপনাকে বাতলে দেবে কী করতে হবে।

চিড়িয়াখানায় এসে ভ্লাদিমির নিকোলায়েভিচ গেলেন ম্যানেজারের সহকারীর কাছে। মন দিয়ে তাঁর কথা শুনে ভদ্রমহিলা বললেন:

— ঠিক আছে, আপনি এবার বাড়ী যান, বউ ও মেয়েকে শান্ত করুন গে। আর আমি এক্ষুণি একজন লোক পাঠাচ্ছি, দেখে আসবে ওটা কী।

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভ্লাদিমির নিকোলায়েভিচ তাড়াতাড়ি বাড়ী গেলেন। তাতিয়ানা স্তেপানোভনা ব্যালকনির দরজা ঠেসে বন্ধ করে দিয়ে একটু শান্ত হয়ে স্বামীর অপেক্ষা করছিলেন।

— কী হলো? — এই ছিল তাঁর প্রথম প্রশ্ন।

চিড়িয়াখানা থেকে লোক আসছে জেনে তিনি ঘর গুছাতে লাগলেন। কিন্তু

কিছুই গুছিয়ে উঠতে পারেন নি তাতিয়ানা স্তেপানোভনা, সঙ্গে সঙ্গেই দরজার ঘণ্টি বাজলো।

— তানিয়া! আলোচকা! ওই যে লোক এসছে! — ভ্লাদিমির নিকোলায়েভিচ খুশিতে কথা ক'টি বলতেই সবাই ছুটলো দরজা খুলতে।

কিন্তু দরজায় একটি ছেলে দাঁড়িয়ে।

— আলোচকা! তোর কাছে এসছে ইশকুল থেকে, — মেয়ের দিকে ফেরেন তাতিয়ানা স্তেপানোভনা।

— আমার কাছে নয়, — ছেলেটিকে সকৌতুকে দেখতে দেখতে বলে আলোচকা। — আমি ওকে চিনি না।

ছেলেটি জেব থেকে একখানা ছোটো চিঠি বের করে ভ্লাদিমির নিকোলায়েভিচকে দিলো।

— আমি চিড়িয়াখানার কিশোর জীববিদ, — পরিচয় দিলো ছেলেটি। — আপনাদের ব্যালকনিতে কী তাই-ই দেখতে পাঠানো হয়েছে আমাকে।

— ও, আচ্ছা, আসুন, আসুন! — বেশ কদর করে বললেন ভ্লাদিমির নিকোলায়েভিচ। তবে জীববিদের এতো অল্প বয়েস দেখে তিনি একটু চিন্তিত হয়ে যোগ করলেন: — ব্যালকনিতে যাবেন না কিন্তু। ওখানে বরং আমি নিজেই যাবো, আপনাকে আবার ছোবল-টোবল মারতে পারে।

তাতিয়ানা স্তেপানোভনাও স্বামীর সঙ্গে একমত: ছেলেটিকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া যায় না। ঠিক হলো, ব্যালকনিতে প্রথম যাবেন ভ্লাদিমির নিকোলায়েভিচ। তাই হলো। ভ্লাদিমির নিকোলায়েভিচ দরজা একটু খুললেন। সাপটি আবার ঝরকা থেকে মুখ বের করে করতে লাগলো ফোঁসফোঁস। তবে ছেলেটি 'সাপ' দেখে ভয় পাওয়ার বদলে হাসিতে ফেটে পড়লো।

— এ যে সাপ নয়, এটা জংলী হাঁস! — বললো সে।

— জংলী হাঁস? — অজানা নাম শুনে অবাক হন তাতিয়ানা স্তেপানোভনা। — জংলী হাঁস আবার কী এবং কেনই বা ওটা আমাদের এই ঝরকাতে এসে বসে আছে?

তখন সাশা — ছেলেটির এই নাম — বোঝালো যে জংলী হাঁস হচ্ছে একরকম জলচর পাখি। একে লাল হাঁসও বলা হয়। ও চিড়িয়াখানা থেকে উড়ে এসেছে। ঝরকায় বাসা করে ডিমে তা দিচ্ছে।

— আপনারা ভাববেন না, — বলে সাশা, — বাচ্চা হলেই চিড়িয়াখানায় খবর দেবেন।

যাবার সময় সে আলোচকাকে বলে গেল পাখিটির দেখাশোনা করতে।

ছেলেটি চলে যেতেই সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো। সবচেয়ে জোরে হাসলো আলোচকা।

— মা, তুমি যে কী! পাখিকে বলো সাপ! — হাসতে হাসতে কোনো রকমে বললো সে।

— আর বাবাও তো তোর মজার লোক! — হাসি থামাতে পারেন না তাতিয়ানা স্তেপানোভনা। — সঙ্গে সঙ্গে উঠেই পুলিশে দৌড়, চিড়িয়াখানায়ও গেল... আমি না হয় ডরপোকই — সবাই তা জানে। আর ও কি কম: 'সাপ... সাপ... দরজা খুলো না!' — স্বামীকে তিনি ক্ষেপাতে লাগলেন।

— না, তানিয়া, তুমি ঝুটমুট আমাকে নিয়ে ওসব কথা বলছো! — রাগেন ভ্লাদিমির নিকোলায়েভিচ। — আমি তো তখনই বলেছি, ওটা সাপ নয়, ওসব তোমার চোখের ধান্দা, আর তুমি কিনা আমার উপর চটতে লাগলে।

সারা সন্ধে তারা সবাই এ নিয়ে ভীষণ হাসাহাসি করলো। পরের দিন শুধু আলোচকার ইশকুলই নয়, এমন কি সারা বাড়ীটা পর্যন্ত জেনে ফেললো, কী মজার একটা পাখি থাকে ইভানোভদের ব্যালকনিতে।

আলোচকা পাখিটির ভালো দেখাশোনা করতো। সে এখন উঠতো সকাল সকাল। তবে হাঁসটি বাসা ছাড়তো ক্বচিৎ। প্রায় সব সময়ই সে বাসায় থাকতো, শুধু খাওয়ার সময় যেতো বাইরে। বরাবর সে চিড়িয়াখানায়ই দানা খায়। আলোচকা ও তাতিয়ানা স্তেপানোভনা বার কয়েক তাকে দানা দিয়েছেন, কিন্তু সে তা খায় না। চিড়িয়াখানাতেই খেতে তার ভালো লাগে।

তারপর একদিন কী হলো জানো! পাখিটি চিড়িয়াখানায় উড়ে না গিয়ে বাড়ীর কাছে দু'একবার চক্কর খেয়ে মাঝ রাস্তায় নেমে লাগলো ডাকতে। আলোচকা

বাড়ীতে থাকলে সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে নিতো যে পাখিটির ডিম ফুটেছে এবং মা বাচ্চাদের ডাকছে নিজের কাছে। কিন্তু আলোচকা ছিল ইশকুলে, আর পথের লোকরা কীই বা বুঝবে! পাখিটিকে মিছে তাড়াবার চেষ্টা করলো তারা। সে কিছুতেই যেতে চাইলো না, বার কয়েক উড়েই আবার রাস্তায় নেমে পড়লো। আর কী একটানা চেঁচানি!

— কী আজব পাখিরে বাবা! — রাগ ধরলো এক ভদ্রমহিলার এবং হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন: — দেখুন! দেখুন!

এক নিমেষে উপর থেকে রাস্তায় পড়লো ছোটো ফুঁয়োফুঁয়ো এক ঢেলা। এটা ছিল হাঁসের ছানা। গা ঝাড়া দিয়েই সে টুক্ টুক্ হেঁটে চলে গেল মায়ের কাছে। তার পিছু পিছু পাঁচতলার ঝরকা থেকে একে একে আরো পড়লো হাঁসের বাচ্চা। কোনোটাকে রাস্তার লোকেরা ধরতে পেরেছিল, আর কোনোটা নিজেই উড়ে নামলো মাটিতে। মা হাঁস ঘাবড়ে গিয়ে চটাপট লোকজনের ভেতর থেকে এক জায়গায় জড়ো করলো সব বাচ্চাদের।

রাস্তার গাড়ীঘোড়া সব গেল থেমে। এরূপ বিরল নিয়মভঙ্গকারীদের কেই বা গাড়ীচাপা দেবে! হাঁস হুড়োহুড়িতে কোনো ভ্রূক্ষেপই করলো না। সে আপন মনে বাচ্চাদের জড়ো করলো। যখন সবাই একত্র জড়ো হলো নিশ্চিন্তে সে তাদের নিয়ে চলে গেল।

কাণ্ড দেখে রাস্তার লোক তো অবাক। গাড়ী থেকে মাথা বের করে দেখে যাত্রীরা। আর জোয়ানগোছের ট্রাফিক-পুলিশটিও বেশ সাড়ম্বরে তুলে ধরলো তার হাত — যাতে নির্বিঘ্নে যেতে পারে হাঁস পরিবার! হাঁসটি রাস্তা পেরিয়ে রওনা দিলো চিড়িয়াখানার দিকে, আর তার পেছন পেছন টুক্ টুক্ করে ছুটলো ছোটো ছোটো সাতটি হাঁসশাবক।

বাড়ী ফিরে আলোচকা শুনলো ছানাদের নিয়ে হাঁস চিড়িয়াখানায় চলে গেছে। শুনে তার ভীষণ খারাপ লাগলো। তবে বেশি দিন সে মন খারাপ করে থাকলো না। পয়লা রবিবারেই আলোচকা চিড়িয়াখানায় গেল হাঁস পরিবারকে দেখতে।

শেয়ালছানা উগালোক

উগালোক ছিল সবচেয়ে ছোটো, সবচেয়ে কমজোর আর সবচেয়ে কালো শেয়ালছানা। এতো কালো যে একেবারে কয়লার মতো। তার ভাইবোনেরা যখন মার দুধ খেতে আসে, সে পড়ে থাকে একদম পেছনে, তাই তার খাবারও জুটে সবার চেয়ে কম।

কম খেয়ে খেয়ে শেয়ালছানা দিন দিন শুকোতে থাকে। প্রথম তা লক্ষ্য করে তরুণ প্রকৃতিবিদ গালিয়া। গালিয়ার উপরই শেয়াল পরিবারের দেখাশোনার ভার। শেয়ালছানারা যাকিছু করে সে তা টুকে রাখে, এবং প্রতি তিন দিন পর পর বাচ্চাদের ওজনও নেয়।

কচি বাচ্চারা দেখতে জোয়ান মায়ের মতো নয় মোটেই। তাদের বরং বেড়ালছানা বললে মানাবে বেশি: তারা তেমনি ছোটো, তেমনি ভোঁতা তাদের মুখ, আর ছোটো ছোটো কানগুলো লেগে আছে একেবারে মাথার সঙ্গে।

পয়লা বার গালিয়া তাদের ওজন করতে এসে দেখে, এক জায়গায় জড়োসড়ো হয়ে গায়ে গায়ে লেগে তারা শুয়ে আছে — কীসের যেন একটা স্তূপ আর কি। গালিয়া তাদের ছুঁতে না ছুঁতেই তারা শুরু করে গিজগিজ, চেঁচামেচি আর ঠেলাঠেলি।

তিন দিন পর গালিয়া আবার তাদের ওজন নেয়। বেশ বেড়েছে তারা এ ক'দিনে। গোলগাল, লোমওয়ালা। উগালোকের গায়েও লোম হয়েছে, চেহারাখানাও আগের চেয়ে বেশি কালো। কিন্তু ওজন তার প্রায় বাড়েই নি, এবং এতোই দুর্বল যে কোনোমতে নড়তো। এরকম চললে শেয়ালছানাটি মারা যেতে পারে, তাই মার কাছ থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে রাখতে হলো ছোটো জন্তুজানুয়ারদের ঘরে।

ছোটো জন্তুদের ঘরে শেয়ালছানাকে গালিয়া রাখে টুকরিতে নরম পরিষ্কার গদিতে। আর টুকরিটি রাখে ঠিক উনুনের পাশে। তারপর দুধ গরম ক'রে

ঢালে বোতলে, নিপ্‌ল লাগিয়ে তা আনে শেয়ালছানার মুখের কাছে। কিন্তু কমজোর বাচ্চাটি এমন কি খেতেই পারে না। শুধু করুণ সুরে ডাকে আর বারবার খুলে মুখ। গালিয়া সাবধানে কিছুটা দুধ তার মুখে ঢালতে চেষ্টা করে, তবে এতেও কোনো ফল হয় না। শেয়ালছানা দুধ গিলেই না।

কী যে করা? বাচ্চাকে আবার তার মার কাছে নিয়ে যাওয়া — এর মানে তাকে মরতে দেওয়া। এখানে রাখা — মানে না খেয়ে থাকা।

জানি না, কী ঠিক করতো গালিয়া, কিন্তু এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠে। তার চিন্তায় পড়ে বাধা। ফোন এসেছে গালিয়াকে অফিসে যেতে হবে। টুকরিটি উনুনের আরো কাছে ঠেলে দেয়, তারপর বাচ্চাটিকে একটু ঢেকে দিয়ে চলে গেল সে।

গালিয়া চলে যাবার পর দরজাও বন্ধ হয় নি ঠিকমতো, এমন সময় টেবিলের তলা থেকে বেরুলো মুরকা।

মুরকা — একটি বেড়াল। টেবিলের নিচে তার ছোটো দু'টি বাচ্চা শুয়ে আছে, এখনো চোখ ফোটে নি। মুরকা অনেকক্ষণ শুনেছে শেয়ালছানার চেঁচামেচি। এতে সে বেশ চিন্তিত হয়। তো একবার সে বাচ্চাদের সোহাগে চাটে,
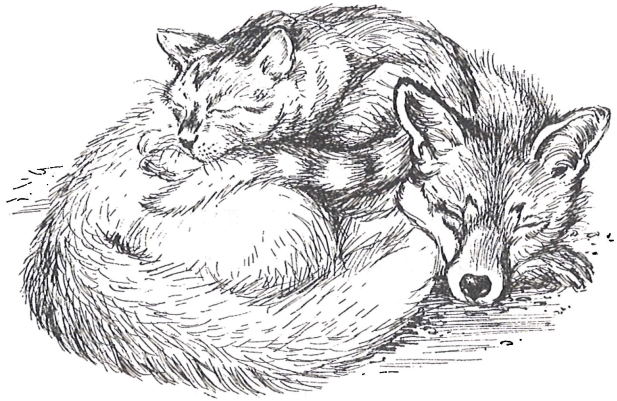
তো মাথা তুলে সাবধানে দেখে শেয়ালছানার দিকে। ব্যস, গালিয়া তাকে টুকরিতে রেখে চলে যেতেই মুরকা বেরিয়ে পড়ে।

সাবধানে, চুপিচুপি এলো সে টুকরির কাছে। অনেকক্ষণ ভালো করে তা শুঁকলো, তারপর ঘাড় লম্বা করে উঁকি মারলো ভেতরে। শেয়ালছানা আবার নড়চড় করছে, ডাকছে। বেড়াল তার গলা আরো বাড়িয়ে দেয়, এবং হঠাৎ

নিমেষের মধ্যে শেয়ালছানাটিকে ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে যায় নিজের বাচ্চাদের কাছে।

গালিয়া ফিরলো কিছুক্ষণ পরে। শেয়ালছানাকে টুকরিতে না পেয়ে সে তো মাথায় হাত দিয়ে বসে। বাচ্চাটি কোথায়ই বা উধাও হতে পারে? গালিয়া ঘরের চারিদিকে দেখে, হঠাৎ তার চোখে পড়ে মুরকা। তার গা শিউরে উঠে। তাহলে... সত্যিই কি... মুরকা... গালিয়া ছুটে যায় বেড়ালটির কাছে। ওখানে সে কী দেখে জানো... সে দেখে, ওখানে নরম গদিতে বেড়ালছানার সঙ্গে শুয়ে শুয়ে শেয়ালছানাও তার পালিকা মার খুব দুধ খাচ্ছে, আর মা আদর করে চেটে দিচ্ছে তার এলোমেলো লোম।

এবার শেয়ালছানার জন্যে গালিয়ার আর ভয় নেই। মুরকা খুব ভালো মা। শিগ্গিরই উগালোক একটু মোটাসোটা হলো, জোরও পেলো গায়ে। দু' সপ্তাহ পরে ফুটলো তার চোখ, কান খাড়া হলো, আর একমাস যখন হলো সে তখন চমৎকার দৌড়য়, মাংস খায়। ততদিনে মুরকার বাচ্চাদু'টিকে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই সে তার পালিত সন্তানের আরো বেশি যত্ন করে।

শেয়ালছানাও বেড়ালকে ভালোবাসে। সব সময়ই সে তার পেছনে ছুটোছুটি করে, আর যদি মুরকাকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়, তো সে দরজা আচড়ায় ও চেষ্টা করে বেরিয়ে আসতে।

তখন থেকে গালিয়ার ভয় হলো শেয়ালছানা পালিয়ে যেতে পারে। তাই সে তাকে বেড়ালের সঙ্গে খাঁচায় নিয়ে রাখে। ঘরের চেয়ে ওখানে তাদের ঢের বেশি ভালো লাগবে: সারাদিন খাঁচায় সূর্যের আলো থাকে, ছুটোছুটি আর খেলাধুলার জায়গাও প্রচুর।

শীতকাল নাগাদ শেয়ালছানা যথেষ্ট বেড়ে যায়, বদলায়: গায়ে ফুঁয়ো-ফুঁয়ো লোম, চেহারাখানা খুব সুন্দর, সারা শরীর ঠিক কয়লার মতো কালো, কিন্তু লেজের ডগাটি ভীষণ শাদা — একেবারে দুধের মতো।

উগালোক লম্বায় মাকেও ছাড়িয়ে যায়। মুরকা অনায়াসে তার পেটের নিচে করতে পারে আনাগোনা। তবে এতে তাদের বন্ধুত্বে কোনো ব্যাঘাত পড়ে না। আগের মতোই তারা হামেশা একসঙ্গে ঘুমোয়। এমনও দেখা গেছে, লোমওয়ালা

উগালোক হয়তো গোল হয়ে শুয়ে আছে, আর তার উপর, যেন আর কি নরম বালিশের উপর, আরামে শুয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে মুরকা।

যদিও খাঁচায় মুরকার মন্দ লাগছে না, তবুও বাইরে বেড়াতে যেতে তার কোনো আপত্তি নেই। সাধারণত গালিয়াই তাকে নিয়ে বেড়ায়। গালিয়াকে আসতে দেখলেই সে ছুটে যায় খাঁচার দরজায়, মিনতি করে তাকে ছাড়তে। মুরকা বেশিক্ষণ বেড়ায় না। খাঁচার ধারেকাছে একটু ঘোরাফেরা করেই আবার ফিরে যায় নিজের জায়গায়।

মুরকাকে ফিরতে দেখলে উগালোকের কী ফুর্তি হয়! সে ছুটে যায় তার কাছে, কেঁউ-কেঁউ করে, তার সামনে পেটের উপর দেয় হামাগুড়ি কিংবা মাংসের টুকরো মুখে নিয়ে এগোয় মুরকার দিকে, যেন সে তাকে খাওয়াতে চাইছে।

একদিন মুরকা ফিরলো না। আশেপাশে কোথাও পাওয়া গেল না তাকে। বেড়া অবধি তাজা বরফের উপর চোখে পড়লো তার পায়ের স্পষ্ট দাগ।

গালিয়া ভাবলো বেড়াল হয়তো একটু দূরে কোথাও বেড়াতে গেছে। সে আর তাকে খুঁজলো না। সে জানতো যে বেড়ানো হয়ে গেলে মুরকা ফিরে আসবে। তাই গালিয়া নিশ্চিন্তে বাড়ী চলে যায়।

কিন্তু মা চলে যাওয়ায় উগালোকের মনে শান্তি নেই। একা পড়ে সে ছটফট করছে, অস্থির হয়ে ছুটছে খাঁচায়। সকালে পরিচারিকা খাঁচা সাফ করতে এসে দেখে উগালোক তো উধাও। খাঁচার জাল ছেঁড়া, আর বরফের উপর শেয়ালের পায়ের দাগ দেখে বোঝা গেল যে উগালোকও গেছে ঠিক সেদিকে, যেদিকে বেড়াল।

বেড়াল পরদিনই ফিরে এলো, তবে উগালোককে হাজার খোঁজাখুঁজি করেও আর পাওয়া গেল না।

কয়েক দিন কেটে গেল। একদিন মস্কোর কাছের এক কারখানা থেকে খবর এলো, ওখানে কলঘরে কী একটা জানুয়ার ঢুকে পড়েছে। কলের নিচে বসে বসে শুধু চেঁচাচ্ছে এবং কাউকেই কাছে যেতে দিচ্ছে না।

অজানা জন্তুটির জন্যে চিড়িয়াখানা থেকে একজন লোক পাঠানো হলো। জন্তুটিকে দেখেই সে চিনতে পারলো যে এটা উগালোক। কী আশ্চর্য! কী করে সে ওখানে এসে হাজির হয়েছে বলা শক্ত। খুব সম্ভব চিড়িয়াখানা থেকে দূরে

নিমেষের মধ্যে শেয়ালছানাটিকে ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে যায় নিজের বাচ্চাদের কাছে।

গালিয়া ফিরলো কিছুক্ষণ পরে। শেয়ালছানাকে টুকরিতে না পেয়ে সে তো মাথায় হাত দিয়ে বসে। বাচ্চাটি কোথায়ই বা উধাও হতে পারে? গালিয়া ঘরের চারিদিকে দেখে, হঠাৎ তার চোখে পড়ে মুরকা। তার গা শিউরে উঠে। তাহলে... সত্যিই কি... মুরকা... গালিয়া ছুটে যায় বেড়ালটির কাছে। ওখানে সে কী দেখে জানো... সে দেখে, ওখানে নরম গদিতে বেড়ালছানার সঙ্গে শুয়ে শুয়ে শেয়ালছানাও তার পালিকা মার খুব দুধ খাচ্ছে, আর মা আদর করে চেটে দিচ্ছে তার এলোমেলো লোম।

এবার শেয়ালছানার জন্যে গালিয়ার আর ভয় নেই। মুরকা খুব ভালো মা। শিগ্গিরই উগালোক একটু মোটাসোটা হলো, জোরও পেলো গায়ে। দু' সপ্তাহ পরে ফুটলো তার চোখ, কান খাড়া হলো, আর একমাস যখন হলো সে তখন চমৎকার দৌড়য়, মাংস খায়। ততদিনে মুরকার বাচ্চাদু'টিকে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই সে তার পালিত সন্তানের আরো বেশি যত্ন করে।

শেয়ালছানাও বেড়ালকে ভালোবাসে। সব সময়ই সে তার পেছনে ছুটোছুটি করে, আর যদি মুরকাকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়, তো সে দরজা আচড়ায় ও চেষ্টা করে বেরিয়ে আসতে।

তখন থেকে গালিয়ার ভয় হলো শেয়ালছানা পালিয়ে যেতে পারে। তাই সে তাকে বেড়ালের সঙ্গে খাঁচায় নিয়ে রাখে। ঘরের চেয়ে ওখানে তাদের ঢের বেশি ভালো লাগবে: সারাদিন খাঁচায় সূর্যের আলো থাকে, ছুটোছুটি আর খেলাধুলার জায়গাও প্রচুর।

শীতকাল নাগাদ শেয়ালছানা যথেষ্ট বেড়ে যায়, বদলায়: গায়ে ফুঁয়ো-ফুঁয়ো লোম, চেহারাখানা খুব সুন্দর, সারা শরীর ঠিক কয়লার মতো কালো, কিন্তু লেজের ডগাটি ভীষণ শাদা — একেবারে দুধের মতো।

উগালোক লম্বায় মাকেও ছাড়িয়ে যায়। মুরকা অনায়াসে তার পেটের নিচে করতে পারে আনাগোনা। তবে এতে তাদের বন্ধুত্বে কোনো ব্যাঘাত পড়ে না। আগের মতোই তারা হামেশা একসঙ্গে ঘুমোয়। এমনও দেখা গেছে, লোমওয়ালা

উগালোক হয়তো গোল হয়ে শুয়ে আছে, আর তার উপর, যেন আর কি নরম বালিশের উপর, আরামে শুয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে মুরকা।

যদিও খাঁচায় মুরকার মন্দ লাগছে না, তবুও বাইরে বেড়াতে যেতে তার কোনো আপত্তি নেই। সাধারণত গালিয়াই তাকে নিয়ে বেড়ায়। গালিয়াকে আসতে দেখলেই সে ছুটে যায় খাঁচার দরজায়, মিনতি করে তাকে ছাড়তে। মুরকা বেশিক্ষণ বেড়ায় না। খাঁচার ধারেকাছে একটু ঘোরাফেরা করেই আবার ফিরে যায় নিজের জায়গায়।

মুরকাকে ফিরতে দেখলে উগালোকের কী ফুর্তি হয়! সে ছুটে যায় তার কাছে, কেঁউ-কেঁউ করে, তার সামনে পেটের উপর দেয় হামাগুড়ি কিংবা মাংসের টুকরো মুখে নিয়ে এগোয় মুরকার দিকে, যেন সে তাকে খাওয়াতে চাইছে।

একদিন মুরকা ফিরলো না। আশেপাশে কোথাও পাওয়া গেল না তাকে। বেড়া অবধি তাজা বরফের উপর চোখে পড়লো তার পায়ের স্পষ্ট দাগ।

গালিয়া ভাবলো বেড়াল হয়তো একটু দূরে কোথাও বেড়াতে গেছে। সে আর তাকে খুঁজলো না। সে জানতো যে বেড়ানো হয়ে গেলে মুরকা ফিরে আসবে। তাই গালিয়া নিশ্চিন্তে বাড়ী চলে যায়।

কিন্তু মা চলে যাওয়ায় উগালোকের মনে শান্তি নেই। একা পড়ে সে ছটফট করছে, অস্থির হয়ে ছুটছে খাঁচায়। সকালে পরিচারিকা খাঁচা সাফ করতে এসে দেখে উগালোক তো উধাও। খাঁচার জাল ছেঁড়া, আর বরফের উপর শেয়ালের পায়ের দাগ দেখে বোঝা গেল যে উগালোকও গেছে ঠিক সেদিকে, যেদিকে বেড়াল।

বেড়াল পরদিনই ফিরে এলো, তবে উগালোককে হাজার খোঁজাখুঁজি করেও আর পাওয়া গেল না।

কয়েক দিন কেটে গেল। একদিন মস্কোর কাছের এক কারখানা থেকে খবর এলো, ওখানে কলঘরে কী একটা জানুয়ার ঢুকে পড়েছে। কলের নিচে বসে বসে শুধু চেঁচাচ্ছে এবং কাউকেই কাছে যেতে দিচ্ছে না।

অজানা জন্তুটির জন্যে চিড়িয়াখানা থেকে একজন লোক পাঠানো হলো। জন্তুটিকে দেখেই সে চিনতে পারলো যে এটা উগালোক। কী আশ্চর্য! কী করে সে ওখানে এসে হাজির হয়েছে বলা শক্ত। খুব সম্ভব চিড়িয়াখানা থেকে দূরে

সরে পড়ে ও পথ হারিয়ে পেঁৗছে শহরের বাইরে, আর তারপরই তার পাত্তা মিললো এই কারখানায়।

লোকটি জানতো যে উগালোক পোষ-মানা। সে তাকে ধরতে চায়, কিন্তু শেয়ালছানাটি চলে যায় আরো ভেতরে, কিছুতেই ধরা দেবে না সে। বেশ ফ্যাসাদে পড়া গেল তো। নিচে উগালোক থাকায় কলও চালানো যাচ্ছে না। কাজ-টাজের তো একেবারে বারোটা বেজে গেছে, এদিকে কারখানার পরিচালকও লোকটিকে বকতে শুরু করেছে, — কেন সে ডানপিটে এই জানুয়ারটাকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে না।

চিড়িয়াখানায় টেলিফোন করে গালিয়াকে ডাকতে হলো। লোকটি ভেবেছিল, উগালোক গালিয়াকে দেখলেই বেরিয়ে আসবে।

ঘোড়ার ডিম বেরুলো: গালিয়া এলো, উগালোককে অনেক ডাকাডাকি করলো, মাংস দেখালো, কিন্তু ভয়ে জড়োসড়ো শেয়ালছানা কিছুতেই ওখান থেকে বেরুতে চাইলো না।

কারখানার পরিচালক তো ক্ষেপে আগুন। কোণেই একটি লাঠি ছিল। কলের নিচে ওটা ঢুকিয়ে খোঁচা মেরে সে বের করতে চেষ্টা করে শেয়ালছানাকে। কিন্তু এতেও কোনো কাজ হলো না। উগালোক আরো ঘাবড়ে যায়, আরো ভেতরে ঢুকে পড়ে, এবার তাকে লাঠি দিয়েও নাগাল পাওয়ার সাধ্য নেই।

— তাহলে চিড়িয়াখানায় গিয়ে মুরকাকে নিয়ে এলে কেমন হয়? মুরকাকে দেখলে হয়তো বেরিয়ে পড়বে? — বলে গালিয়া।

সবাই হাল ছেড়ে দিলো। এসব চালাকিতে কোনো লাভ-টাব হবে বলে তাদের বিশ্বাস নেই, তবুও রাজী হলো। এছাড়া আর অন্য উপায়ও তো নেই।

গালিয়া তাড়াতাড়ি যায় চিড়িয়াখানায়। সে টুকরি নিয়ে ফিরলো, ওতেই মুরকা। গালিয়া সবাইকে একটু সরে দাঁড়াতে বলে টুকরিটা মেঝেতে রেখে মুরকাকে ছাড়লো। মুরকা চারিদিকে চেয়ে দেখলো, তারপর ম্যাও ম্যাও করে চললো কলঘরের দিকে। সে দশ পা'ও এগুতে পারে নি, এমন সময় কলের নিচ থেকে এক দৌড়ে বেরিয়ে এলো উগালোক। ছুটলো সে বেড়ালের কাছে, লেজ নাড়ায়, হামাগুড়ি দেয় আর আদরের ডাক ডাকে...

এবার নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে গালিয়া উগালোককে ধরে নিয়ে যায় গাড়ীতে। সেই লোকটিও মুরকাকে নিয়ে গাড়ীতে বসলো।

— আপনাদের কাজের ঢের ক্ষতি হয়েছে, মাফ করবেন, — যাবার সময় পরিচালককে বললো লোকটি।

— আরে না না, কী যে বলেন। সব সামলে নেবো, — বিশ্বাসের সঙ্গে বলে পরিচালক। করমর্দন করে সে তাদের বিদায় জানায়।

সে আর রাগছিল না তাদের উপর। কথা দিলো, উগালোক আর মুরকাকে দেখতে অবশ্যই একবার চিড়িয়াখানায় আসবে।

সারাটি পথ উগালোক চুপচাপ বসে থাকে গালিয়ার কোলে। তো একবার সে জানলা দিয়ে দেখে রাস্তার পাশের বাড়ীগুলোর দিকে, তো একবার তাকায় মুরকার দিকে, — কে জানে যদি আবার উধাও হয়ে যায় তার এই চতুষ্পদ পালিকা।

চিড়িয়াখানায় ফিরে গালিয়া উগালোক আর মুরকাকে আগের খাঁচায়ই রাখে। ছেঁড়া জাল মেরামত করা হয়ে গেছে, তবে উগালোকের ওতে কোনোকিছু এসেও যায় না। মুরকা তার কাছেই রয়েছে, তাই সে তাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।

বছর তিনেক উগালোক থাকলো তার পালিকা মা বেড়ালের সঙ্গে। পরে মুরকাকে সরিয়ে উগালোকের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হলো লাল এক শেয়ালনীকে।

শেয়ালনীটির নাম — রিজ্‌কা।

রিজ্‌কার সঙ্গে উগালোকের ভীষণ ভাব। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন কি এখনো যদি উগালোকের খাঁচার কাছে মুরকা আসে, তো সে ছুটে যায় তার কাছে, তাকে সোহাগ করে এবং খুব চেষ্টা করে তার পালিকা মাকে খাঁচার ফাঁক দিয়ে চেটে দিতে।

দুর্দান্ত হরিণ

হরিণ খুবই সতর্ক ও ভীতু — বিশেষ করে যখন তার পুরনো শিং পড়ে যায়, আর নতুন, তখনো একেবারে কচি শিং নরম চামড়ায় থাকে ঢাকা। পরিচারক যখন খোঁয়াড় পরিষ্কার করে তখন আমাদের হরিণটি তাড়াতাড়ি এক পাশে সরে পড়ে কিংবা কানগুলো নামিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। তবে হেমন্তের দিকে যখন হরিণের শিংগুলি বেড়ে উঠে ও শক্ত হতে শুরু করে তখন সে পরিণত হয় বিপজ্জনক জন্তুতে। সারা চিড়িয়াখানা জুড়ে শোনা যায় তার ভয়ঙ্কর চিৎকার: এভাবে সে প্রতিদ্বন্দ্বীদের লড়াইয়ের আহ্বান জানায়। এরকম সময় তার কাছে যাওয়া বিপজ্জনক। তখন পরিচারককে সে আর ভয় করে না। যে তার কাছে যেতে সাহস করে তাকেই সে করে আক্রমণ। এমন কি খোঁয়াড়ের শিকগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শিং দিয়ে ঢুসায়, চেষ্টা করে দর্শকের নাগাল পেতে। খোঁয়াড়ের ভেতরের গাছটিকেও পর্যন্ত গুঁতোতে ছাড়ে না।

হরিণরা থাকতো চিড়িয়াখানার নতুন এলাকায়। যুদ্ধের বছরগুলিতে সেটা বন্ধ ছিল। সেখানে লোকজন যেতো না। যারা জীবজন্তুদের দেখাশোনা করতো তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল অনভিজ্ঞ, ফলে দেখাশোনার কাজ প্রায়ই ভালো হতো না।

একবার একটি ব্যাপার ঘটলো। পরিচারক ছিল নতুন, এবং মাত্র বছরখানেক সে হরিণদের দেখাশোনা করছে। একদিন সে খোঁয়াড় পরিষ্কার করে খাবার দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় দরজাতে তালা দিলো না, শুধু খিল লাগিয়েই গেল।

পরিচারক চলে যাচ্ছে দেখে হরিণটি ছুটলো তার পেছনে। শিং দিয়ে জোর এক ঢোস — ব্যস, হুড়কা গেল উড়ে, খুলে গেল দরজা। হরিণও বেরিয়ে পড়লো। নিজের ভুল বুঝতে পেরে পরিচারক ঝাড়ু দিয়ে ভয় দেখিয়ে হরিণটাকে খোঁয়াড়ে ঢোকাতে চাইলো। কিন্তু বাধ্যের মতো খোঁয়াড়ে ফিরে যাওয়ার বদলে হরিণ ক্ষেপে

গিয়ে তার শিংওলা মাথা নিচু করে পরিচারকের দিকে লাগলো ছুটতে। লোকটি কোনোরকমে গাছের পেছনে লুকিয়ে রেহাই পেলো।

তবে পরিচারককে গাছের পেছনে নিয়ে গিয়ে হরিণ ক্ষান্ত হলো না। লোকটিকে গাছের চারিদিকে চক্কর খাওয়াতে লাগলো, আর যতই সময় যেতে লাগলো তত বেশি ক্ষেপে উঠতে শুরু করলো। রাগে আর ক্লান্তিতে তার চোখ লাল হয়ে উঠলো। পরিচারকের নাগাল ধরতে ইচ্ছুক হরিণটি বারবার এমন জোরে গাছের গায়ে গুঁতো মারতে লাগলো যে চারিদিকে উড়তে লাগলো ছালের টুকরো। ভাগ্যও এমনি, সেই মুহূর্তে আশেপাশে কোথাও চিড়িয়াখানার কর্মীদের কেউই ছিল না যে লোকটিকে বিপদমুক্ত হতে সাহায্য করতে পারে। আর হরিণ কিন্তু এদিকে তার শিকারের পিছু ছাড়লো না।

হতভাগ্য পরিচারককে গাছের চারিদিকে কতটা চক্কর যে দিতে হয়েছে তা বলা শক্ত। যখনই হরিণটি বিশ্রামের জন্যে একটু থামে, লোকটি কোনো উপায় ভাবতে চেষ্টা করে। পরের গাছটিতে দৌড়ে গেলেও কোনো লাভ হবে না, — বেশ দূরে, হরিণ নিশ্চয়ই তার নাগাল ধরে ফেলবে। তাছাড়া এক গাছের চারিদিকে ঘুরলেই হলো — ব্যাপার তো একই। শেষ পর্যন্ত লোকটি হয়রাণ হয়ে একেবারে কাহিল হয়ে পড়বে, এবং তখন ক্রুদ্ধ জন্তুটির ধারালো শিং এড়িয়ে যাওয়া মুশকিল হবে।

অবশ্য একটি কাজ করা যেতে পারে: হরিণটি যে খোঁয়াড় থেকে বেরিয়েছে সেখানে দৌড়ে গিয়ে দরজা দিয়ে বসে থাকা। তবে এতেও কিন্তু বেশ ঝুঁকি রয়েছে। খোঁয়াড়টি যদিও কাছে এবং গাছের আড়ালে থাকার চেয়ে সেখানে থাকাটা ঢের বেশি নিরাপদ, তবুও দৌড়ে পেঁছার জন্যে সময় তো চাই। এদিকে হরিণটি এক পাও সরছিল না। লোকটিকে সময় সময় একটু-আটটু জিরোতে দিলো বটে, তবে সামান্য নড়লেই আর রক্ষে নেই, — তৎক্ষণাৎ আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে। কোনোকিছু দিয়ে ওকে ভোলানো দরকার। কিন্তু কী দিয়ে ?

এমন সময় পরিচারকের মনে পড়লো এক শিকারীর কাহিনী। ঐ শিকারীকে আক্রমণ করেছিল এক ভালুক। শিকারী কিন্তু বুদ্ধি হারালো না। সে মাথার টুপিটা খুলে ভালুকের দিকে ছুঁড়ে দিলো, আর ভালুকটি যখন ওটা শুঁকতে

লাগলো, জন্তুটিকে সে গুলি করে মেরে ফেললো। তাকেও এই চালাকির আশ্রয় নিতে ক্ষতি কী? পরিচারক আর বেশিক্ষণ না ভেবে টুপিটি খুলে একদিকে ছুঁড়ে দিলো। টুপিটি দেখে হরিণ সঙ্গে সঙ্গে ওটার দিকে ছুটলো, আর এই ফাঁকে লোকটি পড়ি মরি দিলো ছুট — এক্কেবারে খোঁয়াড়ে। পেছনে সে পায়ের ভারি শব্দ শুনতে পেলো, তবে ফিরে দেখবার সময় আর কোথায়! ভেতরে ঢুকে কপাট বন্ধ করে খিল দিতে-না-দিতেই শোনা গেল শৃঙ্গাঘাতের দারুণ শব্দ, — তাতে এমন কি খোঁয়াড়ের বেড়া উঠলো কেঁপে। পরিচারক ছিল দরজার কপাট ধরে, আর হরিণ রাগে গুঁতো মেরেই চললো শিকগুলোতে। এখন নিরাপদ অবস্থায় লোকটি স্থির মস্তিষ্কে ভাববার অবকাশ পেলো — এরপর তার কী করা উচিত। সে অবশ্য খোঁয়াড়ের পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত হতে পারতো, কিন্তু হলে হবে কি — জন্তুটা তো বাইরেই থেকে যাবে। আর ক্রুদ্ধ হরিণ কত কাণ্ডই তো করতে পারে! তাকে বাইরে থাকতে দেওয়াটা মোটেই নিরাপদ নয়, যেকোন উপায়েই হোক না কেন ওকে খোঁয়াড়ে ঢোকানো চাই। পরিচারক বেড়ার শিকগুলো বেয়ে উপরে উঠে দরজা খুলে হরিণকে লোভ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে যেতে চাইলো। কিন্তু যতবারই সে কষ্টেসৃষ্টে কপাটদুটো একটু ফাঁক করে হরিণ গুঁতো মেরে তা করে দেয় বন্ধ।

শেষ পর্যন্ত বহু চেষ্টার পর দরজা খোলা গেল। তবে হরিণ খোঁয়াড়ে ঢুকলো না। সে শিকগুলোর গায়ে ঢোস মেরেই চললো আর চেষ্টা করলো পরিচারককে বেড়া ঝাড়া দিয়ে নামাতে। তখন লোকটি এক ফন্দী আঁটলো: সে গায়ের কোটটা খুলে তা দিয়ে হরিণকে ক্ষেপাতে লাগলো। ক্রোধোন্মত্ত জন্তুটির একেবারে মুখের সামনে কোটটি একটু দুলিয়ে পরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো খোঁয়াড়ের ভেতরে।

সামনে এক নতুন শত্রুকে দেখে হরিণ তাকে করলো আক্রমণ। তখন হতভাগ্য কোটটির কী দশা: সে তাকে গুঁতালো, পা দিয়ে মাড়ালো এবং শেষে এতো বেশি ক্ষেপে উঠলো যে সে এমন কি লক্ষ্যই করলো না কখন কী করে লোকটি বেড়া থেকে নেমে দরজায় তালা দিয়ে চলে গেল।

পরিচারক তার কোটটি রক্ষা করতে পারে নি সত্যি, তবে সে সুখী যে সবকিছু ভালোয় ভালোয় কেটে গেছে এবং মাত্র একটা কোট দিয়েই পার পেয়েছে।

শাঙ্গো

চিড়িয়াখানার সবচেয়ে বড় হাতি ছিল শাঙ্গো। তাকে দেখে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের মা'দের চেঁচিয়ে বলতো: 'মা, ঐ পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে দেখো!' আর বাস্তবিকই সে ছিল পাহাড়ের মতো — সেই রকম বিরাট, ভারি, ধূসর।

আমাদের কাছে সে এসেছিল এক ছোট্ট চিড়িয়াখানা থেকে। আমাদের বলা হয়েছিল, সে ভয়ানক হিংস্র আর বিপজ্জনক, তাই তাকে পাঠানো হয়েছে চিড়িয়াখানায়।

ট্রেনের একটা বিরাট খোলা গাড়ীতে করে তাকে আনা হয়েছিল। সে এতো বড় ছিল যে তাকে কোনো মালগাড়ীর মধ্যে পোরা সম্ভব হয় নি। সেই খোলা গাড়ীটার চারিদিকে তক্তা এঁটে ছাদ তৈরী করে একটা দরজা কেটে দেওয়া হয়েছিল। সেটাকে দেখাচ্ছিল ঠিক চাকার উপরে বসানো একটা বাড়ীর মতো। শাঙ্গো এই বাড়ীতে করে ভ্রমণ করেছিল। তাকে মেঝের সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল, আর তার রক্ষকরা সেখানে ছিল তার সঙ্গে। তারা হাতিটার সব অঙ্গভঙ্গী লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু সমস্ত বাড়ীটাকে টুকরো টুকরো করে সমস্ত টুকরোগুলোকে রেল লাইনের উপর ছুঁড়ে ফেলতে শাঙ্গোর একটুও বাধে নি। কিন্তু মস্কোতে পেঁছবার পর শাঙ্গো চমৎকার ব্যবহার করেছিল। পরিচারকের পিছন পিছন বাধ্য হয়ে সে সমস্ত পথ গিয়েছিল এবং সেই রকম বাধ্যভাবেই গিয়েছিল তার জন্যে প্রস্তুত জায়গার মধ্যে।

পরের দিন সকালে যখন আমি শাঙ্গোকে দেখতে এলাম সে তখন দাঁড়িয়েছিল হাতিদের বাড়ীতে, তার চারটে পা-ই বাঁধা ছিল শিকল দিয়ে। সে ক্রমাগত একটার পর একটা পা তুলছিল আর তার শুঁড় দিয়ে স্পর্শ করছিল শিকলটাকে। শিকলগুলো ছিল বিরাট আর খুব ভারি। সেগুলোকে তুলতে দু'জন লোকের

দরকার হয়েছিল। কিন্তু এই দৈত্যের কাছে সেগুলোকে মনে হচ্ছিল একেবারে হালকা।

অন্যান্য হাতিদের সঙ্গে শাঙ্গোকে রাখা হয় নি। আমাদের দরকার ছিল প্রথম তাকে জানা, তার মেজাজ আর হাবভাব পরীক্ষা করা।

প্রথমে হাতিটা খুব শান্ত ব্যবহার করেছিল। এতো শান্ত ব্যবহার করেছিল যে তার প্রচণ্ড মেজাজের গল্পগুলো আমরা আর বিশ্বাস করলাম না।

প্রথম ইঙ্গিতেই শাঙ্গো তার রক্ষককে সাবধানে নিজের মাথায় বসাতো আর আবার তাকে নামাতো সেই রকম সাবধানে। তাকে যখন শুতে বলা হতো সে শুয়ে পড়তো সঙ্গে সঙ্গে, যদিও তার পাগুলো শিকল দিয়ে বাঁধা থাকায় সেই ছোট ঘরের মধ্যে সে-কাজ করা ছিল খুব কঠিন।

এতো সহজে বশ্যতা স্বীকার করায় শীঘ্রই স্থির করা হলো শাঙ্গোকে অন্য হাতিদের সঙ্গে রাখা হবে।

স্বাধীন অবস্থায়

চিড়িয়াখানায় শাঙ্গো ছাড়াও চারটি হাতি ছিল — নোনা, জিন্‌দাউ, মান্‌কা আর মির্‌জা। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল আফ্রিকার হাতি নোনা, আর সবচেয়ে ছোট ছিল মির্‌জা। মির্‌জা ছিল তখনও নেহাত বাচ্চা, ভারি খিটখিটে আর বেয়াড়া স্বভাবের। চিড়িয়াখানার পরিচারকরা তার জন্যে ছিল বিশেষ উৎকণ্ঠিত। ও ধরনের বাচ্চার সঙ্গে শাঙ্গো কী রকম ব্যবহার করবে সে কথা কে বলতে পারে? সে যদি তাকে শুঁড় দিয়ে আঘাত করে, যদি তাকে আহত করে তাহলে?

কিন্তু ঝুঁকিটা নিতেই হলো। তার মতো একটা বিরাট হাতিকে বাড়ীর মেঝের সঙ্গে চিরজীবন শিকল দিয়ে তো বেঁধে রাখা যায় না!

শাঙ্গোর পা থেকে শিকলগুলো খুলে যখন দরজা দিয়ে তাকে বাইরে হাতিদের পাহাড়ে যেতে দেওয়া হলো, শাঙ্গো বুঝতে পারলো না তাকে কী করতে বলা হচ্ছে। সে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। এক পা থেকে অন্য পায়ে

ভর বদল করে দাঁড়াতে লাগলো। অনেক দিনের বন্দীদশার অভ্যাস তাকে বেঁধে রেখেছিল। এমন কি মনে হলো যেন শিকলের পরিচিত ঝনঝনানির জন্যে তার মন কেমন করছে। সেগুলোকে সে স্পর্শ করলো তার শুঁড় দিয়ে, সেগুলোকে তুললো আর আবার রাখলো নামিয়ে,
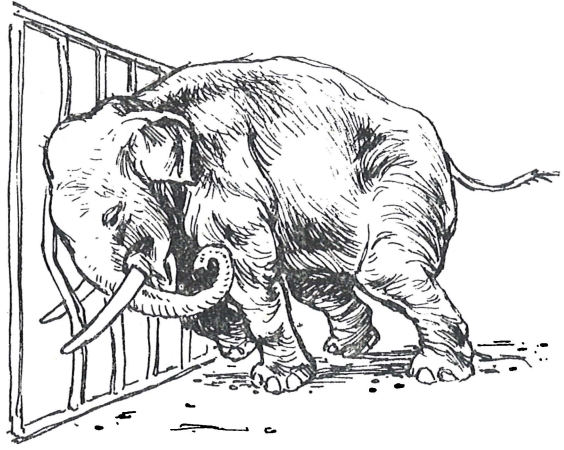
দরজার দিকে দ্বিধাগ্রস্তভাবে কয়েক পা গেল, থামলো, কয়েক মুহূর্ত একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর অকস্মাৎ শিকলগুলোকে তার শুঁড় দিয়ে তুলে নিয়ে ঘেরা জায়গাটার মধ্যে সে দৃঢ় পায়ে ঢুকে গেল।

শাঙ্গোকে দেখে অন্য হাতিরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে তাকে লক্ষ্য করতে লাগলো কৌতূহলী দৃষ্টিতে। কিন্তু তাদের পাশ দিয়ে সে হেঁটে চলে গেল, যেন লক্ষ্যই করলো না কোনোকিছু। সোজা হেঁটে হাতিদের পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে সেখানে দাঁড়ালো। এটাই হলো চিড়িয়াখানার মধ্যে উঁচু জায়গা।

মনে হলো, এই দৈত্যের পায়ের কাছে যেন সমস্ত চিড়িয়াখানা, সেখানকার খাঁচা, পুকুর আর গাছগুলো রয়েছে পড়ে। পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো শাঙ্গো। তার শুঁড় থেকে দুলতে লাগলো একটা বড় ভারি শিকল। হাতিটা খানিকক্ষণ স্থির হয়ে রইলো আর তারপর অকস্মাৎ শিকলটাকে তার কাছ থেকে দূরে ফেলে দিলো। সেটা পড়বার সময় যখন ঝনঝন শব্দ করে উঠলো, শাঙ্গো তার শুঁড়টাকে তখন তুললো উপরে আর চিড়িয়াখানার সমস্ত বাসিন্দারা শুনতে পেলো তার রণভেরীর মতো ডাক। প্রথমে সে ডাকতে লাগলো একা, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্যান্য হাতিরা তার সঙ্গে যোগ দিলো। তারা তার চারিদিকে

ঘুরতে ঘুরতে, মাটির উপর তাদের শুঁড়গুলো ঠুকতে ঠুকতে একসঙ্গে এমন জোরে চিৎকার করতে লাগলো যে কানে প্রায় তালা লেগে গেল।

প্রথম দিন থেকেই হাতিরা শাঙ্গোকে তাদের নেতা বলে মেনে নিয়েছিল, সব ব্যাপারেই করতো তার বশ্যতা স্বীকার। এমন কি মির্‌জাও, অবাধ্যতার জন্যে শাস্তি পাওয়ার পর, হয়ে উঠলো ভদ্র। যখন হাতিরা সবাই তাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে একসঙ্গে, শাঙ্গো আগে আগে চলে পথ দেখিয়ে। শাঙ্গোকে না নিয়ে তাদের জোর করে কিম্বা তোষামোদ করে বাড়ী থেকে বার করা যায় না।

হাতিরা আর তাদের খাবার নিয়ে ঝগড়া করে না, কিম্বা চুরি করে না অন্যের ভাগ, কারণ তাদের মধ্যে কেউ সে কাজ করলে সঙ্গে সঙ্গে শাঙ্গোর শুঁড়ের বাড়ি খায়।

কিন্তু এই সময় থেকে মানুষের প্রতি শাঙ্গোর ব্যবহারটা গেল সম্পূর্ণ বদলে। পরিচারকরা সর্বদাই হাতিদের কাছে যেতো নির্ভয়ে, তাদের খাবার দিতো আর ঘেরা জায়গাটা পরিষ্কার করতো তাদের সুবিধে মতো। কিন্তু এখন শাঙ্গো শুরু করলো তাদের তাড়া করতে। শুঁড় তুলে সে সোজা দৌড়োতো মানুষের দিকে। পরিচারকদের নানা রকম কৌশল আবিষ্কার করতে হতো শাঙ্গোকে ঠকাবার জন্যে, তারপর তারা পারতো হাতিদের পাহাড়ে পেঁছুতে। তাকে তারা খাবার দিয়ে রাখতো ভুলিয়ে, আর যখন সে খেতো তখন তারা পরিষ্কার করতো। কিন্তু বেশীদিন এটা কার্যকরী হলো না।

একদিন শাঙ্গো পরিচারককে লক্ষ্য করলো আর যেই সে আরো কাছে এলো অমনি আক্রমণ করলো তাকে। পরিচারক ছুটতে শুরু করলো, কিন্তু হোঁচট খেয়ে গেল পড়ে। অন্যরা আতঙ্কে স্থাণুর মতো গেল দাঁড়িয়ে। কে একজন উঠলো চিৎকার করে।

প্রত্যেকেই আশংকা করলো যে তাদের একেবারে চোখের সামনে হাতিটা লোকটিকে পা দিয়ে থেঁতো করে মেরে ফেলবে। কিন্তু শাঙ্গো তাকে আঘাত করলো না। তাকে নিজের শুঁড় দিয়ে ধীরে ধীরে তুলে সে দাঁড় করিয়ে দিলো। যখন সে বেড়াটাকে ডিঙোচ্ছিল তখন শুধু তাকে দিলো শুঁড় দিয়ে 'সামান্য' ধাক্কা। কিন্তু এই 'সামান্য' ধাক্কাতেই লোকটি পড়লো ছিটকে।

যদিও হাতিটি সদয় ব্যবহার করেছিল তবুও এই ঘটনার পর তার কাছে যেতে স্বেচ্ছায় কেউই রাজি হলো না।

স্থির হলো, বাইরেটা যখন পরিষ্কার করা হবে তখন শাঙ্গোকে হাতির বাড়ীর ভিতরে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তাকে খাবার দেখিয়ে ভুলিয়ে সেখানে নিয়ে যাওয়া হতো, আর সে ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা করে দেওয়া হতো বন্ধ। দরজাটা সময়মতো বন্ধ করার জন্যে খুব তৎপরতার প্রয়োজন হতো। সে কাজ সর্বদাই করতেন এক অভিজ্ঞ পরিচারক, যিনি বহুদিন হাতিদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন আর জানতেন তাদের হাবভাব।

মাঝে মাঝে শাঙ্গো একগুঁয়ে হয়ে উঠতো, হাতিদের বাড়ীর ভিতরে যেতে
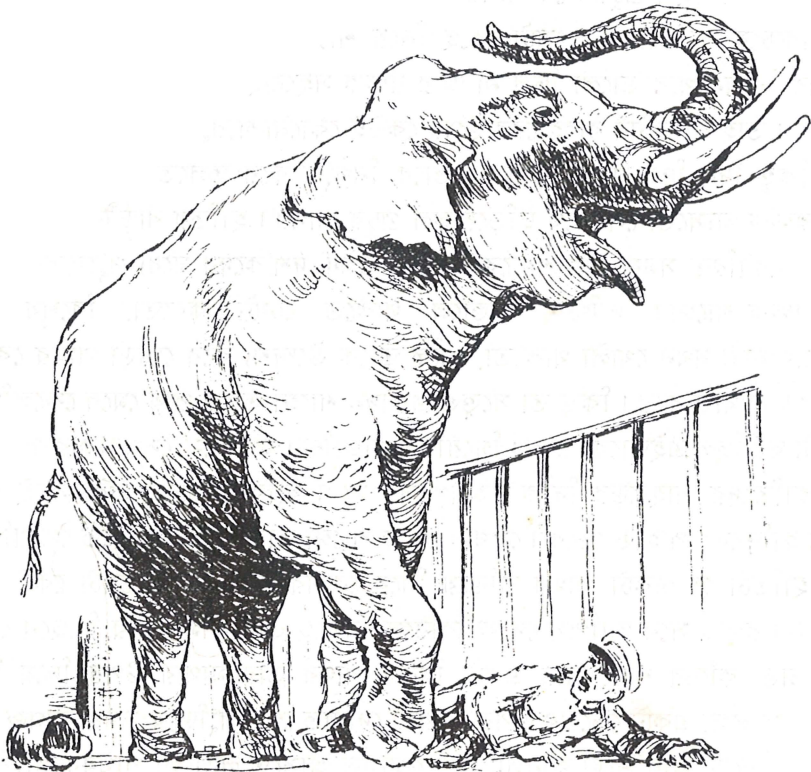
করতো অস্বীকার। রক্ষক হাতিটার খাবার সরিয়ে ফেলতো। পেটের জ্বালায় হাতিটাকে করতে হতো বশ্যতা স্বীকার। কিন্তু যে লোকটি শাঙ্গোকে হাতির বাড়ীতে বন্ধ করে রেখে তার বিরাগভাজন হয়েছিল তাকে শাঙ্গো চিনে রাখলো, ভুললো না।

শাঙ্গোর ঘৃণা

শাঙ্গো তার রক্ষককে অত্যন্ত অপছন্দ করতো, তাকে জ্বালাতন করার জন্যে সবকিছু সে করতো: তার দিকে সে শুঁড় নাড়তো আর ছুঁড়তো পাথর। হাতিদের পাহাড়ে পাথর ছিল প্রচুর। যে পাথরটা সবচেয়ে বড়ো আর যেটাকে তার শুঁড় দিয়ে ধরা সবচেয়ে সুবিধাজনক সেটা বেছে নিয়ে শাঙ্গো ছুঁড়তো। একথা অবশ্য ঠিক যে তার নিশান খুব ভালো ছিল না আর রক্ষক সহজেই পারতো সেগুলোকে পাশ কাটাতে। তাই হাতিটার ব্যবহারের উপর কেউই কোনো গুরুত্ব আরোপ করতো না।

কিন্তু দিন দিন শাঙ্গো তার দক্ষতাকে নিখুঁত করে তুলতে লাগলো। যে পথ দিয়ে রক্ষক আসতো সে পথে ছড়িয়েছিল প্রচুর পাথর। হাতির বাড়ীর প্রবেশ পথে শাঙ্গো নির্ধারিত সময় তার শত্রুকে করতো লক্ষ্য, দর্শকদের মধ্যে খুঁজতো তাকে।

রক্ষক শাঙ্গোর দৃষ্টির আড়ালে থাকতে চেষ্টা করতো, বিশেষ করে চিড়িয়াখানাটা যখন খোলা থাকতো, পাছে তাকে উদ্দেশ্য করে ছোঁড়া পাথর কোনো দর্শককে আঘাত করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একদিন শাঙ্গো তাকে প্রায় মেরে ফেলেছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল এইভাবে: রক্ষক গিয়েছিল খাজাঞ্চির আপিসে, সেখানকার জানলাটা ছিল হাতিদের পাহাড়ের দিকে। আপিসের মধ্যে যাকিছু ঘটছে সবকিছুই দেখা যেতো হাতিদের পাহাড় থেকে। সেখান থেকে শাঙ্গো তার শত্রুকে দেখতে পেয়েছিল।

হাতিটা যে একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে বেড়ার কাছে যাচ্ছে সেটা কেউ লক্ষ্য করে নি। রক্ষক সবে আপিস থেকে বেরিয়ে আসছে এমন সময় তার পিছনে শোনা গেল ভাঙা কাঁচের শব্দ, আর একটা বিরাট পাথর তার মাথার উপর দিয়ে গিয়ে শাঁ করে পড়লো একটা ডেস্কের উপর। একটা দোয়াত গেল গুঁড়িয়ে, সমস্ত কাগজ গেল কালিতে ভিজে, আর ভাঙা জানলা দিয়ে ক্রমাগত আসতে লাগলো পাথর। আপিসের

লোকেরা খোলা ফাইল দিয়ে নিজেদের মাথা বাঁচিয়ে কোনোমতে দৌড়ে পালালো ঘর থেকে। এদিকে শাঙ্গো, ইতিমধ্যে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠে, বহুক্ষণ ধরে ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে যেতে লাগলো পাথর।

এ ঘটনার পর স্থির করা হলো আবার হাতিটাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে। কিন্তু শাঙ্গো সেটা করতে দিলো না। যখন তাকে অন্য হাতিদের কাছ থেকে পৃথক করে ফেলা হলো তখন সে ভীষণ চটে উঠে হাতিদের বাড়ীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, শুঁড় দিয়ে আঘাত করে গর্জন করতে লাগলো, আর অবশেষে শুরু করলো পার্টিশানের ভারি ভারি শিকগুলোকে বাঁকাতে। সে তার বিরাট দাঁতগুলোকে তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো, আর আমরা দেখতে পেলাম তাদের চাপে একটা শিক ধীরে ধীরে বেঁকে গেল। শিকগুলোকে সে চললো বেঁকিয়ে যতক্ষণ না সে তার একটা দাঁতের ডগার দিকের সামান্য অংশ ফেললো ভেঙে। সেটা মড়মড় শব্দে ভেঙে গিয়ে পড়ে গেল, কিন্তু হাতিটা অন্য দাঁত দিয়ে শিকগুলোকে চললো বেঁকিয়ে। শাঙ্গো যাতে তার অন্য দাঁতটাকেও না ভেঙে ফেলে তার জন্যে অন্য হাতিদের কাছে তাকে যেতে আমাদের দিতেই হলো।

শুধু একটি মাত্র উপায় ছিল — ঘেরা জায়গা থেকে পাথরগুলো সরিয়ে ফেলা। সে কাজ করতে দশজন লোককে কয়েক দিন কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল। ঘেরা জায়গাটার সর্বত্র মাটি খুঁড়ে তারা কুড়িয়েছিল পাথরগুলো। তারপর চালুনি দিয়ে মাটিটাকে ঝেড়ে ক্ষুদ্রতম নুড়িগুলোকেও বাদ দিয়ে ফেলেছিল।

কিন্তু এতেও ফল হলো না। রুটি, বিট, গাজর, আলু — বলতে গেলে শাঙ্গোর এবং তার দলের সব খাবারগুলো হাতিটা ছুঁড়তো সেই রক্ষকের দিকে, যাকে সে ঘৃণা করতো। অবশেষে সেই লোকটিকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে হয়েছিল।

ধূর্ত শাঙ্গো

যে লোকটিকে সে ঘৃণা করতো তার চলে যাবার পর মনে হলো শাঙ্গো শান্ত হয়ে এসেছে। সে ঝগড়া করা থামালো আর এমন কি অন্যান্য পরিচারকদের সঙ্গে

ভালো ব্যবহার করতে শুরু করলো। দিনের অধিকাংশ সময় সে রোদ পোয়াতো, আর যখন খুব গরম হয়ে উঠতো তখন যেতো ডোবায় স্নান করতে। শাঙ্গো স্নান করতে ভালোবাসতো। সে অনেক গভীর জলে চলে যেতো। সেখানে সাঁতার কাটতো কিম্বা জলের তলায় ডুব দিয়ে চলে যেতো চোখের আড়ালে।

দর্শকরা হাতিটার স্নান দেখতে ভালোবাসতো। সে সময় সর্বদাই তাকে ঘিরে থাকতো লোকের ভিড়। চালাক জন্তুটা তার শুঁড়ে জল ভরে আগুন নেভানো নলের মতো জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিতো কৌতূহলী দর্শকদের। বিপদ দেখে লোকেরা গালাগালি দিতে দিতে দৌড়ে পালাতো, নোংরা জল ঝরে পড়তো তাদের জামাকাপড় থেকে। অনেকেই যেতো ম্যানেজারের কাছে নালিশ করতে।

এতো নালিশ আসতো যে ডোবার পাশে একজন রক্ষক মোতায়েন করতে হয়েছিল, দর্শকদের সাবধান করে দিতে যে শাঙ্গোর স্নান করার সময় তারা জলে ভিজে যেতে পারে। মনে হতো দর্শকদের আচমকা বিপদগ্রস্ত করতে শাঙ্গোর ভালো লাগতো। যখন তার এই আনন্দটা বন্ধ করে দেওয়া হলো তখন সে একটা নতুন ধরনের মজার খেলা আবিষ্কার করলো — দর্শকদের মাথা থেকে টুপি ছিনিয়ে নেওয়া। একথা মানতেই হবে যে সে এ কাজটা করতো অত্যন্ত দক্ষতা আর নিপুণতার সঙ্গে। তার শুঁড়টাকে বেড়ার উপর দিয়ে ঝুলিয়ে ধীরে ধীরে এপাশে ওপাশে দোলাতে দোলাতে সত্যি সত্যি সে দর্শকদের ভুলিয়ে কাছে নিয়ে আসতো। শুঁড়টাকে দেখাতো ঠিক একটা সাপের মতো, কখনো সেটা পাকিয়ে যেতো, কখনো থাকতো সোজা হয়ে, কিম্বা কখনো সেটা নিস্পন্দ হয়ে শুধু ঝুলে থাকতো বেড়ার উপর থেকে। হাতিটার ভালোমানুষের মতো ঝিমন্ত মুখের ভাব এবং বেড়ার উপর স্থির হয়ে পড়ে থাকা শুঁড়টা লোকদের আকর্ষিত করতো। তারা একেবারে বেড়ার কাছে চলে আসতো, স্পর্শ করতো শুঁড়টাকে, সেটাকে তুলে নিতো তাদের হাতে। মনে হতো হাতিটা কোনোকিছুই লক্ষ্য করছে না। কিন্তু যে মুহূর্তে কোনো অসাবধানী গুণমুগ্ধ দর্শক খুব কাছে আসতো শাঙ্গো তার শুঁড়টা সেই লোকটির মাথার উপর দিয়ে নাড়িয়ে হুম করে তার টুপিটা তুলে নিয়ে পুরতো নিজের মুখের মধ্যে। ব্যাপারটা বাস্তবিকই ছিল টুপিশিকার। এমন অনেক দিন গেছে যখন শাঙ্গো বেশ কতকগুলো করে টুপি খেয়ে ফেলতো।

বিশেষ করে শাঙ্গো পছন্দ করতো মেয়েদের রঙচঙে টুপি। একবার সে এক বয়স্কা মহিলার মাথায় একটা ভারি অদ্ভুত ধরনের টুপি দেখতে পেয়েছিল — তার কিনারাটা ছিল খুব চওড়া, আর তাতে একটা বড় উজ্জ্বল রঙের ফুল। হাতিটা সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে লক্ষ্য করে মহিলাটির দিকে গেল এগিয়ে, চেষ্টা করলো তাঁকে বেড়াটার কাছে নিয়ে আসতে।

বাধ্য দোকানদাররা যে রকম তাদের সওদা দেখায় সেই রকম ভাব দেখিয়ে ফন্দিবাজ হাতিটা মহিলার সামনে বেড়ার উপর রাখলো তার শুঁড়টা। মহিলাটি তাকে সন্দেহ করেন নি। তাদের মধ্যে কোনো দর্শক মুহূর্তের জন্যে এসে পড়লেই শাঙ্গো তার মুখের উপর নিশ্বাস ফেলে তাড়াচ্ছিল তাকে। টুপি পরা মহিলাটিকে যে হাতিটার পছন্দ সেটা এতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে সবাই তা লক্ষ্য করেছিল। অত্যন্ত গদ গদ হয়ে মহিলাটি খুব কাছে এসে 'কী মিষ্টি হাতি!' বলে তাঁর হাতটা বাড়ালেন তার দিকে। ঠিক এটাই চাইছিল 'মিষ্টি হাতিটা'। সে তাঁর মাথা থেকে টুপিটা ছিনিয়ে নিয়ে কেউ বাধা দেবার আগেই ধীরে ধীরে পুরলো সেটাকে মুখে।
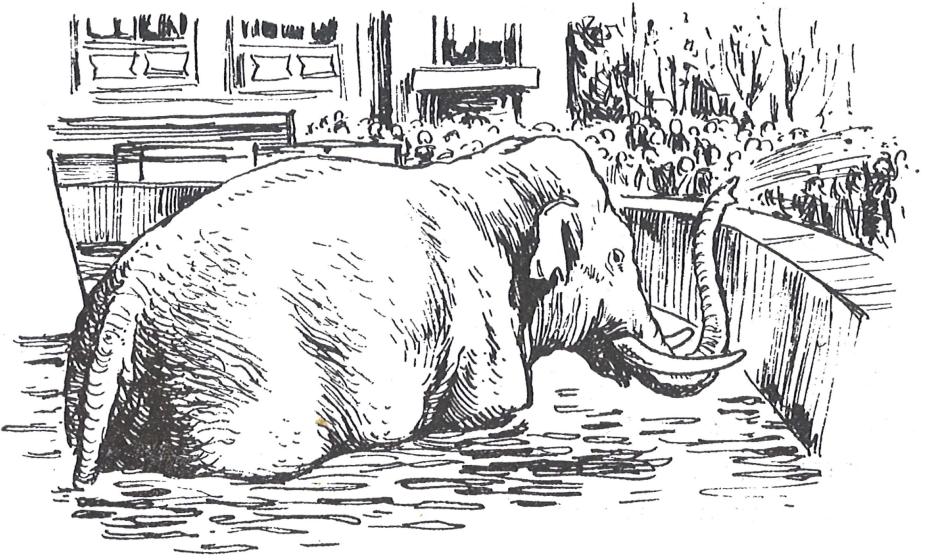
বৃথাই মহিলাটি চিৎকার করে চললেন আর শাঙ্গোর দিকে ছুঁড়তে লাগলেন পাথর। চওড়া কিনার আর ফুলওলা টুপিটা হাতিটার বিরাট গলার ভিতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। শাঙ্গো সেটাকে একেবারে খেয়ে ফেললো। এরপর থেকে শাঙ্গোর কাছে আরো অতিরিক্ত পরিচারক মোতায়েন করতে হলো।

আবার একলা

শাঙ্গো তখন যথারীতি রোদ পোয়াচ্ছিল। এমন সময় রেডিয়ো মারফৎ যুদ্ধের খবর এলো। সম্ভবত হাতিটাও বুঝতে পেরেছিল যে সেদিন থেকে সবকিছুই বদলে গেছে।

প্রথমত, চিড়িয়াখানায় প্রায় কোনো দর্শকই আসতো না, পরিচিত পুরুষ পরিচারকরা অকস্মাৎ হলো অদৃশ্য, তাদের স্থান গ্রহণ করলো মেয়েরা।

চিড়িয়াখানার সর্বত্র পরিখা খোঁড়া হলো।

তারপর শুরু হলো বিপদসূচক সঙ্কেত ধ্বনি।

সহরের সাধারণ গোলমালকে ছাপিয়ে উঠতে লাগলো সাইরেনের তীক্ষ্ন কান্নার মতো স্বর। যতক্ষণ না সমস্ত সহর সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়তো ততক্ষণ সেগুলো বেজে চলতো তীক্ষ্ন থেকে তীক্ষ্নতর স্বরে। আর যেমন আচমকা তা শুরু হতো তেমনি হঠাৎ যেতো থেমে।

শাঙ্গো আগে কখনো সাইরেনের শব্দ শুনে নি। সেটা কোনো জন্তুর আর্তনাদের মতো নয়, সহর থেকে সাধারণত যেরকম শব্দ আসে সেরকমও নয়। কোনো কারণে আওয়াজটা শুনে সে অস্বস্তি বোধ করতো। মনে হতো সবকিছুই যেন এই শব্দের উপর নির্ভর করছে — কারণ দিনের মধ্যে একাধিকবার হাতিদের তাদের বাড়ীর মধ্যে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হতো আর মাঝে মাঝে তাদের একেবারেই বাইরে আসতে দেওয়া হতো না।

একবার হাতিদের সমস্ত রাত ধরে তাদের ঘরের বাইরে রাখা হয়েছিল। সেবার সাইরেনের শব্দের পর ফাঁকা বিস্ফোরণ শুরু করেছিল মাটিকে কাঁপাতে। হাতিরা

বাড়ীর দেয়ালের গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, এমন সময় অকস্মাৎ কি একটা জিনিস ঘেরা জায়গাটার মধ্যে তাদের খুব কাছে হুস করে এসে পড়লো। সেটা ছিল একটা আগুন-বোমা।

সেটা সেখানে পড়ে হুস হুস করতে করতে তরল আগুন ছুঁড়তে লাগলো। জ্বলন্ত আগুনের স্রোত চারিদিকে ঝরতে লাগলো, ভয় হলো বাড়ীটায় আগুন ধরে যাবে।

শাঙ্গো জানতো আগুন কী। ছোট্ট চিড়িয়াখানায় সে শিখেছিল আগুন ছুঁতে নেই, তাকে ভয় করতেও নেই। কিন্তু এই ছোট জ্বলন্ত জিনিসটার মধ্যে সে চিনতে পারলো এক শত্রুকে। এই শত্রুর কাছ থেকে আত্মরক্ষা করতেই হবে, কিন্তু তাকে কখনোই সে স্পর্শ করবে না। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সে তার শুঁড় দিয়ে একটা পাথর খুঁজতে লাগলো সেটার দিকে ছোঁড়ার জন্যে, কিন্তু একটা পাথরও সেখানে ছিল না। শাঙ্গো তখন তার শুঁড় দিয়ে খানিকটা বালি জড়ো করে ছিটোতে লাগলো বোমাটার উপর। মনে হলো আগুনের শিখাগুলো যেন কমে গেছে। সে আরো বালি ছুঁড়লো, আরো বালি, সে ক্রমাগত বালি ছিটিয়ে চললো যতক্ষণ না আগুনটা গেল নিভে। বোমাটা যেখানে পড়েছিল সেখানে একটা ছোট ঢিবি ছাড়া আর কিছুই রইলো না। তারপর শাঙ্গো এমন ব্যবহার করলো যা সবচেয়ে ঘৃণিত শত্রুদের প্রতি তার জাতের সবাই সর্বদাই করে এসেছে: সে সেই ঢিবিটার উপর দাঁড়িয়ে পা দিয়ে সেটাকে লাগলো থ্যাঁৎলাতে যতক্ষণ না সেটা মিশিয়ে গেল মাটিতে।

এরপর স্থির করা হলো যে অন্যান্য জন্তুদের সঙ্গে হাতিদেরও মস্কো থেকে স্থানান্তরিত করা হবে। কিন্তু শাঙ্গো এমন উত্তেজিত অবস্থায় ছিল যে তাকে পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ হবে বলে মনে হলো না। তাকে চিড়িয়াখানায় রাখতে হলো। কিন্তু তাকে একা রাখা হলো না।

যখন জিন্‌দাউকে বাইরে বার করার চেষ্টা করা হলো শাঙ্গো কিছুতেই তার বান্ধবীকে ছেড়ে দিতে চাইলো না। তার পাশ থেকে তাকে সে নড়তে দিলো না, এমন কি পরিচারকরা যে খাবার দিয়ে তাকে ভুলিয়ে বাড়ী থেকে বার করার চেষ্টা করেছিল সেই খাবারের কাছেও তাকে সে যেতে দিলো না। তাই তাদের দুজনকেই চিড়িয়াখানায় থাকতে হলো।

কিন্তু খুব বেশী দিন তারা একত্র থাকে নি। অল্পদিন পরেই জিন্‌দাঙ অসুস্থ হয়ে পড়লো। আর সে ডোবায় স্নান করতো না, নিজের উপর ছিটোতো না বালি। সমস্ত দিন ধরে সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতো, বিষণ্ণভাবে ঝুলে থাকতো তার মাথাটা।

বান্ধবীর ব্যবহারে শাঙ্গো চিন্তিত হয়ে পড়লো। সে চেষ্টা করলো তাকে খেলায় নামাতে। তাকে সে ঠেলতো, যেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছে দৌড়োবার। কিন্তু জিন্‌দাউ নড়তো না।

সে দুর্বল ও করুণ গলায় চিৎকার করতো, আর শাঙ্গো যখন তাকে একা থাকতে দিতো না তখন সে দূরে সরে যেতো। কয়েক দিনের মধ্যেই শাঙ্গো বুঝতে পারলো যে তার বান্ধবীর কিছু একটা গোলমাল হয়েছে, তাকে বিরক্ত করা সে থামালো।

দিনে দিনে জিনদাউর অবস্থা খারাপ হতে থাকলো। সবচেয়ে মুখরোচক খাদ্যও সে খেতো না। ডাক্তার তার কিছুই করতে পারলো না।

লোকে বলে যে হাতিরা অসুস্থ হয়ে পড়লে কখনো শুয়ে পড়ে না, তারা ভয় পায় যে ভারি শরীরের দরুণ কখনও আর পায়ের উপর খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। কথাটা সত্যি কিনা কে জানে, তবে জিন্‌দাউও শোয়া বন্ধ করলো। দেয়ালে হেলান দিয়ে সে ঘুমতো, আর যখন চলতো তখন কষ্টে টেনে নিয়ে যেতো তার পাগুলো।

তা সত্ত্বেও সে বাতাস আর রৌদ্রের প্রয়োজন অনুভব করতো। একদিন সে চেষ্টা করলো বাইরে যেতে, দরজার দিকে গেল কয়েক পা, আর অকস্মাৎ মেঝের উপর পড়ে গেল দড়াম করে, এবং সেখানেই রইলো শুয়ে।

শাঙ্গো চঞ্চল হয়ে উঠলো।

সে জিন্‌দাউর কাছে ছুটে গিয়ে চেষ্টা করলো তাকে দাঁড়াতে সাহায্য করতে। কিন্তু জিন্‌দাউ উঠতে পারলো না। শাঙ্গো তখন চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল পাশের বাড়ীতে। কী ঘটেছে বুঝতে পেরে পরিচারকরা সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দিলো। কয়েক দিন শাঙ্গোকে রাখা হলো ঘরের মধ্যে। তখন সব সময় সে চিৎকার করতো, অনর্থক ডাকতো তার বান্ধবীকে। যখন তাকে ফাঁকা ঘেরা জায়গাটায় ছেড়ে দেওয়া হলো দেখা গেলো সেই ক'দিনেই সে কী রকম রোগা হয়ে গেছে।

শাঙ্গো জিন্দাউকে খুঁজলো না। যথারীতি সে গেল তার প্রিয় পাহাড়টায়। কিছুক্ষণ সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর ধীরে ধীরে সে নামাতে লাগলো তার মাথাটা। সেটা ক্রমশ নীচের দিকে ঝুলে পড়তে লাগলো, তার দাঁতগুলো স্পর্শ করলো মাটি, তারপর নতজানু হয়ে বসে নরম মাটির ভিতর যতদূর যায় সে চালিয়ে দিলো তার দাঁতগুলোকে।

এ অবস্থায় সে বহুক্ষণ রইলো, একটুও নড়লো না। শাঙ্গোকে দেখে আমার মনে হল বিভিন্ন জন্তু কী বিভিন্নভাবেই না তাদের শোক প্রকাশ করে থাকে।

একলা পড়ে শাঙ্গো আবার বিষণ্ণ হয়ে পড়লো। একই জায়গায় সে দাঁড়িয়ে থাকতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কিম্বা তার শুঁড়টা বাড়িয়ে অন্যমনস্কভাবে বেড়ার ওপারের দর্শকদের পাশ দিয়ে যেতো হেঁটে। সে যে ঘেরা জায়গায় থাকতো কোনো পরিচারকই তার মধ্যে যেতে সাহস করতো না — এমন ক্রুদ্ধভাবে সে আক্রমণ করতো তাদের।
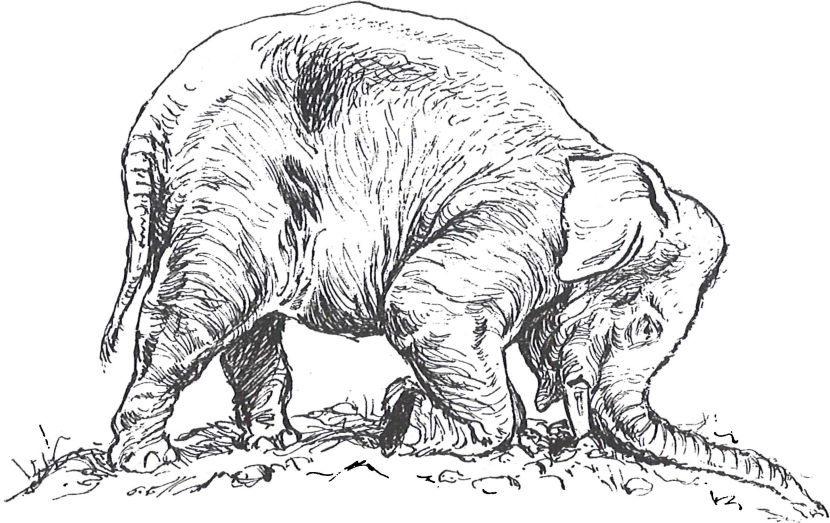
মলি

কয়েক বছর কেটে গেল। যুদ্ধ হলো শেষ। শূন্য চিড়িয়াখানাটা আবার ভরে উঠতে লাগলো জন্তুতে। আমাদের কাছে নতুন একটি মেয়ে হাতি এলো। তার নাম মলি। সে বেশ পোষ-মানা আর বাধ্য ছিল। স্টেশন থেকে চিড়িয়াখানা পর্যন্ত সারাটা পথ সে চললো শান্তভাবে; এবং তেমনি শান্তভাবেই ঢুকলো হাতির বাড়ীতে।

শাঙ্গোর থেকে আলাদা করে তাকে একলা একটা বাড়ীতে রাখা হলো।

মলিকে লক্ষ্য করার সঙ্গে সঙ্গেই শাঙ্গো উত্তেজনার ভাব প্রকাশ করতে লাগলো। যে পার্টিশানের ওপাশে মলি ছিল সেই পার্টিশানটা সে ছেড়ে যেতো না, শিকগুলোর মাঝখান দিয়ে সে গুঁজে দিতো তার শুঁড়টা আর তাকে স্পর্শ করার ব্যর্থ চেষ্টা করতো।

এই বিরাট অপরিচিত হাতিটাকে দেখে মলি ভয় পেয়ে গেল। তার ধারেকাছেও সে গেল না। পার্টিশান থেকে সরে দাঁড়িয়ে সে ধীরে ধীরে তাকে দেওয়া খাবারগুলো চিবোতে লাগলো। কিন্তু শাঙ্গো তার খাবার স্পর্শ করলো না। ক্রমাগতই সে পার্টিশানটার কাছে গিয়ে ফিরে ফিরে আসতে লাগলো। তারপর অকস্মাৎ একটা রুটি তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলো মলির দিকে।

বলা কঠিন শাঙ্গো কেন একাজ করেছিল। হয়তো শুধুই সে চেয়েছিল তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে। কিন্তু সতর্কভাবে তাকাতে তাকাতে মলি যখন রুটিটার কাছে গেল শাঙ্গো তখন শিকগুলোর ভিতর দিয়ে সাবধানে তার শুঁড়টা ঢুকিয়ে মলিকে সেটা দিয়ে চাপড়াতে শুরু করলো।

এরপর থেকে মলি আর তার প্রতিবেশীকে ভয় পেতো না। কয়েক দিন পরে তাদের একত্র ঘেরা জায়গাটার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হলো।

ছটফটে শাঙ্গোর উপর পোষ-মানা স্নেহশীলা মলি বেশ ভালো রকম প্রভাব বিস্তার করলো।

এমন কি তার নিজের ধরনে মলি শাঙ্গোর চালচলনের উন্নতি সাধন করলো। শাঙ্গো যখন রক্ষিকার দিকে ছুটে যেতো তখন মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতো মলি, শাঙ্গো যে সেই মেয়েটিকে আঘাত করবে তা সে দিতো না।

পরিচারকরা এই মধ্যস্থতায় উপকৃত হয়েছিল। ঘেরা জায়গাটা পরিষ্কার করার সময় তারা আর শাঙ্গোকে তালা বন্ধ করে রাখতো না। তারা মলিকে ডেকে তার 'পাহারায়' জায়গাটাকে পরিষ্কার করতো, ঝাঁট দিতো আর হাতিদের দিতো খাবার।

পরিচারকদের যে তার স্পর্শ করা উচিত নয় একথাটায় ক্রমশ শাঙ্গো অভ্যস্ত হয়ে পড়লো। তাদের আক্রমণ করা সে থামালো। তার বদমেজাজ নিয়ে আর কেউ অভিযোগ করলো না।

ছোট্ট মস্কোবাসী

হাতিরা একত্র থাকার তৃতীয় বছরে চিড়িয়াখানায় ঘটলো একটা স্মরণীয় ঘটনা — মলি একটি বাচ্চা প্রসব করলো।

বন্দী অবস্থায় হাতির জন্ম এই প্রথম।

বাচ্চাটি জন্মেছিল রাত্রে। সকালে যখন পরিচারকরা পেঁছুলো তখন বাচ্চাটি দাঁড়িয়ে ছিল তার মায়ের পেটের নীচে, আর শাঙ্গো সরে গিয়েছিল একেবারে দূরে। নিঃসন্দেহে মলি তাকে সেখানে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কারণ যখনই সে আসার চেষ্টা করছিল মলি উঠছিল রেগে চিৎকার করে আর সে তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছিল।

মলিকে শান্ত করার জন্যে হাতিদের পৃথক করা প্রয়োজন হয়ে পড়লো। মা আর বাচ্চা যেখানে ছিল সেখানেই রইলো, শাঙ্গোকে সরানো হলো পরের বাড়ীটাতে। এ ব্যাপারেও কোনো অসুবিধে হলো না। কড়া গিন্নীর কাছ থেকে পালাতে পেরে শাঙ্গো স্পষ্টই খুসি হয়ে উঠলো। ফটকটা খুলতে না খুলতেই দৌড়ে সে পালালো মলির পাশ দিয়ে, কিন্তু মলির শুঁড়ের একটা জোর বাড়ি সে এড়াতে পারলো না।

শাঙ্গোকে সরাবার পর মনে হলো মলি বেশ শান্ত হয়েছে। আর সে খুব উৎকণ্ঠিতভাবে তার বাচ্চাকে আগলাতো না। এমন কি পরিচারকদেরও কাছে গিয়ে তাকে ছুঁতে দিতো।

জন্মের পরদিন থেকেই বাচ্চা হাতিটা পায়ে ভালভাবে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে

পারতো। এমন কি সে সাহস করে তার মায়ের কাছ ছেড়ে ক্রমাগত সেই পার্টিশানটার কাছে গা ঘষতে লাগলো। পার্টিশানটার ওপাশে ছিল শাঙ্গো।

শাঙ্গো নিজেও বাচ্চাটির উপর গভীর মনোযোগ দিতো। শিকগুলোর ভিতর দিয়ে তার বিরাট শুঁড়টা তার দিকে বাড়িয়ে দিতো। আর ক্রমাগত চেষ্টা করতো তাকে ছুঁতে।

মলি কিন্তু সতর্কভাবে বাচ্চাটিকে পাহারা দিতো, কখনো তাকে নিজের কাছ ছাড়া হতে দিতো না। সে যদি তার কাছ থেকে সামান্য সরে যেতো সে পথ আগলে শুঁড় দিয়ে তাকে বেঁধে আনতো নিজের পেটের তলায়।

এরূপ যত্ন বাচ্চাটির খুব পছন্দ হতো না। চারিদিকে কত সব মজার জিনিস রয়েছে, সে চায় খালি দৌড়োদৌড়ি করে খেলতে — আর মার কিনা সব সময় তাকে আঁচলে বেঁধে রাখা। বিরক্তিতে সে চিৎকার করতো, মাটিতে ঠুকতো তার পা আর চেষ্টা করতো দৌড়ে পালাতে।

ধীরে ধীরে মলি তাকে তার কাছ ছাড়া হয়ে খেলতে দিতে শুরু করলো। বাচ্চাটিকে খেলতে দেখতে ভারি মজা লাগতো — লাফাতো, পা ঘষতো, পা ঠুকতো, মায়ের চারিপাশে হুটোপাটি করতো নড়বড় করে। সর্বক্ষণ সে জ্বালাতন করতো মলিকে, তার শুঁড় দিয়ে সে মলির পা কিম্বা ল্যাজ ধরতো জড়িয়ে, আর মলি যখন খেতো তখন তার মুখের মধ্যে নিজের শুঁড়টা সে ঢুকিয়ে দিতো নির্লজ্জের মতো, চেষ্টা করতো নিজেও খানিকটা বাগাতে।

যখন সে ঘেরা জায়গাটার মধ্যে দৌড়োতে শুরু করলো তখন প্রায়ই সে যেতো সেই পার্টিশানটার কাছে, যার ওদিকে ছিল শাঙ্গো। একদিন মলি যখন খেতে ব্যস্ত তখন বাচ্চা হাতিটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে শিকগুলোর ভিতর দিয়ে গলে গিয়ে পার্টিশানের ওপাশে হাজির হলো।

তাকে দেখে শাঙ্গো মুগ্ধ হয়ে গেলো। তাকে সে স্পর্শ করতে লাগলো শুঁড় দিয়ে আর লাগলো শুঁকতে... বাচ্চাটা একেবারেই ভয় পেলো না। সে শাঙ্গোর সঙ্গে খেলতে লাগলো, ধরতে লাগলো তার দাঁতগুলো, ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো তার উপর, আর সেই বিরাট শক্তিশালী হাতিটা সাবধানে এক পা এক পা করে সরে যেতে লাগলো, বাচ্চাটার যাতে আঘাত না লাগে।

কিন্তু শাঙ্গোর পাশে তার বাচ্চাকে দেখে মলির কী ভয়! শুঁড় তুলে সে ছুটে গেল পার্টিশানটার কাছে আর শুরু করলো উৎকণ্ঠিত চিৎকার।

মলির ডাকে অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বাচ্চাটা ফিরে এলো। মলি তাকে স্পর্শ করলো, তার সর্বাঙ্গ শুঁকলো, আর অবশেষে যখন দেখলো যে তার কোনো অপকার হয় নি তখন তাকে সম্ভবত সাজা দেবার জন্যেই নিয়ে এলো নিজের পেটের তলায়।

তবে সেদিন থেকে বাচ্চা হাতিটা শাঙ্গোর কাছে আরো ঘন ঘন যেতে শুরু করলো।

এ ব্যাপারে মলি ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। তখন স্থির করা হলো পার্টিশানের দরজাটা খুলে দেওয়া হবে, যাতে হাতিরা একসঙ্গে থাকতে পারে।

ততদিনে বাচ্চাটা বেশ বড় হয়ে উঠেছে। মায়ের পেটের তলায় সে আর প্রায় দাঁড়াতেই পারে না। কিন্তু আগের মতোই সে ছিল ফুর্তিবাজ আর আমোদপ্রিয়। কত রকমের তার খেলা! যে জিনিসই কাছে পেতো তা-ই সে শুঁড় দিয়ে দক্ষতার সঙ্গে ছিনিয়ে নিতে শিখেছিল।

হাতিদের জন্যে যখন শব্জী আনা হতো তখন বাচ্চাটা ছুটে গিয়ে বালতি থেকে শুঁড় দিয়ে একটা বিট তুলে নিয়ে বল খেলতে শুরু করতো: মাটির উপর বিটটাকে গড়িয়ে দিয়ে লাথি মারতে মারতে ছুটতো তার পিছন পিছন। কিম্বা বিটটাকে সে মাড়িয়ে থেঁতো করে তার উপর দিয়ে পিছলে যেতো যেন স্কেট করছে। যখন ভূষি এনে গামলায় ঢালা হতো বাচ্চাটা তার মধ্যে চলে গিয়ে ভূষিগুলোকে পা দিয়ে চটকাতো, কিম্বা ভূষির উপর এমনভাবে বসতো যেন সেটা পালকের গদি — উঠে আসতে চাইতো না। তার মা দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করতো, কতক্ষণে বাচ্চার খেলা শেষ হয়।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সে মা-বাবার খাওয়ার সময় খেলা শুরু করতো ও খেতে তাদের দিতো বাধা।

একদিন হাতিদের খড় দেবার পর বাচ্চাটা তার উপর শুয়ে গড়াতে শুরু করলো। এমন কি মাথা নুইয়ে খড়গুলোর উপর কপালে ভর দিয়ে টলমল করতে করতে পেছনের একটা পা তুলে ডিগ্‌বাজি খেতেও চেষ্টা করলো। অনেকক্ষণ সে

খেললো। তার খেলা শেষ করার আর তাকে খেতে দেবার জন্যে মলি ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইলো।

কিন্তু শাঙ্গোর অত ধৈর্য ছিল না। সে বাচ্চাটার কাছে গিয়ে তার তলা থেকে খানিকটা খড় টেনে বার করতে চেষ্টা করলো, এমন কি চেষ্টা করলো শুঁড় দিয়ে সেই দুরন্ত বাচ্চাটাকে তুলতে। কিন্তু বাচ্চাটা দাঁড়াতে একেবারেই রাজী নয়। শাঙ্গো তখন বাচ্চাটার ল্যাজটা শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে বেশ ভালো রকম একটা টান দিলো। বাচ্চাটা উঠলো লাফিয়ে। শাঙ্গো তার কানটা খামচে দিলো, আর তাকে সরিয়ে নিয়ে গেল এক পাশে। তারপর সে ফিরে এসে শান্তভাবে খেতে লাগলো।

এই শাস্তিতে দুষ্টু বাচ্চাটার শিক্ষা হয়েছিল। এরপর থেকে শাঙ্গো গামলাটার কাছে গেলেই বাচ্চাটা সঙ্গে সঙ্গে খেলা থামিয়ে সামনে থেকে সরে যেতো।

বাচ্চাটা ছিল দারুণ চঞ্চল। বাবা-মাকে খেলায় নামাতে না পারলে পরিচারিকাটিকে সে জ্বালাতন করতো।

মেয়েটি ঘেরা জায়গাটায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বাচ্চা হাতিটা যত জোরে পারতো ছুটে যেতো তার দিকে। তার প্রথম কাজ ছিল মেয়েটির জামার পকেটে শুঁড়টা ঢুকিয়ে দেওয়া — মেয়েটির পকেটে সব সময় বাচ্চাটার জন্যে এক ডেলা চিনি থাকতো।

বাচ্চাটা চিনির ডেলাটি বার করে মুখে পুরতো। তারপর সে খেলার আমন্ত্রণ জানিয়ে মেয়েটির জামা, স্কার্ট, কিম্বা জ্যাকেট ধরে টানাটানি শুরু করতো। প্রথমে সে সামনের পা, পরে পিছনের একটা পা মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিতো চুলকে দেওয়ার জন্যে, মাঝে মাঝে গাটাও এগিয়ে দিতো।

একদিন সেই পরিচারিকা একটা নতুন বার্চের ঝাঁটা নিয়ে বাচ্চা হাতিটাকে ঘষতে শুরু করলো। বাচ্চা হাতির তা খুব পছন্দ হলো, প্রথমে সে এক পাশে ঘুরলো, তারপর অন্য পাশে, শেষকালে হঠাৎ ঝাঁটাটাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল দৌড়ে পালিয়ে। তারপর সেটা নিয়ে তার কী ফুর্তি! মেঝের উপর ঝাঁটাটাকে শাঁ শাঁ করে ঘুরিয়ে চতুর্দিকে কাঠের গুঁড়ো উড়িয়ে দিলো। তারপর উপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিলো, আবার ছুঁড়ে দিলো, শেষকালে সেটা নাড়াতে নাড়াতে হঠাৎ শাঙ্গোকে কসিয়ে দিলো এক ঘা।

শাঙ্গো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই খেলাটা থামিয়ে দিলো। ঝাঁটাটাকে ছিনিয়ে নিয়ে শুঁড়ে করে নিজের মুখের মধ্যে পুরে সেটাকে সে গিলে ফেললো। তার মুখে চোখে ফুটে উঠলো বেশ একটা তৃপ্তির ভাব। সেখানেই শেষ হলো খেলাটা।

বাচ্চাটা যখন খুব ছোট তখন তাকে নানা রকম নাম দেওয়া হয়েছিল। একজন পরিচারক তাকে ডাকতো 'মিলোক' (আদুরে) বলে, আর একজন 'সিনোক্' (ছেলে) বলে, আর তৃতীয় জন নাম রেখেছিল 'মালীশ' (বাচ্চা)।

বাচ্চাটার যখন একবছর বয়স তখন সময় হলো তার আসল নামকরণের। বাচ্চা হাতিটার জন্যে ভালো গোছের একটা নাম খুঁজতে চিড়িয়াখানার কর্মচারীদের অনেক সময় লেগেছিল। অবশেষে বহু তর্কাতর্কির পর বাছা হলো 'মস্কভিচ্' (মস্কোবাসী) নামটা। এটাই ছিল সবচেয়ে লাগসই নাম, কারণ সে জন্মেছিল মস্কোর চিড়িয়াখানায়।

মস্কভিচের বয়েস যখন তিন বছর সে এতো বড় হয়ে উঠেছিল যে তাকে দেখাতো প্রায় তার মায়ের মতো লম্বা। সে আগের মতোই দুষ্টু থেকে গেল, তবে শাঙ্গোকে সে মানতো। হাতি পরিবারটি সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগলো চিড়িয়াখানায়।

মারিয়াম ও জেক

একবার একদল সীমান্তরক্ষী হঠাৎ এক ভালুকের মুখোমুখি হয়। লোক দেখে তেড়ে আসে ভালুক।

গুড়ুম-গুম — চললো গুলি। জানোয়ার গর্জে উঠে এগিয়ে এলো কয়েক পা, তারপর গেল পড়ে।

লোকেরা নিহত জন্তুর কাছে এলো। তার থেকে কয়েক পা দূরেই দেখে একটি ভালুকছানাকে। ভড়কে গিয়ে চারিদিকে তাকালো ছানাটি, খুঁজতে লাগলো মাকে।

সীমান্তরক্ষীরা বাচ্চাটিকে ক্যাম্পে নিয়ে আসে। তারা তাকে নাম দেয় মারিয়াম।

মারিয়াম ছিল খুবই ছোটো। যখন পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায় তখন এমন কি সার্জেণ্ট পেত্রোভের হাঁটুরও নাগাল পায় না। এই পেত্রোভই ছানাটির দেখাশোনা করতো। মারিয়ামকে সে বোতল দিয়ে দুধ খাওয়াতো, শোয়াতোও নিজের কামরায়। পালিত সন্তানকে খুব ভালোবাসে পেত্রোভ, অবসর সময়ের সবটুকুই সে কাটায় তার সঙ্গে।

তবে ভালুকছানাটির উপর শুধু পেত্রোভেরই যে এতো মায়া তা নয়। শিগ্গির সবাই মারিয়ামকে ভালোবেসে ফেললো। আর এমন সুন্দর, এমন সোহাগী ছানাটিকে ভালো না বেসে কি পারা যায়!

মারিয়ামও সকালে সব সৈনিকদের সঙ্গে ঘুম থেকে উঠতো। ঘুম থেকে ওঠার ঘণ্টি শুনেই সে খাট থেকে নেমে দৌড়তো ব্যায়াম করতে, আর নাস্তার সময় হলে চাইতো সবার সঙ্গে গিয়ে বসতে। তবে খাবার ঘরে তাকে ঢোকানো হতো না। দরজাতে ছিটকিনি না লাগালে তক্ষুনি থাবা দিয়ে খুলে তীরবেগে ছুটতো টেবিলের দিকে। আর ওখান থেকে তাকে বের করা ছিল দারুণ মুশকিলের ব্যাপার!

ভালুকছানাটি ভীষণ চেঁচাতো, যেতে চাইতো না আর এমন হাস্যকরভাবে খাবার চাইতো যে সবাই ক্ষুদে ভিখারিনীটিকে মিষ্টি কিছু-না-কিছু দিতে চেষ্টা করতো।
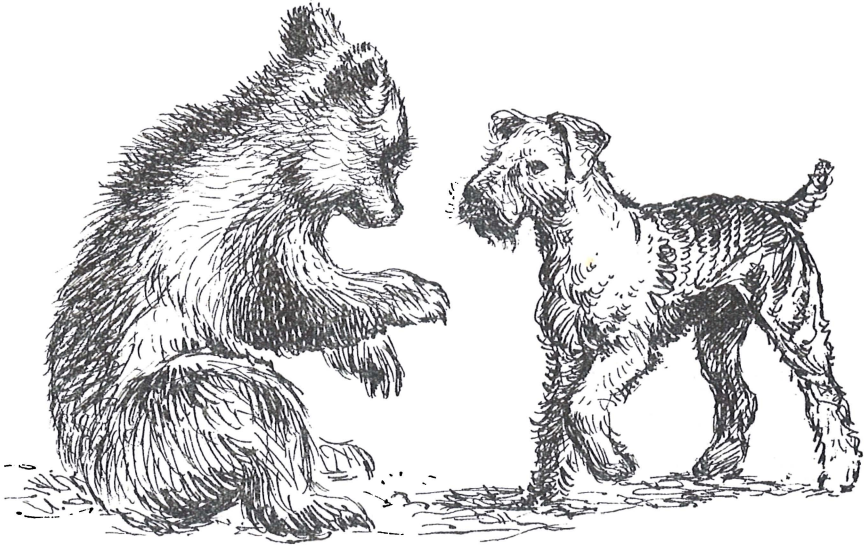
মারিয়াম ছিল পোষ-মানা ভালুক। তাছাড়া সে অতি নরম স্বভাবের — এমনটি সচরাচর হয় না। সাধারণত ভালুকরা হয় ভীষণ রাগী, চঞ্চল এবং যেকোনো মুহূর্তে তারা নিজের মালিককেও কামড়াতে পারে। তবে মারিয়াম কিন্তু মোটেই সেরকম নয়।

জুলাই পর্যন্ত ভালুকছানা থাকলো ক্যাম্পে। জুলাই মাসে — তখন মারিয়ামের বয়স চার মাস — তার পালক পেত্রোভ চলে যায় ছুটিতে। মস্কো হয়ে যাওয়ার পথে সে মারিয়ামকে উপহার হিসেবে দিয়ে যায় মস্কো চিড়িয়াখানায়।

ডরকো মারিয়াম

মারিয়াম যখন চিড়িয়াখানায় এলো তাকে রাখা হলো অন্যান্য পশুশাবকদের সঙ্গে। হরেকরকম জানোয়ারের বাচ্চা সেখানে: ডিঙ্গো, শেয়াল, নেকড়ে, সিংহ আর কয়েকটি ভালুক। নতুন একটা প্রাণীকে দেখে জলদি তারা ছুটলো তার দিকে।

সবাই তার সঙ্গে চাইলো আলাপ করতে, খেলতে। মারিয়াম কিন্তু আচমকা ঘাবড়ে গেল। এর আগে সে কখনো কোনো জন্তুছানা দেখে নি, এগুলোকে দেখে চেঁচিয়ে উঠে দিলো এক দৌড়। তাতে অন্যান্য বাচ্চারা ভাবলো মারিয়াম বুঝি খেলতে চাইছে, তাই তারাও ছুটলো তার পেছন পেছন।

আঙ্গিনার চারদিকে দু'টি চক্কর দিয়ে মারিয়াম এক কোণে ঢুকে ভয়ে জড়সড়ো হয়ে বসে রইলো। তারই সমবয়সী ভালুকছানারা যখন তার কাছে এলো, সে উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলো, দিলো হুমকি।

ভালুকছানা আর অন্যান্যরা দেখলো, মারিয়াম তাদের সঙ্গে আলাপ করতে নারাজ। তারা সরে গেল। তখন তারা নিজেদের মধ্যে খেলতে লাগলো, মারিয়ামের দিকে আর তাকালোই না।

সারাটি দিন মারিয়াম ঐ কোণেই কাটালো। ছানারা দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে যখন বিশ্রাম করতে শুয়ে পড়লো সে বেরুলো ওখান থেকে। আঙ্গিনায় ঘুমিয়ে থাকা বাচ্চাদের মধ্য দিয়ে সে হাটাহাটি করলো, চেঁচালো, আর তারা যখন উঠলো সে আবার লুকিয়ে গেল কোণে।

পরের দিনও ঠিক তাই ঘটলো। চিড়িয়াখানার কর্মীরা বার কয়েক চেষ্টা করলো অন্যান্য পশুশাবকদের সঙ্গে ভালুকছানার দোস্তি করিয়ে দিতে, কিন্তু মারিয়াম যেহেতু ছিল পোষ-মানা ও মানুষ ভালোবাসতো, সে জন্তুদের সঙ্গে কিছুতেই আলাপ করতে চাইলো না। সারা সময়ই সে ঐ কোণে লুকিয়ে থাকতো, আর রাত্রে করুণ সুরে চেঁচাতো, দরজা ধরে করতো টানাটানি। ওখান থেকে তাকে সরাতে হলো শেষ পর্যন্ত।

নতুন জায়গায়

মারিয়ামের থাকার নতুন জায়গাটা ছিল বেড়া দিয়ে ঘেরা একটি ছোটো আঙ্গিনা। তার এক দিকে লম্বা সারি দিয়ে রাখা কয়েকটি খাঁচা। ওগুলোতে থাকতো বিভিন্ন জন্তুজানোয়ার।

প্রথমে মারিয়ামকে রাখা হয় খাঁচায়। কিন্তু সে খাঁচায় থাকে নি কোনোদিন, স্বাধীনভাবে মানুষের মধ্যে বড়ো হয়েছে, তাই কোনো মতেই সে বন্দী জীবনে অভ্যস্ত হতে পারলো না। সমস্ত দিন সে শুয়ে থাকতো শিকের কাছে, করুণ সুরে গোঙাতো আর প্রায় কিছুই খেতো না। বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক — গালিনা গ্রিগোরিয়েভনার কষ্ট হলো ভালুকছানাটির জন্যে। তিনি ঠিক করলেন তাকে আঙ্গিনায় ছেড়ে দেবেন, ওখানে সে খুশিমতো দৌড়াদৌড়ি ও খেলাধুলা করতে পারবে।

ছাড়া পেয়ে মারিয়ামের কী আনন্দ! যাকিছু খেলাধুলা সে জানতো সবই তার মনে পড়লো: পেছনের পায়ে হাঁটলো, ডিগবাজি খেলো কিংবা সামনের থাবা বাড়িয়ে খাবার চাইলো।

এ সবকিছু তার উৎরাতো অতি চমৎকার। তার আচার-আচরণও ছিল খুব ভদ্র, একেবারেই ভালুকের মতো নয়। তাই তাকে শুধু রাত্রেই রাখা হতো খাঁচায়।

বাকি সময় মারিয়াম কাটাতো আঙ্গিনায় কিংবা অফিসঘরে।

ভালুকছানা ছিল খুব বাধ্য আর পোষ-মানা। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাইরে রেখে তার দেখাশোনা করা ছিল বেশ শক্ত ব্যাপার। চিড়িয়াখানার সব কর্মী জানতো না মারিয়াম পোষ-মানা, তাই আঙ্গিনায় ঢুকে তারা পেতো ভয়। এমনও হয়েছে যখন বেড়ার দরজা বন্ধ করতে ভুলে যাওয়ায় ভালুকছানা বেরিয়ে পড়তো আঙ্গিনার বাইরে, তখন ধরতে হতো তাকে। তবে এমন দুষ্টু এক ভালুকছানাকে ধরে ফেলা সব সময় সহজ ছিল না। কখনো সে ধরা দিতো সঙ্গে সঙ্গে, আবার কখনো নাজেহাল করে ছাড়তো: খেলার ছলে ছুটে দূরে চলে যেতো কিংবা উঠে পড়তো গাছে। তখনই হতো আসল মজা। গাছে বসে মারিয়াম কখনো দু'তিন ঘণ্টা কাটিয়ে দিতো, আর যতক্ষণ পর্যন্ত তার সব খেলাধুলা শেষ না হতো গালিনা গ্রিগোরিয়েভনা গাছের নিচেই বসে থাকতেন, পলাতকাকে দিতেন পাহারা।

মারিয়াম কুস্তি করতেও ভালোবাসতো, কিন্তু যেহেতু তার খেলার কোনো সঙ্গী ছিল না সে পরিচারকদের পেছনে লাগতো, তাদের কাজে দিতো বাধা।

গালিনা গ্রিগোরিয়েভনা কয়েক বারই জন্তুদের কারো সঙ্গে তার ভাব করিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মারিয়াম আগের মতোই তাদের এড়িয়ে থাকতো, খেলতে চাইতো না।

বন্ধুত্ব

হঠাৎ একদিন মারিয়াম নিজেই খুঁজে পেলো খেলার সাথী। সাথীটি ছিল ছয় মাসের এক কুকুরছানা, নাম তার জেক।

জেকও থাকতো খাঁচায়। তাকে ওখানে আনা হয়েছে হালে। এখনো প্রভুর জন্যে তার মন টানে: এক কোণে শুয়ে থাকে, সবকিছুতেই গা-ছাড়া ভাব।

এমন হাবভাব দেখে জেকের প্রতি মারিয়ামের আগ্রহ জাগলো। তাকে যখন বেড়াতে ছাড়া হলো, সে অনেকক্ষণ ঘোরাফেরা করলো কুকুরের খাঁচার কাছে, তাকে শুঁকলো। পরে পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে দেখলো দরজাটি। ওতে তালা ঝুলছিল, কিন্তু তা বন্ধ ছিল না। ভালুকছানা থাবা দিয়ে মারলো এক ঝাপটা। তালা খসে পড়লো, দরজা গেল খুলে।

দরজা খোলা দেখে জেক এক লাফে বেরিয়ে পড়লো আঙ্গিনায়। তার কী আনন্দ! কিন্তু আঙ্গিনা চারিদিকে ঘেরা, বেরোবার পথ নেই কোথাও। জেক ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেলো ভালুকছানাকে।

কুকুরছানার গা উঠলো শিউরে। চেঁচিয়ে উঠে ভালুকের কানের কাছে সে একটু কামড়ে দিলো। আর মারিয়াম ভাবলো কুকুর বুঝি তার সঙ্গে খেলা করছে। সে খুশিতে মাথা নাড়ালো, তারপর খেলো ডিগবাজি।

জেক আবার ভালুকছানাকে সামান্য কামড়ালো, তবে এবার আর চেঁচিয়ে নয়। মারিয়ামও আবার ডিগবাজি খেলো। গালিনা গ্রিগোরিয়েভনা এসে দেখলেন, ভালুকছানা আর কুকুর খেলছে ভীষণ ফুর্তিতে।

সেদিন থেকেই মারিয়াম ও জেকের বড়ো ভাব। যদি জেককে প্রথম বেড়াতে বের করা হতো, সে সঙ্গে সঙ্গে ছুটতো মারিয়ামের কাছে, তার খাঁচার পাশে ঘুরতো।

আর মারিয়ামকে প্রথমে ছাড়া হলে সে কারো তোয়াক্কা না করে নিজেই দরজা খুলে কুকুরকে দিতো বেরোতে।

সারা গরম তারা আঙ্গিনায়ই খেললো, তবে থাকতো আলাদা-আলাদা খাঁচায়। যখন শরৎ এলো ও নামলো বৃষ্টি, তাদের একটা বড়ো খোলামেলা কুকুরের ঘরে থাকতে দেওয়া হলো। সেখানে তারা নিজের নিজের জায়গা বেছে নিলো। মারিয়াম থাকতো দরজার কাছে, আর জেক — সব সময় মারিয়ামের পেছনে। মারিয়ামের পেছনে জায়গাটি ছিল বেশ গরম, গায়ে মোটেই হাওয়া লাগতো না ওখানে।

গলায় গলায় ভাব

আলাদা খাঁচায় থাকার সময় জেকের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলেও মারিয়াম কোনোকিছু মনে করতো না। আর ছাড়াছাড়ি তাদের হতো তখনই, যখন মারিয়াম চলে যেতো কোথাও বেড়াতে। যাবার সময় কুকুরের খাঁচার দিকে তাকাতো বটে, কিন্তু তবুও শান্তভাবে লোকের পেছন পেছন যেতো, বাধ্যের মতো গাড়ীতে উঠতো, বসতো গিয়ে তার জন্য রাখা একটি বাক্সে। কিন্তু যেই কুকুরটিকে মারিয়ামের সঙ্গে রাখা হলো সবকিছু গেল বদলে। এবার মারিয়াম কিছুতেই বন্ধুর সঙ্গ ছাড়তে চাইতো না। একবার যখন কুকুরকে চিড়িয়াখানায় রেখে তাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হলো তখন তার কী চিৎকার। কিছুতেই একা গাড়ীতে উঠবে না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো। এক বছরের ভালুকটিকে কাবু করা সহজ ছিল না, তাই জেককেও নিতে হলো সঙ্গে।

একসঙ্গেই দু'জন মঞ্চেও বেরুতো। তবে ভালুকটি আবার কখনো-কখনো বেরুতে ঝামেলা করতো। তখন জেক সোজা তার কানটি ধরে টেনে টেনে নিয়ে আসতো। এতে মারিয়াম রাগতো না, বরং জেক তার কান ধরলে সে খুশিই হতো ও লক্ষ্মীটির মতো যেতো কুকুরের পেছন পেছন।

চিত্রাভিনেত্রী মারিয়াম

মারিয়ামের বয়েস যখন চার তখন সে বিরাট সুন্দর ভালুক। তার সামনে এখন জেককে দেখায় এক্কেবারে বাচ্চা, তবে আগের মতোই তারা থাকে একই খাঁচায়, আগের মতোই তাদের একসঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় বাইরে, আর মারিয়াম যখন কথা শুনে না জেক আগেরই মতো ধরে তার কানে, তখন সে চুপটি করে যায় তার পেছন পেছন। কোনোদিনই তারা একে অন্যকে ছেড়ে থাকে নি, সব সময়ই তারা একসঙ্গে মিলেমিশে আছে। তখন 'মানুষের মতো মানুষ' ছবিটির জন্যে ভালুকের সঙ্গে আহত মেরেসিয়েভের সাক্ষাতের একটি দৃশ্য তোলার দরকার হলো। এটি অতি কঠিন ও চরম মুহূর্ত। প্রথমে ঠিক হলো সার্কাসের ভালুক নেওয়া হবে। তার ছবি তোলা হবে মানুষের সঙ্গে নয়, মোমের তৈরী পুতুলের সঙ্গে। ছবির নায়ক মেরেসিয়েভের ভূমিকায় নামার কথা শিল্পী কাদোচনিকোভের। সবকিছু দেখেশুনে তিনি বললেন:

— চিড়িয়াখানা থেকে ভালুক নিলে কি হয় না?

এর আগেও তিনি 'রবিনসন ক্রুসো' ছবিতে নেমেছিলেন। চিড়িয়াখানার পোষা জন্তুদের মধ্যে তাঁর বন্ধুবান্ধব কম ছিল না।

প্রযোজক রাজী। আলাপ করতে গেলেন চিড়িয়াখানায়। এতো পোষ-মানা মারিয়ামকে দেখে তিনি আর দেরী করলেন না — সঙ্গে সঙ্গেই কথা পাকাপাকি হয়ে গেল। পরদিনই গালিনা গ্রিগোরিয়েভনা তাঁর বাচ্চাদু'টিকে নিয়ে রওনা দিলেন ছবি তোলার জায়গায়।

জ্ভেনিগরদ পর্যন্ত তাঁরা গেলেন ভালোয় ভালোয়। তারপর শুরু হয় পায়ে-হাঁটা সরু গেঁয়ো পথ। তাতে গাড়ী যেতে পারে না। ঘোড়া পাঠানোর জন্যে ফোন করতে হলো গাঁয়ে।

— মাথা খারাপ হয়েছে নাকি, — সঙ্গে সঙ্গেই না বলে দিলো মোড়ল, — আমাদের ঘোড়ারা ভালুক-ফালুক দেখে নি কোনোদিন। ভয়ে দৌড়-টৌড় মেরে পা'টা ভাঙলে দায়ীটা কে হবে?

— তাহলে আমি এখন কী করি? ভালুককে তো আর কোলে করে আনতে

পারি না! একটা পুরনো বুড়ো ঘোড়া-টোড়াও কি হবে না? — অনুরোধ জানালেন ছবির পরিচালক।

— পুরনো ঘোড়া আমাদের কাছে নেই, — রাগ করে মোড়ল। — আমাদের সব ঘোড়াই ভালো, সবক'টাই ভালো জাতের। যদি চান তো ষাঁড় একটা পাঠাতে পারি। ওটাকে দিয়ে আমরা গোয়াল-ঘরে জল টানাই। একদম সাদাসিধে ষাঁড়, অলস — ওর কাছে জলের পিপেও যা ভালুকও তাই।

কী আর করা! অন্য উপায় তো নেই, রাজী হতেই হলো।

ষাঁড় এলো ঘণ্টা দুয়েক পরে। খুব নাদুস-নুদুস, মোটাসোটা। সত্যিই অলস মনে হলো, — পেছনের খালি গাড়ীটা টানছে কোনোমতে। গাড়োয়ান এক জোয়ান ছোকরা। গাড়ীখানা এসে ঘেঁষলো একেবারে বাক্সের পাশে। তারপর লাগাম ছেড়ে ছোকরাটি নামলো ভালুক দেখতে।

— বলদটি 'রথখানা' নিয়ে আবার দৌড়-টৌড় মারবে না তো বাপু? — জিজ্ঞেস করেন গালিনা গ্রিগোরিয়েভনা।

— আরে কী যে কন, — দৃঢ়কণ্ঠে আপত্তি জানায় ছোকরা। — ইয়াশ্‌কা আমাদের ভীষণ কুঁড়ে। — তারপর ভালুকের দিকে তাকিয়ে বললো: — তা কী কন, 'মালটা' এবার বোঝাই করা যাক? নইলে তাড়াতাড়ি তো পৌঁচাও যাবে না।

ছোকরাটি গাড়ীখানা আরো একটু কাছে আনলো। শ্রমিকরা তাতে চাপালো ভালুক আর কুকুরের বাক্সটি। গালিনা গ্রিগোরিয়েভনা বসলেন গাড়ীর পেছনে, আর বাকি সবাই চললো হেঁটে। বাক্সের উপর বসে লাগাম ধরে হাঁকলো গাড়োয়ান:

— হির্‌-র্‌-র্‌, চল্‌ ইয়াশ্‌কা, চল্‌!

ষাঁড় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পা বাড়ালো।

— ইশ্‌, কী কুঁড়ে রে বাবা! বেটা একবারও দৌড়য় নি বাপের জন্মে...

ছোকরাটি আরো কিছু বকতে চাইলো ষাঁড়টিকে, কিন্তু এমন সময় একটি ব্যাপার ঘটলো: আরো দু'তিন পা এগিয়ে ষাঁড় ল্যাজ তুলে হঠাৎ দিলো ছুট। গাড়োয়ান পড়ে গেল বরফে, গালিনা গ্রিগোরিয়েভনা আঁকড়ে ধরেন বাক্স, মারিয়াম গর্জে উঠে, ঘেউ-ঘেউ শুরু করে জেক।

— হেই! হেই ইয়াশ্‌কা! — মিছে হাঁকলো গাড়োয়ান, ষাঁড় থামলো না।

ভালুকের গর্জনে আতঙ্কিত ষাঁড় আরো জোরে দৌড়াতে লাগলো। গাঁয়ের ভেতর দিয়ে সে যে কী দৌড় — না দেখলে আঁচ পাওয়া মুশকিল। গাড়ী-টাড়ি নিয়ে এক ছুটে সোজা গোয়াল-ঘর। গাড়ী দরজায় আটকে যায়, কিন্তু বেশিক্ষণ তা ষাঁড়কে ধরে রাখতে পারে নি। টানাটানিতে গাড়ী থেকে জোয়াল খুলে যাওয়ায় ওটা সমেতই ইয়াশ্‌কা চলে গেল আপন চালায়।

ভাগ্যিস, সবই ভালোয় ভালোয় কাটলো। গাঁয়ের লোক ছুটে এসে একপাশে সরিয়ে রাখলো গাড়ীখানা। বাক্সটি তখনো তাতে। মারিয়াম ও জেকের জন্যে কে যেন এক বাটি দুধ আর রুটি নিয়ে এলো। গাড়োয়ান ও দলের অন্যান্য লোকেরা গাঁয়ে পেঁছে দেখলো যে ভালুক ততক্ষণে নিজের রুটি-দুধ খেয়ে আরো খাবার চাইছে।

মারিয়াম আর জেককে থাকতে দেওয়া হয় এক বুড়ির গোয়াল-ঘরে। গরু অবশ্য সরিয়ে নিতে হলো, তবে আর বাকি সবকিছু ভালোই উৎরালো।

পরদিন শুটিংয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু আবার সেই একই সমস্যা — কীসে যাওয়া যায়। ঘোড়ার গাড়ীতে ভালুক রাখা ঝুঁকির ব্যাপার, আর এদিকে মোটরগাড়ীও বনে চলতে পারবে না। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর শেষে সেই ষাঁড়কেই আবার নেওয়া হয়। তবে ঠিক হলো তাকে আগে ভালুকের গন্ধে আর চেহারায় অভ্যস্ত করানো হবে। এ কাজের ভার নেন গালিনা গ্রিগোরিয়েভনা।

ষাঁড়কে আনা হলো গোয়াল-ঘরে। ভালুকের বাক্সটি ওখানেই। ইয়াশ্‌কার সামনে প্রচুর খাবার রেখে তাকে খুব শক্ত করে বাঁধা হলো একটি খুঁটিতে। নতুবা পালিয়ে যেতে পারে কিনা। কিন্তু সে এবার ভালুকের দিকে এমন কি তাকালোই না। দেখে সবাই তো অবাক। ষাঁড় খাওয়ায় মজে গেল। মারিয়াম দেখলো তাকে খেতে দেওয়া হয় নি, রাগে সে গর্জে উঠলো। ষাঁড় কিন্তু মেজাজে খেয়েই চললো, দু'একবার শুধু আড়চোখে চাইলো ভালুকের দিকে।

শুটিংয়ের ব্যাপারে দারুণ তাড়া ছিল, কারণ তখন মার্চের শেষ, রোদে বরফ যাচ্ছে গলে। ছবিতে কিন্তু দেখানো দরকার ভর শীত আর বরফ।

তাই প্রযোজকের আর বিলম্ব সইছিল না। তিনি যখন দেখলেন ষাঁড় সত্যিই জানোয়ারকে ভয় করছে না, ঠিক করলেন সেদিনই ছবি তুলতে যাবেন।

মারিয়াম এলো বনে। জীবনে এই প্রথম সে পেলো মুক্তির স্বাদ। এবার সে সত্যিকার 'নিবিড়' অরণ্যে।

জানোয়ার সাবধানে ফেলে তার লোমশ থাবা। মারিয়াম বেঁকে, শুঁকে আশেপাশের নতুন অপরিচিত গন্ধ, কান পেতে শোনে। এখন সে পোষা ভালুকের মতো নয় মোটেই। তার দিকে তাকালে মনে হয় সে যেন সত্যি সত্যিই একটি বুনো জানোয়ার, কখনো মানুষ দেখে নি। অপারেটর খুব ছবি তুলছেন। ভালুকের প্রতিটি পদক্ষেপ, চলার প্রতিটি ভঙ্গি তুলতে তাঁর কী তাড়া।

সবকিছুই চললো খুব খাসা। মারিয়াম শিগ্গিরই নতুন জায়গায় অভ্যস্ত হয়ে গেল। গালিনা গ্রিগোরিয়েভনা তাকে যেদিকে ডাকেন সেদিকেই সে যায়। চলতে চলতে হঠাৎ ভালুকটি পড়ে গেল একটি গর্তে। মারিয়াম ভয় পেয়ে গর্জে উঠে। তারপর গর্ত থেকে বেরিয়ে দেয় ছুট। এ সবকিছু এতোই তাড়াতাড়ি ঘটলো যে কেউ টেরই পেলো না কী হলো।

এবার ভালুকের নাগাল ধরার কথাই উঠতে পারে না। জেকের জন্যে শিগ্গির ছুটতে হলো গাঁয়ে।

জেককে আনা হলো। তাকে ছাড়তে সেও নিমেষে উধাও। পেছন পেছন ছুটেন গালিনা গ্রিগোরিয়েভনা, পরিচালক আর শ্রমিকেরা। প্রথমে তাঁরা দৌড়ান পায়ের দাগ দেখে, তারপর শুনতে পান জেকের ঘেউ-ঘেউ। সবাই ছুটলেন সেদিকে কোণাকুণি।

দৌড়তে দৌড়তে সবার আগে রাস্তায় বেরুলেন গালিনা গ্রিগোরিয়েভনা। সেখানে কাণ্ডকারখানা দেখে তো তাঁর আক্কেল গুড়ুম। দেখেন কী জানো, রাস্তার ঠিক মাঝখানে ছোটো একখানা 'মস্কোভিচ' গাড়ী দাঁড়িয়ে, তার কাছে ঘেউ-ঘেউ করে লাফাচ্ছে জেক, আর সামান্য দূরে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি লোক। খুব সম্ভব গাড়ীর মালিক।

গালিনা গ্রিগোরিয়েভনা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে নিলেন কী ব্যাপার। এবং যা ভাবলেন তাই-ই হয়েছে। কাছে এসে গাড়ীর ভেতরে তাকাতেই দেখলেন মারিয়ামকে। বেশ দিব্যি বসে আছে।

পরে এ নিয়ে অনেকক্ষণ হাসাহাসি করলেন গালিনা গ্রিগোরিয়েভনা, দলের

লোকেরা। এমন কি গাড়ীর মালিকও না হেসে পারেন নি, — সত্যি ভাল্লুক তাঁর গাড়ীখানা কী বীরত্বের সঙ্গেই না কব্জা করেছে।

— এমনটি হবে কে-ই বা জানতো! — বলেন ভদ্রলোক। — গাড়ীতে করে যাচ্ছি, দেখি — ভাল্লুক দৌড়ে আসছে, একেবারে সোজা গাড়ীর দিকে। ভাবলাম, একটু থেমে ওকে রাস্তাটা ছেড়ে দেই। এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়লাম, আর ভাল্লুক একদম কাছে হাজির। হাতল ধরে টানতে লাগলো। আমি দরজা টানি আমার দিকে, আর ও নিজের দিকে। আমি গাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলাম, আর ও ভেতরে ঢুকে চেপে বসলো। এমন সময় দেখি দৌড়ে আসছে কুকুর। কাছে এসে খুব ঘেউ-ঘেউ করলো। ভাবলাম, ভাল্লুকটি নিশ্চয়ই পোষা। তবে কী করবো বুঝে উঠতে পারি নি। বেশ এমন সময় আপনারাও এসে হাজির। — এবং মারিয়ামের দিকে ফিরে হেসে হেসে বললেন: — গাড়ীতে খুব জিরিয়েছেন — অনেক হয়েছে। এবার নেমে পড়ুন।

তবে মারিয়ামের মনে নামার ভাবনাই নেই। তখন গালিনা গ্রিগোরিয়েভনার মনে পড়লো যে তাঁর জেবে কয়েক টুকরো চিনি আছে। মারিয়ামকে দেখালেন।

মারিয়াম মিষ্টি অসম্ভব ভালোবাসতো। চিনি দেখে তার কী ফুর্তি! সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী থেকে নেমে পড়লো।

তারপর ভাল্লুকের গলায় শেকল পরিয়ে কড়া পাহারায় আবার তাকে ছবি তোলার জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো। দাঁত দেখানো অবস্থায় তার ছবি তোলা এখনো বাকি, এবং প্রযোজক জেদ ধরলেন, তা আজ অবশ্যই করতে হবে।

কাজটি একেবারেই শক্ত নয়। মারিয়ামকে রাখা হয় ক্যামেরার সামনে, আর গালিনা গ্রিগোরিয়েভনা ধীরে ধীরে তার নাকে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লেন — মারিয়াম দাঁত দেখালো, নাক সিটকালো এবং হাঁচিও দিলো।

— বাঃ, চমৎকার! — বলেন প্রযোজক। — খাসা হয়েছে, আবার হোক।

আবার ধোঁয়া ছাড়া হলো — এবারও মারিয়াম দাঁত দেখালো, তারপর থাবা দিয়ে লাগলো নাক মুছতে।

— ঠিক হলো না, খারাপ হয়ে গেছে, ফের তুলতে হবে, — আবার আদেশ করেন প্রযোজক।

তবে ফের ছবি তুলতে হলো না: সিগারেটের ধোঁয়া খুব সম্ভব মারিয়ামের আর সহ্য হচ্ছিল না — মাথা নেড়ে হাঁচতে হাঁচতে দিলো চম্পট।

জেক আবার দৌড়লো তার পেছন পেছন। খেলার অমন সুযোগ পেয়ে তার আনন্দ আর ধরে না। ফুর্তিতে করে ঘেউ-ঘেউ। গালিনা গ্রিগোরিয়েভনা ও অন্যান্য সবাইকে আবারো ছুটতে হলো পলাতকার পেছনে।

এবার মারিয়াম ছুটে ঘন বনের মধ্য দিয়ে। ঝোপঝাড় ভেঙ্গে তার পিছু নেওয়া ছিল খুবই শক্ত ব্যাপার। তার উপর চারিদিক ঘন বরফেও ঢাকা। মারিয়ামের নাগাল ধরলাম একটা বড়ো মাঠের কাছে। যেতে যেতে সে বরফের নিচ থেকে কীসব খুঁড়ে তুলে আর খায়। যখন দেখলো লোক আসছে, আবার দিলো দৌড়।

— আর পারি না! — গালিনা গ্রিগোরিয়েভনা থেমে গেলেন, ভীষণ হাঁপাচ্ছেন তিনি। — ও খেলায় মজে গেছে, এবার থামানো মুশকিল।

কথা ক'টি বলেই গালিনা গ্রিগোরিয়েভনা ফিরে চললেন। তাঁকে চলে যেতে দেখে জেকও সঙ্গে গেল। মারিয়াম আর থাকতে পারলো না। সেও তাদের পেছন পেছন এ্যায়সা জোর এক দৌড় দিলো যে তা আর বলার নয়। এইভাবেই সবাই ছবি তোলার জায়গায় পেঁৗছে: গালিনা গ্রিগোরিয়েভনা চলেন আগে আগে, আর তাঁর পেছনে — কুকুর ও ভালুক।

বনে গিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে তোলা হলো ভালুকের ছবি। তবে সবচেয়ে কঠিন দৃশ্যটি এখনো তুলতে বাকি। এ দৃশ্যটি হলো — বরফে শুয়ে আছেন ছবির নায়ক, আর তাঁর পাশে একটি ভালুক। ভালুক লোকটিকে শুঁকে তার গায়ের কোটটি ছিঁড়ছে।

...ছবি তোলার বেশ আগে থেকেই কাদোচনিকোভ মারিয়ামকে তালিম দিতে শুরু করেন। তিনি তার কাছে যান, তাকে খাওয়ান, আদর করেন, নিয়ে যান বেড়াতে। পরিচিত হন ভালুকের স্বভাবের সঙ্গে, লক্ষ্য করেন তার অভ্যাস।

কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রধান দৃশ্য শুটিংয়ের দিনে সবাই যেন বেশ উদ্বিগ্ন। কে জানে, ভালুকের মতিগতি কেমন হবে: হঠাৎ যদি শুয়ে-থাকা লোকটিকে জখম করে বসে? শুটিংয়ের জায়গাটি আগে থেকেই পুলিশে ঘেরে রেখেছে যাতে বাইরের

কোনো লোক সেখান দিয়ে না যায়। সমস্ত সাজসরঞ্জাম আগে থেকেই তৈরী, সবাই যার-যার জায়গায়। এবার আনা হলো মারিয়ামকে।

মারিয়ামকে যখন ছাড়া হয় কাদোচনিকোভ শুয়ে আছেন বরফে। গায়ে পাইলটের পোষাক। মারিয়াম সোজা গেল তাঁর কাছে। চারিদিকে মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা। সবাই চুপ।

একমাত্র গালিনা গ্রিগোরিয়েভনাই একটু এগুলেন। চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ। লক্ষ্য করছেন জানোয়ারের প্রতিটি পদক্ষেপ। এই তো সে এলো শুয়ে-থাকা লোকটির কাছে... এই তো নুইয়ে তার মুখ শুঁকছে, ছুঁইছে দাঁত দিয়ে... কাদোচনিকোভ শুয়েই আছেন। তিনি অনুভব করেন, তাঁর মুখের উপর ভালুক শ্বাস ফেলছে। মেরেসিয়েভের মতো তাঁরও উঠে পড়তে প্রচণ্ড ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু সে ইচ্ছাকে দমন করে তিনি মড়ার মতো শুয়ে থাকলেন। কোনো নড়চড় নেই। লোকটির মুখ শুঁকে মারিয়াম তার কোট পরখ করতে লাগলো। সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। মারিয়াম কোটটি শুঁকে, তা থেকে কিছু একটা মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে। ভালুকের ভালোই জানা আছে, লোভনীয় খাবার পেতে হলে কী করতে হবে তাকে। কাদোচনিকোভ কতবারই তো ইচ্ছে করে কোনো-না-কোনো ভালো মিঠাই পকেটে লুকিয়ে রেখে মারিয়ামকে শিখিয়েছেন কীভাবে তা বের করতে হয়।

বিরাট বিরাট নখ দিয়ে ভালুক কোটটি ছিঁড়ে ফেললো। তারপর লুকনো মিঠাই নিয়ে পড়লো সরে। সরে পড়লো, কারণ গালিনা গ্রিগোরিয়েভনা পুরো এক পোঁটলা চিনি দেখিয়ে হাত নেড়ে ডাকলেন তাকে। মারিয়াম ছুটলো চিনি খেতে। ব্যস, ছবি তোলাও শেষ।

সবাই সোহাগ করে মারিয়ামকে, ছুটে গিয়ে কাদোচনিকোভকে জিজ্ঞেস করে শুটিংয়ের সময় তাঁর কেমন লাগছিল।

— খুব যে একটা ভালো তা বলা যায় না, — হাসেন তিনি। — ও যখন আমার নাকটি চাটছিল তখন ভীষণ খারাপ লেগেছে। ভাবলাম, এবার নাকের দফা শেষ। তবে ভাগ্যিস বেশি কিছু করলো না, চেটেই চলে গেল। কি, চিনিতে কি বেশি সোয়াদ? — ভালো অভিনয়ের জন্যে মারিয়ামকে আরো এক পোঁটলা চিনি দিতে বললেন তিনি।

চিনি খতম করে মারিয়াম নিজের বাক্সে ঢুকে পড়লো। সেদিনই তাকে আর জেককে ফেরত পাঠানো হয় চিড়িয়াখানায়। তাদের স্টেসনে নিয়ে যায় আবার সেই কুঁড়ে ষাঁড়। ধীরে ধীরে চলছে সে, কোনোমতে টানছে গাড়ীখানা, আর গাড়ীর পেছন পেছন ছুটছে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা, তাদের প্রত্যেকেই মিষ্টি কোনোকিছু ছুড়তে চাইছে খাঁচায়...

বড়ো রাস্তায় গাড়ী অপেক্ষা করছিল। কয়েক ঘণ্টা পরেই মারিয়াম ও জেক ফিরে এলো মস্কোয়।

মারিয়াম ঘুমোচ্ছে কুকুরের ঘরে, আর পেছনে তার গায়ের তাপে গরম হয়ে গাঢ় ঘুমে ঢলে পড়েছে জেক।

উপসংহার

ছ'বছর মারিয়াম আর জেক থাকলো চিড়িয়াখানায়। মারিয়াম আগের মতোই পোষা, সোহাগী ভালুক, কিন্তু এখন তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া খুব একটা নিরাপদ নয়। একবার তো মারিয়াম দড়ি ছিঁড়ে মঞ্চে যাওয়ার বদলে চলে গিয়েছিল একেবারে ক্যাণ্টিনে, — বিশেষ করে এ ঘটনার পর থেকেই তাকে নিয়ে সবার ভয়। ক্যাণ্টিন খুঁজতে বেগ পেতে হয় নি মারিয়ামকে। ভালুক দেখে পরিচারিকার আত্মারাম তো ঠাণ্ডা। কোত্থেকে যে তার কাউণ্টারের কাছে ভালুক এসে হাজির তা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলো না। যতক্ষণ সে সাহায্যের জন্যে ছুটোছুটি করলো, মারিয়াম ততক্ষণে ক্যাণ্টিনের সব ফল আর চকলেট-বিস্কুটই শুধু সাবাড় করে নি, সমস্ত মদও উড়িয়ে দিয়েছে।

মদ টেনে মারিয়াম তো মাতাল। তাকে সামলানো হলো দায়। আধা-খাওয়া বিস্কুটের টুকরোটি রেখে সে কিছুতেই যাবে না। জেকের সাহায্যে বহু কষ্টে তাকে এক জায়গায় বসানো গেল, তবে মঞ্চে যাওয়ার মতো অবস্থা তার আর ছিল না।

এই ঘটনার পর মারিয়ামকে বাইরে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয় নি। তাকে চিড়িয়াখানার নতুন এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেখানে খোলামেলা জায়গায়

'শালুন' (অর্থাৎ 'দুষ্ট') নামের অন্য এক ভালুকের সঙ্গে থাকে। প্রথম দিকে মনে হলো নতুন সঙ্গী পেয়ে মারিয়াম খুশিই হয়েছে। তার সঙ্গে সে ঝগড়াঝাঁটি করে না, খেলে। পরে হঠাৎ কুকুরের জন্যে তার মন কেমন করতে লাগলো। সারাদিন খোঁয়াড়ে হাঁটাহাঁটি করে, কাঁদে। ওদিকে জেকেরও মন খারাপ। তখন ঠিক হলো তাদের আবার রাখা হবে একসঙ্গে।

এক মাসের বিচ্ছেদের পর কুকুর ও ভালুকের দেখা যখন হলো, তখন জেক তো আনন্দে আত্মহারা, আর মারিয়ামের কথা কী বলবো — সে থাবা দিয়ে কুকুরের ঘাড় জড়িয়ে ধরে তার মুখটি চাটতে লাগলো।
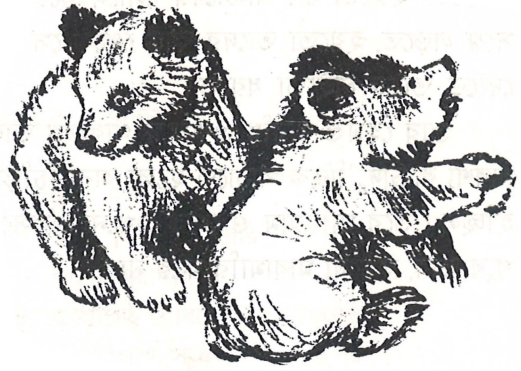
আবার তারা একসঙ্গে, এক খাঁচায়।

হেমন্তের শেষ। এলো শীত। মারিয়াম আর জেক আগের মতোই একসঙ্গে থাকে। তবে হালে মারিয়াম খেলা ছেড়ে দিয়েছে। খাঁচার মধ্যে ডেরার মতো কী একটা সে খুঁড়লো। তারপর তাতে দিলো খড়ের গাদি। সারাদিন ওখানেই শুয়ে শুয়ে কাটাতো। ফেব্রুয়ারিতে মারিয়ামের দু'টি বাচ্চা হলো।

বাচ্চাদের চিঁচিঁ ডাক শুনতেই জেকের সে কী লাফালাফি। মারিয়ামের কাছে ছুটে এসে সে ছানাদের শুঁকতে চাইলো। প্রথম প্রথম মারিয়াম কৌতূহলী জেকের কাছ থেকে তাদের আড়াল করে রাখতো, তবে পরে সে শান্ত হলো। এখন সে বাচ্চাদের শুঁকতেই শুধু নয়, ছুঁতেও দিতো কুকুরকে। মারিয়ামের এরূপ অনুমতি তার ভালোই লাগলো। প্রায় সারাদিনই সে কাটাতো বাচ্চাদের পাশে। চেষ্টা করতো তাদের একেবারে কাছে শুতে, চেটে দিতে, আর ভালুকছানারা যখন চেঁচাতো সে অস্থির হয়ে উঠতো, ডাকতো।

একবার সে এমন কি বাচ্চাদের অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। একটি বাচ্চাকে সে ঘাড়ে ধরে প্রায় নিয়েই গেছে, এমন সময় মা এসে দিলো বাধা। অতিশয় যত্নশীল জেকের কাছ থেকে সে বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিলো, ফের নিয়ে গেল নিজের জায়গায়।

আর এই চমৎকার জন্তুদের দেখে দর্শকরা কত আনন্দ পেতো তা কি তোমরা জানো! বিশেষ করে ভালুকছানারা যখন খেলতো। তবে জেকই সবকিছু শুরু

করতো: হয়তো সে বাচ্চাদের লোমে ধরে দিতো টান, আর তারা এগুতো তার সঙ্গে লড়তে, হয়তো তাদের কাছ থেকে সে পালাতে যেতো, আর তারা হেলেদুলে দৌড়ে তাকে চাইতো ধরতে।

প্রায় হেমন্ত অবধি একসঙ্গে থাকলো ভালুকছানা, মারিয়াম আর জেক। পরে অবশ্য বাচ্চাদু'টিকে পাঠাতে হলো অন্য চিড়িয়াখানায়, কারণ খাঁচায় বড্ড ঠেসাঠেসি হচ্ছিল। তবে মারিয়াম ও জেক এখনো একসঙ্গে আছে, আগের মতোই তাদের মধ্যে খুব ভাব, কখনো মারামারি করে না।

প্রকাশকের নিবেদন

আদরের কিশোর বন্ধুরা!

প্রগতি প্রকাশনের 'রামধনু' সিরিজে এবার প্রকাশিত হলো ভেরা চাপলিনার 'আমাদের চিড়িয়াখানা'।

এই সিরিজে বাঙলা ভাষায় আগেই বেরিয়েছে: সোভিয়েত দেশের বিভিন্ন জাতির লেখকদের গল্প-সংকলন — 'বৃষ্টি আর নক্ষত্র'।

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন সম্বন্ধে প্রামাণ্য আলোকচিত্র সজ্জিত বই — 'স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নিশিখা'।

প্রবীনতমা শিশু-সাহিত্যিকা ল্যুবোভ ভরোঙকভার 'যাদুতীর'। এই বইয়ে আছে চিত্তাকর্ষক রূপকথা যাদুতীর আর একটি ছোট্ট মেয়ের গল্প 'শহরের মেয়ে', যে যুদ্ধের সময় মা-বাবাকে হারিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল এক কৃষক পরিবারে।

আনাতোলি আলেক্সিনের রোমাঞ্চোপন্যাস — 'ভয়ঙ্কর রোমহর্ষক ঘটনা'।

বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারী, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর ইউরি গাগারিনের প্রামাণ্য আলোকচিত্র সজ্জিত কাহিনী — 'পৃথিবী দেখছি'।

রাশিয়ার চিরায়ত সাহিত্যিক ইভান তুর্গেনেভের 'মুমু' এবং আন্তন চেখভের 'কাশতান্কা' ও অন্যান্য বই।

বইগুলি সম্পর্কে তোমাদের এবং তোমাদের গুরুজনদের মতামত জানতে পেলে প্রকাশালয় খুবই বাধিত হবে।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

‘প্রগতি’ প্রকাশন

ছেপে বেরুল:

ইউরমিন, গ.। ‘১০০৩ মহাবীর’

সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞান ও টেকনোলজির অগ্রগতি নিয়ে ছোটোদের জন্যে লেখা চমৎকার একখানা বই। লেখক ইউরমিন অনেক বিজ্ঞানভিত্তিক সাহিত্যরসাশ্রিত গ্রন্থের রচয়িতা।

বইখানি পড়ে ছেলেমেয়েরা যাবে রূপকথার, সেইসঙ্গে বাস্তব এক আজব দেশে। সেখানে হুকুম দিলেই বৃষ্টি পড়ে, কাচের তীরে বরাবর বয় দুধের নদী।

‘প্রগতি’ প্রকাশন

ছেপে বেরুল:

আলেক্সেয়েভ, স.। ‘রুশ ইতিহাসের কথা ও কাহিনী’

ছোটো ও কিশোরদের জন্যে সেরা রচনা হিশেবে রুশ ইতিহাসের কাহিনী নিয়ে বইটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছে। স. আলেক্সেয়েভ তা লিখতে শুরু করেন বহু বছর আগে। তখন তিনি ছিলেন ইতিহাসের শিক্ষক, প্রথম পুরস্কার পান গল্পগ্রন্থের জন্যে নয়, ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকের জন্যে। এখন তিনি যশস্বী সোভিয়েত লেখক, ‘শিশু সাহিত্য’ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক, রুশ ইতিহাস নিয়ে তাঁর কাহিনীগুলি স্কুলের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর কাছে অতি আদরণীয়। বর্তমান সংস্করণে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে ১৯৪১—১৯৪৫ সালের পিতৃভূমির মহাযুদ্ধ নিয়ে লেখা কাহিনীগুলিও সংযোজিত হয়েছে।

উপহারযোগ্য গ্রন্থের মতো বইটির অঙ্গসজ্জা, রঙীন চিত্র ও প্রামাণ্য ফোটোগ্রাফে সমৃদ্ধ।